ইন্দিরাগান্ধী ও সমাজতন্ত্র

ইন্দ্রনীল চৌধুরী

বর্ণালী প্রকাশনী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড.
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষ
বর্ণালী প্রকাশনী
৭৩, মহাত্মাগান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : সুমিত মজুমদার

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৩২

মুদ্রাকর :
শ্রীসাধন চক্রবর্ত্তী
নবীন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩, ডাঃ কার্ত্তিক বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মূল্য : আট টাকা

"যে আমারে দেখিবারে পায়

অসীম ক্ষমায়

ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি"

আমার সেই পরম শ্রদ্ধেয় এবং মানসিক পথের

দিশারী শ্রীপ্রতাপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে

—ইন্দ্রনীল চৌধুরী

ভারতবর্ষ একটা দেশ, ভারতবাসী একটি জাতি, ইন্দিরা গান্ধী একটি নেতৃত্ব।

জওহরলাল নেহরুর নির্ভরশীল পার্শ্বচর, ভারতের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেননের বক্তব্য এটা। বর্তমান ভারতের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতারা এবং মণীষীরা প্রায় এমন ধারা প্রসংশাই ইন্দিরাজী সম্বন্ধে করেছেন। বিরুদ্ধবাদী নেই এমন কথা আসছে না। তবে মোটামুটি ভাবে সবাই আজ ইন্দিরার পাশে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর কোন নেতাকেই সর্বস্তরের মানুষ এমন ভাবে সমর্থন করেনি। কারণ, সমর্থন জানাবার মতো সত্যিকার নেতা তারা পায়নি বলে।

তাঁর অর্থাৎ বর্তমান ভারতের প্রধান মন্ত্রীর প্রতি তাঁর দলের নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিদের উচ্চ মাত্রার প্রসংশার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে, যাঁরা তাঁর বিপক্ষে, তাঁদের প্রসংশাকে মূল্য দেওয়া প্রয়োজন আগে। কেননা সেটাই হবে সঠিক মূল্যায়ণ।

সেদিক থেকে কৃষ্ণমেননের প্রসংশার মূল্য আছে, মূল্য আছে মোরারজী দেশাই-এর বক্তব্যে। মূল্য আছে জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির উক্তিতে।

কৃষ্ণমেনন জওহরলালের অতি প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। ১৯৩৭ সাল থেকে জওহরলালের তিরোধানের পূর্ব পর্য্যন্ত কৃষ্ণমেনন জওহরলালের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর। সে হিসেবেই স্বর্গতঃ প্রধান মন্ত্রীর একমাত্র কন্যাকে অনুভব করার সুযোগ তাঁর অনেকখানি ছিল। অথচ জওহরলালের মৃত্যুর পর এবং চীন-ভারত যুদ্ধের ভারতীয় মর্য্যাদা হানির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণমেনন ইন্দিরা বিরোধী পর্য্যায়ে গিয়ে

পড়েন। সেদিক থেকে তাঁকে ইন্দিরা বিরোধী ব্যক্তি বলে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং সে হিসেবে, বিরুদ্ধবাদীদের প্রসংশা সাধারণতঃ যতখানি না করলে নয়—ততখানিই। অর্থাৎ ইন্দিরার কাজের প্রসংশা না করার জন্যে যাঁরা তৈরি, তাঁরা যদি প্রসংশা করেন, সেটাকে অনেক বেশি নম্বর দেওয়াই যুক্তি যুক্ত।

মোরারজী দেশাই, যিনি রাজনীতিব ক্ষেত্রে সরাসরি ইন্দিরার প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি যদি তাঁর প্রতিপক্ষের নেতৃত্বের প্রসংশা করেন, তবে এটাই বুঝতে হবে প্রতিপক্ষের নেতৃত্ব প্রশ্নাতীত।

হ্যাঁ, ইন্দিরাজীর নেতৃত্ব আজ প্রশ্নাতীত। বিপক্ষবাদী অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে কিছু কটুক্তি, কিছু ভুল ব্যাখ্যা কিছু শত্রুতা করবেই। এবং সে বিরোধীতা না থাকলে নেতৃত্বের জৌলুষ স্তিমিত হবারই সম্ভাবনা। আজ ভারতের জনসাধারণ পচনশীল ভারতীয় রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মসীলিপ্ত অন্ধকারের বুকে আলোর ইঙ্গিত বহন করছে যে নেতৃত্ব, সে নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত। সে নেতৃত্ব প্রশ্নাতীত কেন, এ বিশ্লেষণ একান্তভাবে দরকার। পরাধীন ভারতের ভারতবাসীরা সংঘবদ্ধভাবে রাজনীতির পথে পা বাড়ায় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে। ১৮৮৬ সালের ১লা মের শ্রমিক বিদ্রোহের এক বছর আগে থাকতেই।

১৮৮৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের প্রাক্ স্বাধীনতার মুহূর্তে অনেক নেতার আবির্ভাব হয়েছে। রত্নপ্রসবিনী ভারতবর্ষ সে সময় অর্থাৎ উনবিংশ শতকে প্রায় একই সঙ্গে বহুরত্ন প্রসব করেছিলেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। কিন্তু, ভারতের জাতীয় ভিত্তি এবং মনোজগতে ভারতীয় আদর্শের পুনপ্রতিষ্ঠার দুরূহ কার্য্যে তাঁরা অনেকেই তিরোহিত হয়েছেন, বিরুদ্ধ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে মহাপ্রয়ান করেছেন, অথচ স্বাধীনতার মুহূর্ত থেকে আজ পর্য্যন্ত নবীন

ভারতবর্ষের হাল ধরার মতো উপযুক্ত কাণ্ডারির অভাব সাধারণ মানুষের মনে ধ্বংসাত্মক অবক্ষয়ের সূচনা করেছে। রত্নপ্রসবিনী ভারতবর্ষ যেন বিংশশতাব্দীতে বন্ধ্যা হয়ে গেছেন! এ প্রশ্ন অনেকের মনেই ছিল, এ প্রশ্ন এখনও অনেকের মনে আছে। সেটা দীর্ঘ অনাসৃষ্টির সাক্ষী থাকার দরুণ সংশয়। এ সংশয় এত তাড়াতাড়ি যাবারও নয়। তাই ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানুষরা আজও নিঃসীম নীলিমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, ভারত কি আবার অতীত মর্যাদা ফিরে পাবে, সাধারণ মানুষ আবার কি পরিপূর্ণ হাসি নিয়ে মুখ তুলে তাকাবে? উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে উত্তরের প্রতীক্ষা তারা করছে। মাতৃতান্ত্রিক ভারতবর্ষে নেতৃত্বের কেতন হাতে ইন্দিরাজীর আবির্ভাব। গত দশমাসের দিনপঞ্জী একথাই বলবে, ভারতবর্ষের ভূমি অনুর্ব্বর নয়, ভারতমাতা বন্ধ্যা নয়, সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব দেবার মতো সৃষ্টি এখনও হয়। তারই পরিচয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীতে।

"এশিয়ার নতুন সূর্য্য ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও", "ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সমাজবাদ আসছে, আসবে" "ইন্দিরা ইয়াহিয়া এক হ্যায়", এমনি ধরণের নরম-গরম, পক্ষে বিপক্ষের নানা শ্লোগান দেয়ালে দেয়ালে মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। এ যেন শ্মশানের দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে অজস্ররকম নাম লিখে যাবার মতো। বিরুদ্ধবাদীর কটূক্তি এবং স্বপক্ষের প্রসংশা। এ দুয়ের টানা—পোড়েনে পড়ে মানুষের নাভীশ্বাস উঠবেই। চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এর উপর অনেক কিছুই চিন্তা করছে। অতি উচ্ছ্বাস যেমন ক্ষতিকর, অকারণ কটূক্তিও সামগ্রিক উন্নতির পরিপন্থী। নেতৃত্বের আলোকবর্তিকা যাঁর হাতে, তাকে অতি হাততালি দিয়ে মোহগ্রস্ত করে রাখা এবং প্রতি কাজে বাধা দিয়ে তাঁর নেতৃত্বকে খর্ব করা, দুটোই প্রায় সমপর্য্যায়ের। সেই জন্যে সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণের একান্ত প্রয়োজন। পক্ষপাতহীন যাকে

সম-আলোচনা বলি—তার মাধ্যমে নেতৃত্বের সঠিক পথ নির্দেশ সম্ভব।

দীর্ঘ দিন আমি অপেক্ষা করেছিলাম এই কারণে যে, এ দায়িত্ব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এমন কেউ নেবেন, যাঁর পাণ্ডিত্য অনেক বেশি : রাজনীতির, সমাজনীতির অর্থনীতির এবং বিশেষ করে ভারতের সমগ্র জনসাধারণের পরিপ্রেক্ষিতে যিনি অনেক বেশি সচেতন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর কাউকে এগিয়ে আসতে না দেখে, খুব সাধারণ ভাবে এ কাজে হাত দিয়েছি শুধু সূচনার প্রয়োজনে। শিক্ষক, সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি এঁদের ওপরই সংস্কৃতি অনেকখানি নির্ভরশীল। এঁরা চেষ্টা করলে, মানুষকে মানুষ করতে পারেন, পশুস্তরে নামিয়ে দিতে পারেন। ভারতবর্ষের আজ চরম সংকট। ঐ সংকট রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সমাজ ব্যবস্থায়। ঐ সব কিছুই গড়ে তোলা যায়, যদি দেশে মানুষ থাকে। অমানুষের মিছিল থাকলে কোন কিছুই সম্ভব নয়, এক ধ্বংস করা ছাড়া। তাই একাজ একমাত্র মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির দায়িত্ব।

আমরা সত্য বলছি, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলছি না। সত্যের খাতিরে ইন্দিরা বা কংগ্রেসকে গালাগাল দিচ্ছি। আবার কংগ্রেস সত্য বলছে এবং সত্যের খাতিরে জনসংঘ, স্বতন্ত্র, কম্যুনিষ্ট, সোস্যালিষ্টদের গালাগাল দিচ্ছে। এখন প্রশ্ন সত্য কাকে বলে ? সত্য নিরূপণ করবে কে ? আমার লেখাতে সেই 'সত্য' এবং সেই 'সত্য'র খাতিরে হয়তো উভয়পক্ষের প্রতি না-ভালো কথা বলতে হবে। তবে সত্য কোনটা ? তাই সমগ্র আলোচনার পূর্ব মুহূর্তে 'সত্য' কথার সংজ্ঞা নিরূপণ করছি। এটা আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি নয়। এটা ভারতীয় মণীষার দীর্ঘকালের ব্যাখ্যা।

'সত্য' কথাটির উৎপত্তি 'অস-ধাতু' থেকে। অস্‌ধাতুর অর্থ-গতি

দীপ্তি, স্থিতি, বিদ্যমানতা। যেসবের মধ্যে, দীপ্তিমান্ গতি ও অস্তিত্ব বর্তমান তাই সত্য, অর্থাৎ সত্যের ভাব। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতেও সত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক সূত্রেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, স্ল্যাভোনিকে সত্যের নাম 'সি' ল্যাতিনে 'সেন্‌স', আবেস্তায় 'হেত্য', প্রাচীন পার্শিয়নে 'হসিয়্'। এ সবগুলিই মূলতঃ ঐ 'অস্-ধাতুর' অর্থ সহযোগে গঠিত শব্দমালা। অস্তিত্ব ছাড়া সত্যের ধারণা করা যায় না। জীবন যাতে আছে, যেখানে প্রাণিকুলের কল্যাণ, সত্য আছে তার মধ্যেই। মহাভারতের বনপর্বে দেখি—

"যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা।"

যাতে ভূতসমূহের চরম অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সংসাধিত হয়, তাইই সত্য।

'সত্য' কথাটির মধ্যেই এই ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। সেইজন্যে যথার্থবাক্ অর্থাৎ ঠিক বলা সব সময় সত্যবাক্ নয়। সত্য ও যথার্থের মধ্যে পার্থক্য আছে। সত্য যা' তা' প্রয়োজন বশতঃ অযথার্থও হতে পারে, কাজেই যথার্থও অনেক সময় অসত্য হতে পারে। যে যথার্থ বাক্যে মানুষ অন্তরে বেদনাহত হয়, মানুষের প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়, তা কখনই সত্য নয়। কিন্তু যে-কথায়, যে আচরণে জীবন রক্ষা পায়, চিত্ত প্রফুল্ল হয়, উদ্দীপনা বাড়ে, সে বাক্যই সত্যবাক্য, সে আচরণই সত্যাচরণ। জীবন রক্ষার্থে মিথ্যা কথাকে সত্য অপেক্ষাও শ্রেয় বলে বলা হয়েছে! কারণ, মিথ্যা তাই যা হিংসা করে। 'মিথ্-ধাতুর' অর্থ হিংসা। সুতরাং যে মিথ্যা হিংসাকে হনন করে, সে তো সত্যই!

ভীষ্ম বলেছেন—

"আত্ম জ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।" আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। কিন্তু সত্য থেকে বড় আর কিছুই নেই।

সুচারু মিলন-সঙ্গতি যেখানে আছে, অস্তিত্বসহ বর্দ্ধমান গতি যেখানে আছে, সেখানেই সত্য বিরাজমান।

ধর্ম সম্বন্ধেও বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটা ভুল ধারণা আছে। আজ আমাদের চরম অবক্ষয়ের জন্যে মূলতঃ দায়ি সত্য বা ধর্মবোধের অভাব। ধর্ম কথাটা শুনলেই আমরা আঁতকে উঠি এবং সরবে প্রতিবাদ জানাই ধর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই, বৈজ্ঞানিক ধারণা পুষ্ট পৃথিবীতে ধর্মের কোন স্থান নেই। এতেই বোঝা যায়, এই সব শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিজ্ঞান লাভ হয়নি, অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানবান নন। আচার-আচরণকে ধর্ম ভেবে বসে আছেন। এর জন্যে দায়ী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। ভারতীয় ঋষিরা কোন বিশেষ ভূভাগের কথা ভাবেন নি, কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেননি তাঁদের সমগ্র ভাবনা চিন্তা ব্যপ্ত ছিল মানব কল্যাণের জন্যে। সে সব মনীষা ধর্মের বা সত্যের যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা চিরায়ত। মহাভারতে আছে—

"নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি।"

সত্য যেখানে নেই, তা ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্মের মধ্যে আছে ধারণ—পোষণ। তাই ধারণ-পোষণ যেখানে থাকবে, অস্তিত্ব সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই থাকবে। আবার, অস্তিত্ব যার ধ্বংসশীল, মৃত্যুমুখী, ভঙ্গপ্রবণ, তার মধ্যে ধারণ-পোষণ আর কোথায়? তাই সত্যই ধর্ম্ম, ধর্ম্মই সত্য। সত্যের দ্বারাই সবকিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের নীতিশাস্ত্রে অপ্রিয় সত্য বলার নিষেধ আছে। কিন্তু অপ্রিয় সত্য যেখানে কল্যাণকেই আহ্বান করে, মঙ্গলকেই প্রতিষ্ঠিত করে, সেখানে অপ্রিয় হলেও তা বলতে হবে। কারণ, ঐ একটাই—জীবের কল্যাণ।

আমার একাজ সেই ধর্মের প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ। দীর্ঘদিন ভারত-বর্ষের এই অকল্যাণরূপী চেহারা দেখে বেদনাহত হয়েছি। আমাদের সব আছে, এত প্রচুর আছে যে, আরো বহু হাজার বছর ভিক্ষা না করে বেঁচে থাকতে পারি। যাকে সত্যিকার বাঁচা বলে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন, রাজনীতির বারবণিতা সুলভ আবির্ভাব সমগ্র ভারতবর্ষকে এক

সামগ্রিক ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই চরম ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে আজ দৃঢ় নেতৃত্বের প্রয়োজন। যে নেতৃত্বের থাকবে অকল্যাণ ধ্বংসের এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠার সুনিপুণ ব্যালান্স।

ভারতবাসী একটা জাতি। এ জাতির প্রতিষ্ঠা কীভাবে সম্ভব? দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে আজ জাতি প্রতিষ্ঠায় এত অসুবিধা কোথায়? কী কী গুণাবলী থাকলে একটা ভৌগলিক পরিবেশে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত জাতি সত্যিকার জাতি বলে পরিচিত হয়, যে জাতি মনুষ্য জাতি বলে পরিচিত? এরই সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে সভ্যতা সংস্কৃতিরূপ শব্দাবলী। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "যে জাতির ইতিহাস নাই, তাহার কিছুই নাই।" একদিনে ইতিহাস হয় না একটি ঘটনা ইতিহাসের মাপকাঠি নয়। সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি, মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ—এক কথায় মানবিক জ্ঞানের চরম বিকাশের পরিচয়ের ক্রমলিপি ইতিহাস। এই ইতিহাসরূপ মহাপিতা জাতির মূল ভিত্তি। পৃথিবীর অতি প্রাচীন সভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতা। এবং এটাই আমাদের হাজার হাজার বছর টিকিয়ে রেখেছে। এত বিপুল সম্পদ থাকা সত্বেও আমরা দেউলিয়া হয়ে গেছি। রাজনৈতিক কারণে আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস হতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হতে পারে। তা সত্বেও আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবার কোন কারণ নেই। কেননা আমাদের ইতিহাস আছে, আছে ব্রহ্মাণ্ড সদৃশ জ্ঞান ভাণ্ডার। যা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে প্রয়োজন। তাই এতবড় প্রাণস্পন্দন যে ভারতের আত্মায় বিদ্যমান তার এমন দৈন্যদশা কে করলো! আর কেন আজ ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের কাঙালপনা? ঐ সব কাঙালীদের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন একবার নিজের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখেন, ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তক সম্ভার সঠিক ভাবে অধ্যয়ণ

করেন। তাহলে বুঝতে পারবেন ভারত-আত্মা সংকীর্ণতার বহু উর্দ্ধে মানব কল্যাণে ভারতীয় মণীষা কয়েক সহস্র বছর এখনও এগিয়ে আছেন।

ঋক্ বেদের প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত করলাম। এর পরিপূরক কোন রচনা থাকলে আমায় জানাবেন। "সংগচ্ছধ্বং···সুখহাসতি॥"

এই যে ঐতিহ্য, মহৎ সভ্যতা এত থাক' সত্বেও আমরা ধ্বংসের পথে কেন? কেনই বা স্বাধীনতার চব্বিশ বছরেও আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছি না।

কারণ বহুবিধ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন অন্য দেশ শাসন করে, শোষণ করে; তখন প্রথমেই সে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। নইলে চিরকাল তাকে শোষণ করতে পারবে না। লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠন করলে একটা জাতি ধ্বংস হয় না। জাতিকে ধ্বংস করতে হলে, তার ইতিহাস সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে হবে। ইংরেজ সুনিপুণ ভাবে সে কাজ করে গেছে। বাকী যেটুকু ছিল, স্বাধীনতার পর পাশ্চাত্যের দালালরা সেটুকুও ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর। তাই আজ আমরা Collectivism—এর কথা বলে individualism এর শেষ ধাপে নিয়ে এসেছি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবসাটা খুব বেশীই জমেছে। কারণ বাঙালীরা মানসিকতায় অন্য সবার চাইতে নিজেদের অনেক বেশী রাজনৈতিক সচেতন ভাবেন। এবং এই বিশেষ বোধের জন্য অভারতীয় সব কিছুর প্রতি অপরিসীম টান। বিদেশী সাহিত্য রাজনীতির পাঠ সব কিছু আয়ত্ত করলে কল্পিত উচ্চ সমাজে বাস করা যাবে। এর অন্যতম কারণ, শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ। যে ভাবাদর্শ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজের প্রয়োজনে বিকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা কলোনীগুলোতে চালু করে গেছে। সে কুষ্ঠ রোগকে আজও আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। জাতীয় নেতা যদি সত্যিকার ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে না পারেন, তবে অর্থনীতির যতই প্রসার হোক না কেন,

আরো দু'একটা দেশ জয় করলেও, ভারতমাতার চেহারা বর্ত্তমানের মতোই অনাদর্শীয় থেকে যাবে।

এত দিন ধরে, কেন আমরা ভারতীয় আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছি, আমাদের নেতৃত্ব সফল নয় কেন, ইন্দিরাগান্ধীর নেতৃত্ব দেবার সম্ভাবনা আছে কি না, এসব প্রশ্ন স্বাভাবতঃ আলোচনা সাপেক্ষ এবং তা রাজনৈতিক আলোচনা।

It goes without saying that she is my daughter and I have great affection for her. I have known her closely and it is possible that my assesment suffers from inbalance. But I have a great regard for her qualities and temperament, her energy and her integrity. I do not know what she has inherited from me. I am inclined to think she has dirived these qualities from her mother.

স্বর্গতঃ প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল তাঁর কন্যা ইন্দু যখন ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন, তখন ঐ উক্তি করেছিলেন।

সেদিন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার সময় যতখানি বাধার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল, যতখানি দৃঢ়তা এবং নিজস্ব ক্ষমতার বিচ্ছুরণ প্রয়োজন হয়েছিল; তার অনেকখানি কৃতিত্বই অজ্ঞাতসারে হরণ করে নিয়েছিলেন তাঁর পিতা জওহরলাল। কারণ, জওহরলালের জীবিত অবস্থায় কংগ্রেস এবং সারা ভারতের রাজনীতিবিদদের ওপর তাঁর যে প্রভাব প্রতিপত্তি: সেই প্রভাব এবং প্রতিপত্তির পরোক্ষ সাহায্যেই সেদিন ইন্দিরার রাজনৈতিক গদি আহরণ। হয়তো এর কিয়ৎ পরিমান সত্য হতে পারে, তবে সম্পূর্ণ সত্য নয়। সেদিনকার কংগ্রেস সভাপতি ইন্দিরা এবং আজকের ভারতবর্ষের অপ্রতিরোধ্য নেতা (নেত্রী) প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা পর্য্যন্ত অনেকখানি পথ। সে পথ ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ, সে পথ আলো আঁধারির, সে পথ ধ্বংস অথবা সৃষ্টির দোটানায় দোলায়িত।

সেদিনের কংগ্রেস সভাপতির চোখ থেকে স্বপ্ন সম্পুর্ণ মুছে যায়নি। জীবন সম্বন্ধে মানুষের যা ধারণা, মানুষের যা বোধ, তার অনেকখানিই স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা থাকতো। ইন্দুর জীবনেও সে স্বপ্নের খেলা চলছিল। চলছিল সেটা দীর্ঘ বছরের পর বছর। ঠাকুর দাদা মতিলালের

রাজৈসিক জীবন ধারণ, পিতা জওহরলালের রাজনৈতিক পদচারণা, মায়ের যক্ষা রোগ, ইন্দিরাকে করে তুলেছিল নিঃসঙ্গ অন্তর্মুখীন। নিস্তরঙ্গ সংসার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও, সেখানে অলিখিত ঝড় এসে ইন্দিরাকে বিপর্য্যস্ত করে দিয়েছিল। যার জন্যে, সে কখনো নিজের জন্যে সঠিক পথ নির্ধারণ করতে পারেনি। শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশের প্রভাব পড়বার আগেই তাকে মায়ের শয্যা পাশে উপস্থিত হতে হয়েছিল। নইলে রবীন্দ্র প্রচ্ছায়ায় সে কবি হতো না এটা ভাবার কোন কারণ নেই। এই যে বার বার পথ থেকে সরে যাওয়া বা নির্দ্দিষ্ট কোন পথ গ্রহণ না করা, এটা অন্য মানুষের জীবনে চূড়ান্ত অবক্ষয় নিয়ে আসতো। কিন্তু ইন্দিরার ক্ষেত্রে তা হয়নি। হয়নি, তার কারণ, এসব বিচ্ছিন্নতা, পথ থেকে পথান্তরে গমনা গমন তাঁর অন্তরের গভীরে কখনো আলোড়ন তুলতে পারেনি। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তঃস্থলের মতো তা সর্বদাই অচঞ্চল ছিল। ও যেন পরিবারের ভাঙা-গড়া, ভারতের রাজনৈতিক আলোড়ন সব কিছুর এক নীরব দর্শক। সেই নীরবতা ভঙ্গ হলো কংগ্রেস সভাপতি হয়ে। সেটা যদি জওহরলালের একমাত্র কন্যা এবং বন্ধু হিসাবে হয়ে থাকে তাতেই বা ক্ষতি কি। কারণ, সেদিন শতছিন্ন কংগ্রেসের সভাপতি না হলে, তাঁর আজকের সংস্কারবাদী কংগ্রেসের আবির্ভাব হতো না। অথচ একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে, তৎকালীন কংগ্রেসে অনেক চাঁইরাই জওহর লাল বিরোধী ছিল। সে সব স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদীরা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ পূর্ণ করার অছিলায় জওহরলালকে সমর্থন করতেন। কংগ্রেস কোষাধ্যক্ষ অতুল্য ঘোষ, মোরাজী দেশাই এবং এস, কে, পাতিল। এই তিন মহাপুরুষ সেদিন ভারতের ভাগ্যবিধাতা হবার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ তিনের মধ্যে মোরাজীর আশা প্রধান মন্ত্রী হবার, অতুল্যজীর কংগ্রেস সভাপতি এবং পাতিলের তার পরের কোন ধাপ। ঐ তিনের সঙ্গে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গর মতো

আরো অনেক কংগ্রেসম্যান সেদিন উঠে পড়ে লেগেছিল ভারতবর্ষের মহা সম্পদ লুণ্ঠনের। সে এক এলাহি লুণ্ঠনের যুগ গেছে। ভাবাদর্শি এবং সাহিত্যিক জওহরলাল সেদিন সব জেনে শুনেও এ লুণ্ঠন বন্ধ করতে পারেন নি, পারেন নি লুণ্ঠনকারীদের ধ্বংস করতে। কারণ, দেশ পরিচালনার জন্যে যে পরিমাণ কঠোরতার এবং মমতার সাযুজ্য থাকা দরকার, তা তাঁর ছিল না। কঠোরতার চাইতে মমতার প্রাবল্যই ছিল বেশী।

সেদিনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, জওহরলালের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়া খুব সহজ ছিল না। সেদিন কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে যে নামটা সারা ভারতের উচ্চারিত হচ্ছিল সেটা বঙ্গেশ্বর আতুল্য ঘোষ। কিন্তু, কিছু ভালো এবং সৎ মানুষ যেমন পৃথিবীতে সব সময় থাকে, তেমনি কংগ্রেসও কিছু ভালো এবং সৎ মানুষ ছিল। যাঁরা কংগ্রেসকে আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলেন। সে সব সৎ মানুষরা এবং আরোকিছু কংগ্রেস নেতা বৃহত্তর লুণ্ঠনের জন্যে ইন্দিরাকে পুতুল হিসেবে রেখে জওহরলালকে তোষণ করার পরিকল্পনায় সৎ কংগ্রেসম্যানদের পাশে দাঁড়িয়ে ইন্দিরাকে নির্বাচিত করলেন। এ ছাড়া বৃহত্তর রাজনীতিতে ইন্দিরা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে না থাকলেও পরোক্ষ ভাবে আজীবন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, প্রতিটি রাজনীতিবিদ তাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতেন, জানতেন। তার প্রখর বুদ্ধি বৃত্তির প্রকাশ মাঝে মাঝে তাদের মুগ্ধ করতো এবং অস্বস্তিতে ফেলতো। তাঁরা এও জানতেন ইন্দিরা তাঁর পিতার অনুলিপি নয়, নিজস্বতার ভাস্বরে উজ্জ্বল। Rebel হবার আজীবনের স্বপ্ন জওহরলালের। সে স্বপ্ন সার্থক হয়েছে তাঁর ঔরসজাত কন্যায়। বাকী সব গুণাবলীই সম্ভবতঃ ইন্দিরার মা'র এবং ঠাকুর মার।

আজকের ইন্দিরা একক নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। পরিবারের সবার

গুণাবলীই কিছু কিছু সে পেয়েছে। জন্মাবার মুহূর্তে আরও যা গুণাবলী নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে, সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক বাতাস তাকে মহীরূহে পরিণত করেছে। তাই আজকের ইন্দিরা বিচ্ছিন্ন বা একক নয়। তাকে জানতে হলে জানতে হবে তার সমগ্র পরিবার, ভারত এবং পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। বিশেষ করে নেহরু পরিবারের বিচিত্র ইতিহাস। চরম অব্যবস্থা থেকে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শীর্ষস্থানে পৌঁছেছিল নেহরু পরিবার। মতিলাল, জওহরলাল ও ইন্দিরা এ তিন পুরুষে সমগ্র ইতিহাস। শেষ ধারা কোন পর্য্যায়ে স্থির হবে তা ভবিতব্যের ইতিহাস। ১৮৮৫ খৃঃ-এর প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস যেমন অনধিক ৮৬ বছর পেরিয়েছে, দুর্যোগ এবং সাফল্য মাথায় নিয়ে একশ চোদ্দ বছর পেরিয়েছে নেহরু পরিবার। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ইন্দিরাই শেষ মাইলষ্টোন। এর পর নেহরু পরিবারের আর কেউ নেই। বংশধারা এক বিশেষ জিজ্ঞাসা চিহ্ন নিয়ে স্থির অচঞ্চল।

নেহরুরা মুসলমান প্রধান হিন্দু রাজ্য কাশ্মীরের হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। মতিলালের বাবা সিপাই যুদ্ধের আগে কর্মজীবনের প্রয়োজনে সপরিবারে দিল্লীতে বসবাস আরম্ভ করেন। সুস্থ সুন্দর পরিবার। ১৮৫৭ সালে যখন সারা ভারতে বৃটিশ বেতনভূক ভারতীয় সিপাইরা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। তার কিছু পরেই শেষ মুঘল সম্রাট এবং বিদ্রোহী সিপাইরা নতুন ভাবে আক্রান্ত হলো সুসংগঠিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর হাতে। সংগঠনের অভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো ভারতের স্বাধীন টুকরো টুকরো অংশগুলো। এক ঝলক আলোর পরশ বুলিয়ে আবারও শত বৎসরের জন্যে অন্ধকারে ডুব মারলো। এ যেন অন্ধকার পথে বিদ্যুৎ চমকের পর গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জনের ইতিহাস। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের নপুংষক আক্রমণ সুরু হয়ে গেলো অধিকৃত অঞ্চলের আবাল বৃদ্ধ নরনারীর ওপর।

শুধু পালাও পালাও রব। দীর্ঘদিনের সঞ্চয় গৃহসামগ্রী এবং পূর্ব পুরুষের স্মৃতি সব ফেলে শুধু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয় সিপাইদের দখল করা সহর নগরে বৃটিশ পুনঃপ্রবেশের পর মানুষ মারার এক নারকীয় উৎসব শুরু হয়ে গেছিল। শত শত বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদীর যা রূপ তারই প্রকাশ হয়েছিল সেদিন।

সাম্রাজ্যবাদের রূপ চিরকাল একই রকম। গ্রীক রোম, পারসিয়া থেকে ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু থেকে আধুনিক যুগে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, জার্মান, রাশিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি সবাই নারকীয় অত্যাচারের নাটক বিভিন্ন মঞ্চে বার বার

অভিনয় করে চলেছে। কখনো তা অর্থনৈতিক কারণে, কখনো প্রতিপত্তি রক্ষার্থে, নয়তো ধর্মীয় কারণে। বর্তমান পৃথিবীতেও এ নাটকের পূর্ণ শত রজনী অভিনয় চলছে, গত ২৫শে মার্চ '৭১ এ জঙ্গী নায়ক ইয়াহিয়াও সে রকম এক নারকীয় নাটকের অভিনয় চালিয়ে রেকর্ড করেছে। চতুর্দ্দশ বৎসর ধরে আমেরিকা তেমন অত্যাচার চালাচ্ছে ভিয়েতনামে, এমনি আরও অনেক আছে। কোরিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লাভ, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, বাংলাদেশ।

এ অত্যাচার কাদের বিরুদ্ধে? সে একই উত্তর। তিন হাজার বছর আগে যা, আজও তা, সাধারণ মানুষ। পৃথিবীর রূপ লাবণ্য ভোগ করার সমান অধিকার নিয়ে যারা পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে। সেই সাধারণ মানুষরাই কতিপয় মানুষের লোভে আত্মবলি দিয়েছে কাতারে কাতারে। পৃথিবীর এ অত্যাচারের ইতিহাস পাঠ করলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, মানুষ আর পশুতে পার্থক্য কোথায়? বুদ্ধিতে ব্যবহারে? মানুষ মানুষের কথা ভাববে, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর উন্নতি বিধানের চেষ্টা করবে, বিরুদ্ধ প্রকৃতির বুকে সঙ্গবদ্ধ ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে। অথচ মানব জন্মের শুরু থেকে সভ্যতার ক'পাদ আমরা এগিয়েছি একথা ভাববার বিষয়। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় সিপাই অধিকৃত অঞ্চলে বৃটিশ অত্যাচার পশুত্বকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

মতিলালের বাবা দিল্লীর সেই নারকীয় রাতে অন্তঃস্বত্বা স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি ও পরিজন নিয়ে দিল্লী থেকে পালিয়ে যান সবার প্রাণ রক্ষার্থে। মতিলালের বাবা বহ্ন্যোৎসব থেকে পালাতে পারলেন না। এমনি অনেকে রয়ে গেলেন পথের বুকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল আত্মীয় পরিজন এখানে সেখানে। মতিলালের মা অন্য পরিবারের সঙ্গে আগ্রায় আশ্রয় নিলেন।

মাতৃগর্ভেই মতিলাল দিল্লী ছেড়ে আগ্রায় এলেন। তারপর এলাহাবাদের আনন্দ ভবন। সেই রিক্ত নিঃস্ব মতিলাল অদম্য ইচ্ছা

শক্তির জোরে নিজেকে বৃটিশ ভারতে অর্থশালী ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং 'অর্থই পরমার্থ' এই নীতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উচ্চ বর্ণের বৃটিশদের মতো জীবনধারণের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর বাড়ীর পরিবেশ ছিল ঐতিহ্যবাহী মুসলিম এবং ইংরেজ সংস্কৃতিতে পূর্ণ। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান তার সমস্ত গোঁড়ামীকে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে এক মিশ্র সংস্কৃতির বাহক করে তোলেন। আজকের অনেক রাজনৈতিক নেতারা যেমন ইংরেজী হটাও শ্লোগান দিয়ে ছেলেকে ইংরেজী শিক্ষার্থে বিদেশে পাঠান। তেমনি ধারায় নেহরু পরিবারে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। কংগ্রেসের একটা বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। বিড়লা ভাইদের অতি সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর প্রতি তার বিরূপ ধারণাও ছিল। তা সত্বেও মতিলাল সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন নি। বৃটিশদের প্রতি তাঁর যে মোহ, সে মোহমুক্তি ঘটিয়েছে তাঁর ছেলে জওহরলাল এবং গান্ধীজী।

ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষার প্রতি তিনি এমনই মোহাবিষ্ট ছিলেন যে, নিজের সংসারের প্রতিটি খুটিনাটি ব্যাপারে হয় ইংরেজ সংস্কৃতি, নয় মুসলমান সংস্কৃতি। অর্থাৎ ভারত শাসন করেছে যারা এবং শাসন করার যোগ্যতা যারা রাখে, তাদের অনুসরণ করা। এ শুধু অনুসরণ করা বললে ভুল বলা হবে। এ হচ্ছে, ঐ দুই সংস্কৃতিকে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা। নিজের রক্তে ভারতীয় দোষ যতখানি আছে, তা যেন তার ছেলে মেয়েদের রক্তে না থাকে। এ জন্যে তিনি তার সঞ্চিত অর্থ জলের মতো ব্যর করেছেন ছেলের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর অদম্য আগ্রহ ছিল জওহরলালকে Hwrowতে ভর্তি করানো, তাই তিনি করেছিলেন। বাড়ীতে দুই মেয়ে নানী এবং বেটীর পড়াশুনা এবং সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল পাশ্চাত্ত্য গভর্ণেসের হাতে। কাজেই কায় মনোবাক্যে মতিলাল যে সাম্রাজ্যের রবাহূত বাসিন্দা হবার জন্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, সেখানে ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রাম গার্ডেন পার্টির রঙিন ফানুস ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ গান্ধীকৃত ভারতের স্বাধীনতা অন্দোলনের ইতিহাসে মতিলাল এবং তাঁর সমগ্র পরিবার এক অপ্রতিরোধ্য নাম। এটা কেমন করে সম্ভব হলো? কোন মন্ত্র বলে এমন ধারার পরিবর্ত্তন হয়? একমাত্র আনন্দ ভবনে পরিত্যক্ত একটা কোণে ভারতের সংস্কার এবং প্রতীকের একটি ছোট প্রদীপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

হ্যাঁ, মতিলালের স্ত্রীই সেই গৃহের ভারতীয় প্রতীক। নেহরু পরিবারের ইতিহাসে তাঁর অবস্থান তার জাগতিক অবস্থানের মতো অতি ক্ষীণ; মতিলাল তাঁর পরিবার থেকে যেভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, তার প্রতিষ্ঠা আবার কি করে সম্ভব! সেই অভারতীয় শিক্ষার প্রভাবে জওহরলাল একবার বলে-ছিলেন, দুর্ঘটনা বশতঃ, হিন্দুর ঘরে জন্ম হয়েছে। সংস্কারের দিক থেকে মুসলমান, শিক্ষায় ইংরেজ এবং ধর্ম বিশ্বাসে বৌদ্ধ। নানী অর্থাৎ বিজয়লক্ষ্মী এবং বেটী অর্থাৎ কৃষ্ণা মনে প্রাণে পাশ্চাত্ত্য পোষাকে আবৃত। রক্তের মধ্যে বহু বছরের সংস্কার যেভাবে মিশে আছে, জোর করে তার অবলুপ্তি সম্ভব নয়। অনুকুল আবহাওয়া তাকে সরূপে প্রকাশ করেছে। হয়তো আগের সেরূপই ভারতীয় সে ধারা প্রকাশ হয়নি, প্রকাশ হয়েছে ভিন্নভাবে। তবুও তা ভারতীয় ধারা ছাড়া আর কি? নইলে ইংলেণ্ডকে নিজের দেশ ভাবার যারা পক্ষপাতি, বৃটিশ মুক্ত ভারতের কথা তারা ভাবেন কি করে? একি শুধু অর্থ এবং ক্ষমতার লোভে? আসলে তৎকালীন ভারতীয় ব্যবস্থায় মতিলালের মতো না হলে অর্থ এবং প্রতিপত্তি অর্জন করা অসম্ভব ছিল। সারা ভারতেই তখন ইংরেজী শিক্ষা এবং সংস্কার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের হাতিয়ার ছিল। নইলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী থেকে বিতাড়িত নেহেরু পরিবার রিক্ত নিঃস্ব অবস্থায় এক পুরুষের মধ্যে বিপুল ধন সম্পদের অধিকারী হলেন কি করে? একদিক থেকে সংস্কারহীন জীবনযাত্রা তাঁর পরিবারকে

ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করেছিল। সংকীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা ওদের স্পর্শ করতে পারেনি। এবং সেই কারণেই জওহরলাল নীল রক্তের সংস্পর্শে থাকা সত্বেও সোসালিজমের প্রতি অনুরক্ত হন। এই জন্যেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে গান্ধীনীতি বা Policy কে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। তার বক্তব্য ছিল, রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা যদি না আসে তাহলে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থই মূল্যহীন এবং তার জন্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনটা সমস্ত পৃথিবীর শোষিত মানুষের জন্যে। ইংরেজের ঘরের দোর গোড়ায় নিঃসম্বল মানুষদের দেখে তার মনে হয়েছিল পৃথিবীর সব জায়গায় শোষিত মানুষের চেহারা এক। সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাক বা না থাক। এই স্বাধীন চিন্তার সুযোগ এসেছিল বিশেষ কোন সংস্কারের বশীভূত না হওয়ার জন্যে। জওহরলাল এক জায়গায় বলেছেন, "বাইরে ঘুরে ঘুরে আমার দৃষ্টিভঙ্গী অনেক ব্যাপক হয়েছে"। আরো দেখতে চাই"।

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষীণ ধারা নেহরু পরিবারে অন্তঃ সলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত ছিল। জওহরলালের মা জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদের এক কোণে নিজের বিশ্বাস, ধর্ম ও সংস্কার আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। মতিলাল সে ক্ষীণ শিখাটা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রখর আলোকে কখনো অদৃশ্য করে দিতে পারেন নি। তারপর সে আলোক বর্তিকা তাঁর পুত্রবধু কমলার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীর সহযোগীতা, দেশের প্রয়োজন এবং পতিব্রত্যের পরাকাষ্টা হিসাবে স্বামীর আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে অকালে আত্মোৎসর্গের এমন স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত খুব বেশী পরিমাণ নেই। সংসারের অদৃশ্য ভার গ্রহণ করেও দেশের প্রয়োজনে পথে। নারী সংগঠন থেকে সমাজ সেবা, আইন অমান্য আন্দোলন। রোগ মুক্তির প্রয়োজনে কলকাতা যাবার মুখে বিহারের ভূমিকম্প।

শরীরকে উপেক্ষা করে স্বামীর পাশে পাশে দুর্গতের সেবা—এ'
সব এক মহান দৃষ্টান্তের অধিকারী কমলা নেহরু। বিলাসিতায়
জীবন অতিবাহিত করার মতো যার প্রচুর সম্পদ, সে এসে পথে
নেমেছে সাধারণ মানুষের পাশে; সেদিনের পরাধীন নির্যাতিত
সাধারণ মানুষের পাশে। এও সেই শ্বাশুড়ীর ভারতীয় সংস্কৃতির
আলোক রেখার ক্ষীনাংশ। সমস্ত মানুষই অমৃতের সন্তান, এই
আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে—মতিলাল যশ চেয়েছেন, অর্থ চেয়েছেন;
জওহরলাল পৃথিবীর অলিখিত নায়ক হতে চেয়েছেন। এসব সত্যি
ধরে নিয়েও বলা যায়, কমলা নেহেরু কি চেয়েছেন? স্বামীর
বিশ্বাস এবং আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে। ঘরের নিরালা পরিবেশে
পাওয়া যাবে না বলেই পথে নেমে এসেছিলেন। সংসারকে সবাই
যে চোখে দেখে, কমলাও সে ভাবে হয়তো দেখেছিলেন।
বাস্তবে এসে দেখলেন, স্বামী তার অন্য ধাতুতে গড়া। কি এক
গভীর স্বপ্নে যেন আত্মভোলা। সে আত্মভোলা স্বামীকে পেতে
সে ভাবেই পেতে হবে। সে পাওয়ার আশায় কিছু কেন অনেক
কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে। স্বামীর কর্মধারা এবং সহযোগী হতে
পারে এমন পুত্র সন্তান উপহার দিতে পারেননি। তাঁদের পুত্র সন্তান
পৃথিবীর আলো দেখতে পেলো না। একমাত্র অযত্নে বর্ধিত কন্যা
ইন্দু ছাড়া আর কেউ রইলো না।

কমলা ও জওহরলালের দেশের কাজের জন্য উল্কা পিণ্ডের
মতো ঘুরে বেড়ানোর বাধা স্বরূপই ছিল ইন্দু। ভাসাভাসা দুটো
চোখ দিয়ে বাবা মাকে অনুভব করার, বুঝবার চেষ্টা করতো।
প্রচণ্ড জীবনী শক্তি না থাকলে স্নেহ থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায়
আজ এত বড় হতে পারতো না। পৃথিবীর সমস্ত মহৎ ব্যক্তির
জীবনই ঘটনা বহুল হয়ে থাকে। কিন্তু, পৃথিবীর নগন্য সংখ্যক বিশেষ
ব্যক্তিত্ব আছে যাদের সুকুমার বৃত্তির উপর দুর্ঘটনার ঘনঘটা। যেসব

ঘটনা মানুষের মানসিক বিকাশের পরিপন্থী, তেমন ঘটনাই ইন্দুর জীবনে বার বার ঘটেছে। তেমনি সব ঘটনার পর একটা ব্যক্তির প্রকাশ হওয়া সম্ভব অমানবিক পর্য্যায়।

ভারতের আকাশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের একমাত্র সন্তান ইন্দিরা। অথচ ছোট মেয়েটির জীবনে প্রতি মুহূর্ত্তে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। শিশুর নিরাপদ আশ্রয়স্থল মাতৃক্রোড়। কিন্তু অ্যান্টির কোলই তার প্রত্যক্ষ মাতৃক্রোড়। ১৯২১ সালের নভেম্বরে ইন্দুর বয়স যখন পুরো চার বছর, সে সময় ওর বাবা এবং ঠাকুরদাদা পঞ্চম জর্জের ভারত আগমনের প্রতিবাদে বন্দী হলেন। তাদের সে বিচারে জরিমানা হয়েছিল ২০০ টাকা করে। জরিমানার সে টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাদের সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং জরিমানার টাকা আদায়ের জন্যে তৎকালীন বৃটিশ সরকার বাড়ী জিনিষপত্র ক্রোক করতে আদেশ দেন। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ইংরেজ পুলিশ আনন্দ ভবন থেকে সমস্ত দামী দামী সামগ্রী সরিয়ে নিতে থাকে। সে সময় মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্দু অবিচার সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। অসহযোগ প্রতিবাদের আদর্শে বিশ্বাসী একটি পরিবারে প্রথম সরব প্রতিবাদ। সেদিন ইন্দুর বয়স আরও বেশী হলে ইন্দু পিতার মতো ধৈর্য্য ধরে অত্যাচারের নীরব দর্শক থাকতেন কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ দেশ পরিচালনের ক্ষমতা থাকলে, সেই অহিংস চিন্তাধারার যে বিসর্জন দিতে হয়,, বেঁচে থাকা কালীন গান্ধীজীও তাই প্রত্যক্ষ করে গেছেন। ভারত স্বাধীন হবার প্রাক্ মুহূর্তে বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার বদলা হিসাবে বিহারে মুসলমান হত্যার যে নাটক অভিনীত হয়েছিল, গান্ধীজীর অনুমতি সাপেক্ষে তা কি নির্মম ভাবে দমন করা হয়নি? অথচ ১৯১৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত এই অহিংস নীতি কেবল বৃটিশ এবং মুসলিম লিগের ব্যবহারেই ব্যবহৃত

হয়েছে। আজ ভাবতেও অবাক লাগে, ভগৎ সিং-এর ফাঁসী মকুব ও যতীন দাসের অনশন বন্ধের জন্যে সেদিন বাপুজীকে অনেকেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু অহিংস গান্ধীজী সেদিন নিজের দেশের দুজন বিপ্লবীকে বাক্যে সহিংস আক্রমণ করেছিলেন। এমনি আরো বহু নজীর ইতিহাসের পাতায় আছে। মতিলালকে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে বাংলাদেশে যে রাজকীয় সম্মান দেখানো হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে গান্ধী রসনা বড় তিক্ত হিসাবে বর্ষন হয়েছিল। "পার্কসার্কাসের সার্কাস বলে সেদিন তিনি কংগ্রেস সভাপতি তথা নেহরু পরিবারকে বিদ্রুপ করেছিলেন। সম্ভবতঃ ইন্দিরাই ১৯২৯ সালে নেহরুর অহিংস পরিবার থেকে সঘৃণা প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সশস্ত্রও কিছু পরিমানে বলা যায়। কেন না সেদিন তার ছোট দুখানি হাত বাধা দেবার জন্যে মুখর হয়ে উঠেছিল। একটু অনুসন্ধিৎসার আশ্রয় নিলে পণ্ডিত জওহর-লালকেও ভালোভাবে জানা যায়। গান্ধী শিষ্য হিসাবে জওহরলালের প্রতিষ্ঠা হবার আগে; ছাত্র জওহরলাল যখন ১৯০৪ সালে বিদেশের মাটিতে পা দেন, তখন থেকে সুরু তার বিশ্বের শোষণ সম্বন্ধে অন্বেষা লব্ধ জ্ঞান।

বিত্তশালী পিতার একমাত্র পুত্র Harrow পৌঁছিবার পর গার্ডেন পার্টি, আলাপ আলোচনা, আদর্শের সংঘাত, এবং ফার্দিনান্দ ক্রুকস-এর নিরলস পাঠক হিসাবে তাঁর তৎকালীন দিনাতিপাত। কিছুদিন পরই তিনি অন্য সহপাঠী ছাত্রদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝলেন, সে দেশের ছেলেরা এবং অনেক লোকেরা অগভীর চিন্তাধারায় অভ্যস্থ। সেই ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বৃটিশ রাজনীতি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর দেশের জাতীয় আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ক্রমাগত পাল্‌টাচ্ছে। কিন্তু সেখানে এমন কেউ ছিলনা, যাদের সঙ্গে উনি ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন বা ওয়াকিবহাল হতে পারেন।

ভবিষ্যৎ ভারতের যিনি কর্ণধার হবেন, নিয়তি তাকে সম্ভবতঃ তেমন সুযোগ দিয়ে থাকেন। ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র জওহরলালই সম্ভবতঃ ভাগ্যদেবীর কৃপা পেয়েছেন সবচেয়ে বেশী। তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং চেহারার আকর্ষণ এমন লোকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়েছে, যে যোগাযোগের প্রস্তুতি বা ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিলনা। সম্ভবতঃ ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বহু বিতর্কিত নায়ক হবার সম্ভাবনা সে সব মনীষারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অবশ্য ইউরোপে বহুল প্রচারের অনেকখানি দায়িত্ব সেদিন ইণ্ডিয়া লীগ-এর সেক্রেটারি কৃষ্ণ মেননের হাতে ছিল। কৃষ্ণমেননের ধারণা ছিল একমাত্র জওহরলাল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা রাখে। মহাত্মাজীর উপর তাঁর খুব আস্থা ছিল না।

সৌভাগ্য বশতঃই জওহরলাল সেদিন পুরস্কার স্বরূপ একটি বই পেলেন। যার সূত্রে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি আলোক-বর্তিকা প্রত্যক্ষ করলেন। বইটা জি, এম, ট্রেভেলিয়ান—এর গ্যারিবল্ডি এবং ইটালিয়ান ইউনিফিকেশন। সেদিন জওহরলালের চিন্তাধারায় ভারত এবং ইটালী অদ্ভুতভাবে এক হয়ে গিয়েছিল। এরপর এক ছুটিতে উনি আয়ারল্যাণ্ড-এ গিয়েছিলেন। পৃথিবীর এক সফল জাতীয় আন্দোলনের পীঠভূমি। সেখানেই উনি সিন্‌ফিন্ আন্দোলনের পরিচয় পান। স্বাধীনতা আন্দোলনের বৃহত্তর অংশিদার বাংলাদেশ এই সিন্‌ফিন্ জাতীয় আন্দোলনের সেবক হয়েছিল। বিভিন্ন বিপ্লব এবং আন্দোলনে নিষ্ঠাবান পাঠক হিসাবে ও তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রক্ষেপনায় জওহরলাল চিন্তাধারায় এক অগ্নিগর্ভ মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়েই বলতে গেলে তিনি সোস্যালিজম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন। সে সময় সাধারণতঃ উনি 'শ', নীৎসে, হ্যাবলক এলিস, ক্র্যাফট্ এবং অটো ওয়াইনজার প্রমুখ সাম্রাজ্যে বিচরণ করতেন। ফেনার ব্রক-ওয়ের সঙ্গেও পরিচয়ও সে সময়ে। সে সভায় বার্ণাড-শ-এর কাছেই

ছিল তাদের উপস্থিতি। ফেনার তখনকার বৃটিশ স্যোসালিজমের প্রবক্তা বললেও চলে।

পরিপূর্ণ যুবক জওহরলালের মস্তিষ্কের ক্রিয়া যত প্রবল, ততখানি কর্ম্মক্ষম তার শরীর ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা মানসিক দিক থেকে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেননি তখনও। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য রাজনীতি সবকিছু একের পিঠে অন্যে, চড়ে বসে এক ধরণে অব্যবস্থা করে তুলেছিল। শেষদিন পর্য্যন্ত জওহরলালকে অনুধাবণ করলে একথা স্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, উনি শেষদিন পর্য্যন্ত সঠিক রূপে বিকাশ হতে পারেন নি। মহাসাগরের মতো পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও হিমালয় সাদৃশ্য দেশের দূরবস্থারূপ ঝামেলা, আদর্শের সংঘাত এবং সৎ সহযোগীর অভাব তাকে অপূর্ণই রেখে দিল।

"You will see the consiquence" কংগ্রেস বিভক্ত হবার প্রাক্ মুহুর্তে বাঙ্গালোরের নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনের পর ইন্দিরার এই উক্তি সেদিন কজনকে ভুমিকম্পের মতো নাড়িয়ে দিয়েছিল বলা মুস্কিল। তবে, স্বাধীন ভারতের বৃহৎ অর্থনৈতিক অব্যবস্থার মধ্যে এমন দৃঢ় অভিব্যক্তি আর কারও দেখা যায়নি। যারা জওহরলাল কন্যাকে পুতুল প্রধান মন্ত্রী করে রেখে সমগ্র ভারতবাসীর অন্ন নিজেদের হাতের মুঠোয় রাখবার স্বপ্নে বিভোর, তারাও সেদিন সে উক্তির তাৎপর্য্য বুঝতে পারেননি। পারলে নিজেরা সচেতন হতেন।

প্রচণ্ড তিক্ততা নিয়ে ইন্দিরা সেদিন অধিবেশন থেকে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড ক্ষোভে বলেছিলেন, "You will see the consiquence." সেই Consiquence মোরারজী দেশাই অনুভব করলেন বড় প্রকট ভাবে : অর্থ দপ্তরের পৈতৃক গদীটি হারালেন মোরারজী।

জওহরলালের মানসিকতার ফসল ইন্দিরা কোন মন্ত্র বলে এমন স্থির মানসিকতা পেলেন? আবারও সে কথাটা বলতে হয় যেটা অনেকাংশে সত্য। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে ১৯৫৯ সালে ইন্দিরা

নির্বাচিত হবার পর তাঁর পিতা জওহরলালের উক্তি। "It goes without saying that she is my daughter and I have great affection for her. I have known her closely and it is possible that my assesment suffers from imbalance. But I have a great regard for her qualities and temperament, her energy and her integrity. I do not know what she has inherited from me. I am inclined to think she has derived these qualities from her mother."

জওহরলালের এ উক্তি অভিমান প্রসূত নয়। অনেকখানি সঠিক পথে এগিয়েছে। কারণ, দীর্ঘ সময় ধরে পিতার পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও', যে সময় স্থির মানসিকতার প্রস্তুতি তখন সে তাঁর মায়ের কাছে। মায়ের জীবন থেকে পেয়েছে সহনশীলতা এবং স্থির প্রতিজ্ঞা। ঠাকুরমার কাছ থেকে পেয়েছে ভারতীয় আদর্শ, ঠাকুরদাদার কাছ থেকে পেয়েছে প্রচণ্ড প্রাণ শক্তি এবং পিতার কাছ থেকে পেয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা ও বিদ্রোহীর ভূমিকা। হ্যাঁ, জওহরলাল শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে বিদ্রোহীর ভূমিকার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সেই বিদ্রোহের সুর ছিল। জাতিভেদ প্রথার বিলুপ্তি যদিও মতিলাল থেকে সুরু, কিন্তু জওহরলাল সেটাকে প্রকট ভাবে ধারণ করে রেখেছিলেন। লণ্ডনে থাকা কালীনই তিনি স্বাধীন ভারতকে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে কল্পনা করেছিলেন এবং তাঁর ধারণাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। আর যে সামন্ত তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ভারতের রক্তমাংস। সেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা সমগ্র জনসাধারণের কখনোই অর্থনৈতিক সুরাহা হবে না, একথাও সম্ভবতঃ জওহরলাল প্রথম অনুভব করেছিলেন। তাই তার ভাবনা চিন্তা ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

ব্যারিষ্টার হয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর নেহরু ভারতীয় সমাজ

ব্যবস্থা এবং রাজনীতির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। সেদিন তাঁর ক্ষেদোক্তি আজও কি বিরাট সত্য হয়ে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "Few experiences are more dreary than sitting with high placed oficials, both English and Indian, in that seat of Empire, New Delhi, and listening to their unending talk about promotions, leave rules, furloughs, transfer, and little tid bits of service scandal'.…'all these people lived in a world apart, cut off from the mosses and even the lower middle class. Politics were confined to this upper strata.

আজও ভারতে সেই একই ধারা চলে আসছে। অকর্মণ্য বাকসর্বস্ব সবজান্তা কিছু ব্যক্তিত্ব আজও ভারতের অধিকাংশ জনসাধারণের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা। Moss কথাটা মেষ থেকে এসেছে কিনা জানিনা। তবে এটা জানি ভারতের High level inteleclualsরা জনসাধারণকে তাই ভাবেন। নইলে, বিভিন্ন রকম বাক সর্বস্ব আদর্শের ঠুলি পরিয়ে সেই Moss কেই মেষের অস্তিত্বে ঠেলে নিয়ে যাবার সার্থকতা? আসলে শোষিত মানুষের পক্ষে যত ভালো আদর্শের আবির্ভাব হোক না কেন, সৎ ব্যক্তিত্ব এবং কঠোর পরিচালক নাহলে তেমন আদর্শের রূপায়ণ কখনোই সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে সে নজিরের অভাব নেই। অসৎ ব্যক্তিত্ব সৎ আদশের রূপকার এমন নজির একটিও নেই। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত, এই বিরাট সংগঠনে কোথায় যেন গলদ রয়ে গেছে। আজকের নেতা (নেত্রী?) ইন্দিরা গান্ধী সেই গলদ দূর করার মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন এবং কংগ্রেসকে সৎ এবং দেশহৈতষী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের চেষ্টায় ব্রতী। ১৮৯২-৯৪ সালে সদ্য আই, সি, এস শ্রীঅরবিন্দও কঠোর সমালোচনা করে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তখন থেকে জওহরলাল পর্য্যন্ত সময়ের ব্যবধানে কংগ্রেস চরিত্রে কোন পরিবর্ত্তন আসেনি।

আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, অধ্যাপক, বৃটিশ প্রভাবে ধনী ইত্যাদি ব্যক্তিদের অবসর যাপনের আড্ডাস্থল এই কংগ্রেস প্লাটফর্ম। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিরাট যজ্ঞের পুরোহিত হিসাবে কংগ্রেসের যে ভাবমূর্তি স্বাধীনতার মুহূর্ত থেকে তা ফাটকা বাজীর এক আরৎখানা। জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে অনেকেই জেলে, কেউ কেউ মৃত, কেউ বা দেশান্তরিত। দু'চারজন ছাড়া বাকী সব তৃতীয় শ্রেণীর নেতারা নিছক একটা গান্ধী টুপির জোরে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বৃটিশ পরিত্যাক্ত ক্ষীণ সম্পদকে আত্মসাৎ করার অদম্য প্রতিযোগীতায় নেমেছিল। যখন দেশ গঠনের জন্যে আপামর জনগণের কৃচ্ছতার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তারা সেই কৃচ্ছতাই করলো কতিপয় স্বার্থান্বেষী কংগ্রেসম্যান ও অকংগ্রেসম্যানদের জন্যে।

১৯৬৬ সালে এক গ্রামীন সৎ কংগ্রেস ম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যখন পশ্চিম বাংলায় প্রবল খাদ্য সংকট—"কংগ্রেস বিরোধী সংগঠন এত প্রবল কেন? কম্যুনিষ্ট প্রতিপত্তি এত বাড়লো কেন? কংগ্রেস কি আবার সেই পূর্ব প্রতিপত্তিতে ফিরে আসবে?" খুব ধীর স্থির ভাবে তিনি নিরপেক্ষ ভাবে উত্তর দেন। তার বক্তব্য, "কংগ্রেস ধ্বংসের জন্যে কংগ্রেসীরাই দায়ী। চুরি—জোচ্চুরি, গদী টিকিয়ে রাখার জন্যে যে কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করা এবং স্বজাতি পোষণ জাতীয় কারণে কংগ্রেসে যে ঘূণ ধরেছে তারই অবশ্যম্ভাবি পরিনতি এই। কংগ্রেস শেষ হয়ে যাবে। দেশ স্বাধীন হবার পর, মানুষের জন্যে দু মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করতে পারলে কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হতো না হয়তো ভারতে, এত প্রবল হওয়াও দূরের কথা। দেশের যা অবস্থা, তাতে দেশটা আবার পরাধীন না হয়। না, না, কংগ্রেস বা কম্যুনিষ্ট কেউই দেশের ভালো করতে পারবে না। দেশটাকে নিজের দেশ ভাবতে তার ভালো করার প্রশ্ন আসে কোথায়। কমুনিষ্টরা কি এটাকে নিজেদের দেশ ভাবে?" তার বক্তব্যের বিরোধীতা সেদিন করিনি।

যে স্বপ্নোত্থিত আবেগে সেদিন উনি কথাগুলো বলেছিলেন। তার সে বলায় যে স্বপ্নের আভাষ ছিল, তা সাধারণ মানুষের মনে আজও আছে। সমস্ত সুকুমার বৃত্তিকে ধ্বংসকারী যে কম্যুনিষ্ট আদর্শ তাকে সাধারণ মানুষ মনে প্রাণে চায় না। এর কারণ বহুবিধ। বিশেষ করে ভারতীয় সংস্কার দীর্ঘ কয়েক হাজার বছরের রক্তে মিশে যাওয়া দর্শন মানুষকে বস্তু তান্ত্রিক প্রতিকূল আবহাওয়া দিয়েছে। বস্তু-তান্ত্রিকতার সঙ্গে একটা অধ্যাত্ম জীবন এখানকার মানুষের জীবনে একটা স্থিরতার আভাস দিয়েছে। ভারত ব্যাতিরেকে অন্য দেশে বস্তু-তান্ত্রিকতাই প্রধান। তাই তাদের জীবনে জাগতিক সুখের প্রাবল্য। প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সে বেঁচে থাকায় নেই কোন আয়েশের অবসর, নেই যতি চিহ্ন। এই যে উদরপূর্তির পৃথিবী এতে আমেরিকার মতো ক্যাপিটালিষ্ট দেশ যেমন আছে, রাশিয়ার মতো সোসালিষ্ট দেশও আছে। ভোগের পৃথিবীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবলে দুয়ে কোন পার্থক্য নেই। ভারতীয়তায় সেই ভোগের জগৎ এত প্রকট আদর্শে রূপায়িত নয়। জীবন যাত্রার ধর্মের অনুশাসন তাকে পুরো বস্তুতান্ত্রিক হতে দেয়নি। অতি অল্পে তুষ্ট সম্ভবতঃ ভারতীয়রাই। হয়তো ধুরন্ধর স্বার্থান্বেষীরা এই ধর্মীয় অনুশাসনেও তাদের স্বার্থসিদ্ধির অনুশাসন ঢুকিয়েছে, ঢুকিয়েছে জাতিতত্ত্ব রূপ বিভেদের। তবুও এই ভারতীয়দেরকে দীর্ঘকালের মানসিক গঠনে জাগতিক এবং আধাত্মিক ভাবধারা এক বিশেষ Balance এনেছে। তাই এখানে কম্যুনিজমরূপ বস্তুতান্ত্রিকতা সম্ভব নয়। নইলে কার্লমাক্সের হিসেব অনুযায়ী কম্যুনিষ্ট আন্দোলন রাশিয়ার পরিবর্ত্তে ভারতেই প্রথম হতো। এবং প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সর্বত্র এই ধারার প্রবর্ত্তন হতো। কিন্তু তা হয়নি। বরং পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট আন্দোলন কেমন এক থেমে পড়া বা কখনো পেছিয়ে পড়া অবস্থায় এসে পৌছেছে।

জওহরলালও রাশিয়ার স্যোসালিজমের নিষ্ঠাবান অনুসরণকারী

হতে পারেননি সেই বিদ্রোহীর ভূমিকার জন্যে। হিটলার—মুসোলিনির একনায়কত্বে বিরোধী যেমন ছিলেন, রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট একনায়কত্বও তিনি পছন্দ করতেন না। অথচ উনি ভাবতেন স্যোসালিজমের কথা। তার রূপ কেমন হবে সে মুহূর্তেই মনে দানা বাঁধেনি। ১৯২৭ সালে এক বছর ন'মাস বাইরে থাকার পর বাবাকে আরও তিন মাসের জন্যে ইউরোপে রেখে এসে দেশে ফেরার পর বলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি Was wider, and nationalism by itself seemed to me......definitely a narrow and insufficient creed. Political freedom, independence, were no doubt essential, but they were steps only in the right direction." পৃথিবীর ঘটনাবলীতে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছিল যে তৎকালীন বর্তমান সময় দ্রুত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। এবং সেই পরিবর্ত্তনের যুগে সমাজ-স্বাধীনতা এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমান ব্যবস্থা না থাকলে 'neither the country nor the individual could develop much.

এই যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ স্বাধীনতা পরবর্ত্তী যুগে socialistic pattern of society কথাটার সামঞ্জস্য সূচক। সেই ধাঁচ বা pattern কথাটি নিয়ে কংগ্রেস বিরোধীদের এক মুখরোচক আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ান। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যারা আস্থাশীল, তাদের ধারণা এক নায়ক নেহরু ট্র্যাপেজের খেলায় তাল সামলাতে না পেরে এই ধরনের জগাখিচুড়ি একটা ধারণা খাড়া করে ভারতের শোষিত মানুষকে ধোঁকা দিতে চাইছে। এর ওপর বিরোধীদের রসনা সিক্ত করার মতো আরও অনেক কথা এসেছে Democratic socialism-রূপ কথা। তাদের মন্তব্য ছিল একি, সোনার পাথর বাটী!' কিন্তু সে সব বক্তাব যদি জওহরলাল নেহরুর ছাত্রাবস্থা যৌবন এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ধারণা সম্বন্ধে জ্ঞাত হতেন, তা হলে এমন মন্তব্য করতেন না। ভারতবর্ষে যখন স্যোসালিজমের ধ্যান ধারণা রূপ নেয়নি, তখন

জওহরলাল স্যোসালিজমের কথা ভেবেছেন, সোসালিষ্ট দেশ রাশিয়া ভ্রমণ করেছেন। কাজেই সোসালিজম কি এবং কেমন এ ধারণা তাঁর পুরোপুরি ছিল। আমরা, যারা সাধারণ. তারা কোন ইজম বা ডক্‌ট্রিন এর নতুন ধারণার প্রক্ষেপণ করতে পারিনি। কারণ আমাদের সে পরিমাণ চিন্তার গভীরতা নেই, যাতে মানবতার নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করার মতো ক্ষমতা রাখি। কিন্তু পৃথিবীর অনেক মণীষার খবরই আমরা রাখি, যাঁরা পুরণো ধ্যান ধারণা ওলট পালট করেছেন বা নতুন ধ্যান ধারণা প্রবর্ত্তন করেছেন। পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং প্রবর্ত্তন করার মতো পাণ্ডিত্য ও মণীষা জওহরলালের ছিল। ছিল বলেই সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় নতুন যোজনা ঘটিয়েছেন।

১৯৩৮ সালে ফরাসী দেশে যে ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক আকার নিয়ে সামুদ্রিক তরঙ্গ এনে দিয়েছিল, তা কি কম্যুনিষ্ট আন্দোলন, না গণতান্ত্রিক আন্দোলন কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে? কোনটাই নয়; কারণ, ও দুটোর বিরুদ্ধেই সেদিন ছাত্র সমাজ গর্জে উঠেছিল। আজকের অনেকেই হয়তো বলবেন, ফিউডাল শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই ছিল তাদের আক্রমণ। একটু খতিয়ে দেখলে এবং জার্মান ছাত্র নেতা লাল ড্যানিয়েলের বক্তব্য অনুধাবন করিলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র দুটোকেই বর্ত্তমান পৃথিবীর দুরবস্থাকে হটাবার জন্য খুব কার্যকরী পথ বলে তাদের মনে হয়নি। তারা চেয়েছিলেন সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মিলিত রূপ, জওহরলালের তিরোধানের প্রায় চার বছর পর ডেমক্রাটিক সোস্যালিজমের বিশ্বব্যাপী প্রচার।

এমনি দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল জওহরলালের। সারাজীবন সব কিছুকে গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন, নিজের বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু কখনো সে বক্তব্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন না। তার আগোছালো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকটা

মহামতি রাসেলের মতো। মানবাত্মা যেখানে পীড়িত সেখানেই তারা এগিয়ে গেছেন। কিন্তু সেই পীড়িত মানবাত্মার মুক্তির জন্যে সামগ্রিক সংগঠনের অভাবে সে কাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁদের, আর ছিল সমুদ্রপ্রমাণ অন্তর। অথচ পৃথিবীর সব ভালো কাজ যে হৃদয় দিয়ে করা যায় না, তা তারা বুঝেও বোঝেন নি। নইলে, গীলড্ সোস্যালিজমের প্রবক্তা রাসেল এবং গ্লিমসেস অফ দি ওয়ার্লড্ হিষ্ট্রির রচয়িতা নেহরু এমন ভাবে হারিয়ে যেতেন না।

সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা মন্তব্য, এঁদের প্রতিও যেন হুবহু খেটে যায়। তর্জমা না করেই বলছি, ঘরের চারপাশে অজস্র মণিমুক্তা আছে, কিন্তু গৃহিণীপনা নেই। ঠিক জায়গায়, ঠিক জিনিষটি গুছিয়ে রাখার মানুষ ছিলেন না জওহরলাল। মতিলালের জীবনজিজ্ঞাসা যতখানি ছিল, ততখানি রূপ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে সফল হয়েছেন। কিন্তু তার ছেলে জওহরলাল, নিজেকে কখনো গুছিয়ে নিতে পারেন নি। সারাজীবনই এক আত্মভোলা মানুষের অভিনয় করে গেলেন।

দিগ্নির্ণয় যন্ত্র না থাকলে জাহাজ যেমন অকূল সমুদ্রে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়ায়, দিগ্দর্শন না থাকলে মানুষের জীবনেও তেমনি ঘুর্ণিপাকে হাবুডুবু খায় এবং কোন লক্ষ্যে পেছুতে পারে না। এর জন্যে সঠিক লক্ষ্যের প্রয়োজন। জীবনের সমস্ত কাজকর্মকে সেই লক্ষ্যের উপযোগী করে তৈরি করে তবেই লক্ষ্যে পৌছুতে হয়। নইলে জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ কতখানি লক্ষ্যে পৌছলো সেটা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে মানুষ, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁর লক্ষ্য পথকে বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে।

জওহরলাল সম্ভবতঃ জীবনের কোন লক্ষ্য পথ স্থির করেন নি। এর পেছনে পারিবারিক কারণও ছিল যথেষ্ট। মতিলাল তাঁর

একমাত্র ছেলেকে খাঁটি ইংলিশম্যান তৈরি করার বাসনা করেছিলেন। শুধু ইংলিশম্যান বললে ভুল বলা হয়। বৃটিশ রাজ পরিবারের সমকক্ষীয় কামনা পোষণ করতেন। তাই তার প্রাথমিক শিক্ষা তার মার কাছে না হয়ে হয়েছে অ্যান্টির কাছে।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার চার বছর পর অর্থাৎ ১৪ই নভেম্বর ১৮৮৯ সালে জওহরলাল নেহরু জন্মগ্রহণ করেন! ভারতের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিদেশী প্রভাবযুক্ত পরিবেশে জওহরলাল বড় হতে থাকেন। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা শুধু বৃটিশরাজের অনুগৃহীত কিছু শিক্ষিত ধনী ব্যক্তির আওতায় ছিল। মতিলাল সেই রাজনীতির সঙ্গে তেমনিভাবেই জড়িত ছিলেন। কাজেই পরিবারের অন্যদের মধ্যে সে রাজনীতির প্রভাব না থাকার কথা। সরাসরি বা প্রকৃত রাজনীতিতে মতিলালের অংশগ্রহণ করাটা মূলত তার পুত্র জওহরলাল এবং গান্ধীজীর দ্বারাই হয়েছিল। সুতরাং মতিলালের প্রাথমিক রাজনীতির প্রভাব জওহরলালের ওপর পড়েনি।

মেধাবী জওহর হাতে কাছে যা পেতেন, তাই আগ্রহ সহকারে পাঠ করতেন। ১৯০৪ সালে প্রথম ইউরোপ দর্শন এবং Harrow-র কলেজে ভর্তি তার দৃষ্টিকে অনেক বেশী প্রসারিত করতে শুরু করে। দেশীয় শিক্ষা এবং বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি করেছেন। ঘরে তাঁর পাঠ্যাবস্থায় তিনি পরিবারিক বন্ধু অ্যানি বেসান্ত-এর মানসিক চিন্তা ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মানবতাবাদী জওহরলাল শ্রীমতী বেসান্তের ভক্ত হয়ে পড়েন এবং ঈশ্বর পূজারী হন অবিদ্যাতন্ত্রানুযায়ী। শ্রীমতী বেসান্তের একান্ত অনুগত জওহরলাল সেই সব ক্রিয়াকাণ্ডের বৈদ্যুতিক প্রভাবে পড়ে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টায় ছিলেন এই নৈষ্টিক পদ্ধতির দ্বারায়। তাঁর সেই অধ্যাত্ম সাধনায় বাধ সাধলেন তাঁর বাবা মতিলাল। কারণ মতিলালের চিন্তায় কোন অধ্যাত্মবাদ ছিল না। পূর্ণ জাগতিক

ভাববিলাসী মানুষ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছুকে বিচার করেন। সে জন্য, তাঁর বিপুল বিত্তের একমাত্র অধিকারী তাঁর ছেলেকে তিনি সন্ন্যাসী হতে দিতে পারেন না। কাজেই জওহরলালের অধ্যাত্ম জীবন চিন্তায় বাধা পড়লো। সম্ভবতঃ সেটা ১৯০২ সালের ব্যাপার। জওহরলাল সেদিন তাঁর বাবাকে বলেছিলেন যে, উনি শ্রীমতী বেসান্তের সহায়তায় Theosophical Society-তে সভ্য হবেন। পিতা মতিলাল কোন উত্তর না দিয়ে শুধু হেসেছিলেন। তারই উত্তরে জওহরলাল বলেন, উনি অধ্যাত্ম ব্যাপারে অনুপযুক্ত। এরপর শ্রীমতী বেসান্তের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও জওহরলাল যোগাভ্যাস ছেড়ে দিলেন। আসলে জওহরলাল কখনোই হিন্দু ধর্মীয় সাধনা বা ক্রিয়া-কাণ্ডে বিশ্বাসী ছিলেন না। আগ্নেয়গিরির আত্মপ্রকাশের অস্থিরতার মতো তার মানসিক পরিমণ্ডলে সদাই এক অস্থিরতা। সবকিছু দেখার এবং জানার আগ্রহ বিপুল। কিন্তু কোন্‌টাকে গ্রহণ করে জীবন লক্ষ্যে পৌঁছন যাবে—এ ব্যাপারে কখনোই উনি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। এ অস্থিরতা তাঁর শেষ বয়স পর্য্যন্ত ছিল।

পিতার প্রতি তাঁর কি কর্ত্তব্য একথা উনি ভেবেছেন। কিন্তু নতুন ভাবনা, হয়তো ব্যাপক কোন ভাবনা তাকে তাঁর পিতার ভাবনা থেকে সরিয়ে নিয়েছে। স্ত্রী কমলার প্রতি স্বামী হিসাবে তার কর্তব্যের কথা ভাবতে গিয়েও ভাবতে পারেন নি। ইন্দুর কথা ভাবতে গিয়ে বিমর্ষ হয়েছেন, ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন, কিন্তু সুরাহা করতে পারেননি। এমনি ধারা পৃথিবীর সমস্ত দুরবস্থার কথাই ভেবেছেন, ঝাঁপিয়েও পড়েছেন সেই কর্মকাণ্ডে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। জীবনের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত লোকটা জলন্ত উল্কার মতো প্রচণ্ড গতিতে উড়ে বেরিয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত হঠাৎই সমস্ত কাজ কর্ম অসমাপ্ত রেখে বিদায় নিয়েছেন। যাবার সময় পেছনে রেখে গেছেন ছিন্ন ভিন্ন বিবস্ত্রা ভারতমাতাকে। যার প্রতিটি অঙ্গে অবক্ষয়ের লক্ষণ।

অর্থনীতির সাগরে কিছু রাঘববোয়াল, রাজনীতিতে কিছু মেরুদণ্ডহীন স্বার্থপর রাজনীতির দালাল। কী কংগ্রেস, কী বিরোধী পক্ষ কোন তরফেই নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত লোক ভারতবর্ষে ছিলনা। যারা পালহীন হালহীন এই ভারত তরুণীকে ঝঞ্চা বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে নির্বিঘ্নে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে লক্ষ্যের দিকে। বিবস্ত্রা ভারতমাতাকে নতুন বস্ত্রে আরবিত করতে পারে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতের এক মহা অন্ধকার যুগ। এর মাঝখানে, ক'মাসের জন্যে শুধু একটুখানি বিদ্যুৎ চমক। ১৯৫৬'র জুন মাস থেকে ১৯৫৬'র জানুয়ারী পর্য্যন্ত। এরপর আবার নিঃসীম অন্ধকার।

তবে জওহরলাল দীর্ঘ ষোল বছরে যা পারেননি, ক'মাসের মন্ত্রীত্বে শাস্ত্রীজী কি তাই পেরেছিলেন? এক কথায় উত্তর হচ্ছে 'না'। বরং কংগ্রেসী কায়েমী স্বার্থের বেড়াজালে পড়ে তিনিও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। অসময়ের মৃত্যু যদি তাঁকে সুযোগ না দিত, তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যে চক্রান্তের বলি হয়ে তাঁকে ভারতের রাজনীতি থেকে মাথা হেট করে বিদায় নিতে হতো। এবং তা হতো আরো মর্মান্তিক। তবু শাস্ত্রীজীর কথা বলতে হয় এ কারণে যে, ভারত পাকিস্থান যুদ্ধের সময় তাঁর দৃঢ়তা ভারতীয় মানসিকতায় প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দৈবিক কারণেই যেন আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিখলাম। মহাসমুদ্রে হালহীন পালহীন ভারত জাহাজে যে সেই মুহূর্তেই যে হাল এবং পাল নতুন ভাবে যুক্ত হয়েছে তা নয়। এ যেন, হাল এবং পালের প্রতিশ্রুতি।

তবে জওহরলাল কি এসব বিষয়ে অপারগ ছিলেন? সম্ভবতঃ তা নয় তাঁর বিরাট মানসিকতায় একসঙ্গে অনেক ভালো কাজ করার যে আকুতি বা গঠনমূলক অভিব্যক্তিতে না পৌঁছনোর দরুণ ভারতের সামগ্রিক দুরাবস্থার অন্যতম কারণ একথা যেমন সত্য, তেমনি একক মানুষ জওহরলালের পক্ষে সামগ্রিক পরিবর্তন আনাও সম্ভব ছিল না।

আসলে স্বাধীনতা পূর্ব এবং উত্তর যুগের ভারতবর্ষ বহুরূপী অব্যবস্থার আস্তাকুঁড় ছিল। সেই অবক্ষয়ের গতিকে বিপুল সংশক্তিতে প্রতিহত করে উর্দ্ধমুখে নিয়ে যাবার মতো সহযোগী এবং পার্শ্বচরের বা পরামর্শ-দাতার অভাব ছিল সেদিন।

পৃথিবীর নেতৃগোষ্ঠীর মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুই সম্ভবতঃ সবচেয়ে ভাগ্যহীন এবং বিষাদক্লিষ্ট নায়ক। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের নায়কের মত পারিপার্শিকতা এবং নিয়তির শিকার হয়েছেন।

প্রচণ্ড মানবিকতা বোধ থাকলেই একজন ব্যক্তি বড় রাজনীতিজ্ঞ হতে পারেন না। রাজনীতিজ্ঞ না হলে দেশের সত্যিকার পরিচালক হওয়াও সম্ভব নয়।

সমারসেট মম্ তাঁর 'সামিং আপ' এর এক জায়গায় লিখেছেন যে কবি বা সাহিত্যিকদেরই রাজনীতিজ্ঞ হওয়া উচিত। কেননা, তারাই হচ্ছে সত্যিকারের মানবদরদী এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। সেদিক দিয়ে বিচার করলে জওহরলাল নিঃসন্দেহে একটি ব্যক্তিত্ব, যাঁর পক্ষে মমের ভাষ্য অনুযায়ী সফল রাজনীতিজ্ঞ হওয়া সম্ভব। অথচ তা হয়নি। রাজনীতির ক্ষেত্রে নেহরুজী অসফল একথা তার অতি বড় শত্রুও বলবে না। তবুও কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়। তিনি যা চেয়েছিলেন ভারতের রাজনীতির পরিচালনায় তাই কি হয়েছে? সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব না হলেও একথা বলা যায়, তাঁর সফলতা কোথাও দানা বাঁধেনি। অর্থাৎ তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা শুধু ধ্যান ধারণাই রয়ে গেছে, সাংগঠনিক সফলতা অর্জন করেনি। এর পেছনে অনেক কারণ, অনেক বাধা। কাজেই মম-এর বক্তব্য অনুযায়ী কবি-সাহিত্যিক হলেই রাজনীতিজ্ঞ বা দেশের পরিচালক হওয়া সম্ভব হয় না। মানবতাবোধের সঙ্গে সাংগঠনিক প্রতিভা না থাকলে বড় নেতা হওয়া যায় না। তাই জওহরলাল

দেশের বড় নেতার চাইতে মানুষের মনের নেতা হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের মনের আসনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

হেগেল, মার্কস, এ্যাঙ্গেলস এঁরা দার্শনিক। মানবিকতা বোধের প্রতীক। কার্ল মার্কসের আগে কোন মণীষীই শোষিত মানুষের কথা এত নিপুণ এবং সঠিক ভাবে চিন্তা বা ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর পূর্ববর্ত্তী মণীষার কথা বললে ভুল বলা হয়। তাঁর পরবর্ত্তী কালে কোন মণীষা এমন সুনিপুণ এবং সাটিকভাবে মানুষের প্রয়োজন এবং বৃত্তি সমূহের ব্যাখ্যা করতে পারেননি। আগে পরে সবাই মানুষের প্রয়োজনের বিশেষ দিক নিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন, পথ নির্দ্দেশ করেছেন। সেদিক থেকে মহামতী মার্কসই শোষিত মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ প্রদর্শক। কিন্তু, লেনিন না থাকলে মার্কসীয় দর্শন কি শুধু অনুসন্ধিৎষু পাঠকের জন্যেই বেঁচে থাকতো না? লেনিনের মানবিকতা বোধ এবং অভুতপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল বলেই না মার্কসীয় দর্শন বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। মার্কস কেন তার দর্শনকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারলেন না, তার প্রদর্শিত পথকে সফল কেন লেনিন করলেন এ তর্কে অবতীর্ণ হবার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে মার্কস বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের হোতা হলেও, রূঢ় বাস্তবের বিচার বুদ্ধি সহযোগে দর্শনকে বাস্তব করে তোলার মতো কিছু অভাব বা কঠোর মনোভাব অবর্তমান ছিল। তাই তো তার চিন্তার ফসলকে ছড়িয়ে দিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। তার সেই আলোকবর্ত্তিকা সহযোগী শিষ্যের মতো গ্রহণ করলেন ষ্টালিন।

জওহরলাল সেদিন থেকে সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। ধ্যান ধারণার রূপায়ণের জন্যে যে সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য দরকার এটা তিনি মনে রাখেন নি। যাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তাদের যেমন যাচাই করার প্রয়োজন মনে করেন নি; তেমনি অনেকের উপর দায়িত্ব অর্পন করতে গিয়েও সে গুরুভার নিজের

উপরেই রেখেছেন। এই ছড়ানছেটানো ভাব তার আগাগোড়াই ছিল। এরই জন্যে অনেক গুণাবলি থাকা সত্বেও নেহরুজী দেশের জন্যে বা পৃথিবীর জন্যে সকল কিছু কার্য্যকর করতে পারেন নি। ভারতের চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমতর পর্য্যায়ে পেঁাছেছে। তা বলে কি দেশের অগ্রগতি হয়নি? হয়েছে। তবে বিচ্ছিন্ন ভাবে, সামগ্রিকভাবে নয়।

থিওজফিষ্ট জওহরলাল আর এক থিওজফিষ্ট শিক্ষক ফার্দিনান্দ টি ব্রুকস এর শিক্ষার অধীনে এলেন। ব্রুকস্ শ্রীমতী বেসান্তের সোসাইটির সভ্য হলেও একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনিই কিশোর জওহরলালের মনে বিজ্ঞানের প্রতি চিরকালীন ভালোবাসার বীজ বপন করেছেন। আনন্দ ভবনে তারই প্রেরণায় একটা ছোটো খাটো ল্যাবরেটারি তৈরী হয়েছিল সেদিন।

পিতা মতিলালের ইচ্ছায় লণ্ডনে পড়াশুনা করতে গেলেন। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে যাতে নীল রক্তের আচার বিচার শিখতে পারেন তারও প্রচেষ্টা ছিল। ছোটবেলা থেকে উচ্চ বর্ণের লোকেদের সঙ্গে মেলা মেশার দরুণ সভাবতই তাঁর চাল চলনে ঔজ্জ্বল্য ও স্মাটনেস্ প্রকাশ পেত। তাই এই বাহ্যিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মননশীলতার বিকাশ কোথাও থেমে যায়নি। এবং দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল। কিন্তু সে নীল রক্তের সমাজকে উনি গ্রহণ করতে পারেন নি। বিরোধী ভূমিকা যার চিরকালীন ইমেজ, তার পক্ষে বিরুদ্ধ নীতির সঙ্গে ঘর করা সম্ভব নয়। Harrow থেকে চলে এলেন ক্যামব্রিজে। শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতি বিজ্ঞানে ডিগ্রী। জওহরলালের মতো বংশ পরিচয় সম্পন্ন ব্যক্তি ও মেধাবী ছাত্রের পক্ষে অমন ডিগ্রীর প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তারপর ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফেরা। সফল ব্যারিষ্টারের ছেলে আইন ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অসফল।

এমনি সব অসাফল্যে নজীর তাঁর সারাজীবন পরিধিতে ব্যাপৃত।

ভাসা ভাসা সাফল্যের ইতিহাস লিখে জওহরলালকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। সত্যিকার মানুষ এবং পণ্ডিত জওহরলালকে ক'জন চিনেছিলেন? তাঁকে জানতে হলে, তাঁর লেখার মাধ্যমে পরিচয় নিতে হবে। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, মননশীলতা, বিশ্লেষণ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীর যে কোন মনীষার সমকক্ষ। তাই বার্নার্ড শ'-এর বা আইনস্টাইন বা পল রবসনের পাশে জওহরলাল মানানসই। কিন্তু মাউন্টবেটনের নেহরুজী সম্পূর্ণ বেমানান। ভারতের রাজনীতির আসরে জওহরলালকে মনে হয় যেন অভিশপ্ত দেবদূত পাতালে শয়তানের রাজত্বে বন্দী। তার সেই বন্দীত্ব ঘুচলো ২৮ মে ১৯৫৬ সালে। সেই মহাপ্রয়াণের সময় তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল প্রশান্তি, স্বর্গীয় দ্যুতি।

"আমি ভারতের জোয়ান অব্ আর্ক হব" ,ছোট বেলার ইন্দিরাজীর ঐটাই ছিস স্বপ্ন। জওহরলালের একমাত্র সন্তান, একমাত্র ভালো-বাসার ধন ইন্দু খুব ছোট বয়স থেকে স্বতন্ত্র এবং একলা। চারপাশে অনেক লোক থাকলেও ইন্দু প্রকৃতপক্ষে নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা তার কাছে অভিশাপ না আশীবাদ একথা বলা কঠিন। ব্যক্তি ইন্দিরার দিক থেকে বিচার করলে এটা নিঃসন্দেহে অভিশাপ। এ অভিশাপ সম্ভবতঃ নেহরু পরিবারের মেয়েদের মধ্যে কিছু না কিছু আছে। তিন বছর বয়স থেকেই ইন্দিরা ভাবগত দিক থেকে এবং শব্দগত দিক থেকে আশ্রয়হীন।

ভাবগত দিক হলো, শিশুর সবচেয়ে আপন এবং ভরসাস্থল তার মা, তারপর বাবা। ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রয়োজনীয়তা নেহরু পরিবারকে হাত ধরে পথে নামিয়েছিল। গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের ডাকে মতিলাল তার রজত মিনার থেকে সর্বসাধারণের সঙ্গে পথের ধূলোয় নেমে এসেছেন, জওহরলাল উল্কার মত সারা ভারতে সংগঠনের কাজে ব্যস্ত; বিজয়লক্ষ্মী,

কৃষ্ণা এবং কমলা নেহরুও রাজনৈতিক ভূমিতে নেমে এসেছেন যার যতখানি কর্মক্ষমতা ততখানি নিয়ে। সবারই প্রয়োজন আছে দেশের কাজে, প্রয়োজন নেই ছোট্ট ইন্দুর। সে শুধু তার ভাসা ভাসা চোখ দিয়ে এঁদের অনুভব করার চেষ্টা করে। সেদিন তার শিশুমনে এঁদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেছিল কে জানে। তবে ঘনিষ্ঠরা যত বেশী বহির্মুখী হয়ে গেছিলেন, ইন্দু তেমনি অন্তর্মুখীন হয়ে পড়েছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক। শিশুমনের ওপর অলিখিত আঘাত তাকে অন্তর্মুখীন করে তোলাই সম্ভব। স্নেহের আশ্রয় থেকে এভাবেই বিচ্যুত হয়েছিল এবং সেটাই ভাবগত আশ্রয়হীনতা।

শব্দগত দিক থেকে আশ্রয়হীনতা বলতে যা বোঝায় ইন্দুর জীবনে তাই বার বার হয়েছে। অবশ্য সমগ্র ভারতই তার আশ্রয়-স্থল ভাবলে স্বতন্ত্র কথা।

তৎকালীন অন্যতম ধর্মী এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির একমাত্র নাতনী, সর্বজনপ্রিয় নেতার একমাত্র সন্তান আশ্রয়হীন, একথা কল্প-কথার মতো। তা সত্ত্বেও ঘটনা সত্য। চার বছর যখন ইন্দুর বয়স, সে সময় Prince of Wales ভারতে আসেন ১৯২১-এর ১৭ই নভেম্বর বোম্বাইতে। সে পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারতের প্রত্যেক শহরেই শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন গান্ধীজী। সম্বর্দ্ধনাহীন রাজপথের পরিচয় পেয়ে, বৃটিশরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের ধরপাকড় এবং অত্যাচার চালাতে আরম্ভ করে। গান্ধীজী বাদে অন্য সব বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাই সেদিন জেল-এ গিয়েছিলেন।

মতিলাল এবং জওহরলাল, পিতা ও পুত্র সেদিন প্রথম বার একসঙ্গে সে সময় জেল-এ যায়? ইংরেজ সংস্কৃতি প্রভাবিত মতিলাল সেদিন তার সর্বস্ব জনসাধারণের জন্যে দান করে গান্ধীজীর ডাকে পথে নেমে পড়েছেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রয়োজনে

অতবড় ত্যাগ স্বীকার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছাড়া বড় একটা দেখা যায় না। ত্যাগ স্বীকারের হাজারো নজীর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষণে ক্ষণে আছে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী এবং বৈভব প্রেমী অবস্থা থেকে দেশের প্রয়োজনে একেবারে নিঃস্ব অবস্থার নজির সংক্ষিপ্ত। সেই সময়ে জওহরলাল জেল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করেছেন, বাবার এবং নিজের জামা-কাপড় কেঁচেছে ও চরকা চালিয়েছে।

মতিলাল এবং জওহরলালের অসহযোগ আন্দোলনের জন্যে কোর্ট-এর বিচারে জরিমানা হয়েছিল। অনাদায়ে তিনমাস পরিশ্রম-সহ জেল।

জরিমানার টাকা আদায় না হওয়ার জন্যে স্থানীয় পুলিশ আনন্দ ভবনে হামলা করে। তারা ঘরের আসবাবপত্র কার্পেট সমেত যাবতীয় বইবার জিনিষপত্র ঘরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল। ছোট্ট ইন্দু সহ্য করতে না পেরে, তাদের যাবার পথের সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দেয়। প্রতিবাদ করে বলে যে, ও সব তারা নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ, ওগুলি ওদের পরিবারের সম্পত্তি। বৃটিশ হাঙররা সেদিন কচি কচি দুটো হাতের বাধাকে উপেক্ষা করেছিল। সেদিন যদি ইন্দিরার বয়স আরো বেশী হত এবং ক্ষমতা থাক্‌তো এবং পরিণাম কি হতো বলা মুস্কিল।

ভারতীয় নারীদের মধ্যে যে একটা ঘুমন্ত শক্তি আছে তার প্রকাশ আমরা অনেক সময় দেখেছি। দেখেছি ১৮৫৭ সালে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈর মধ্যে, রাণী দুর্গাবতীকে দেখেছি আকবরের বিরুদ্ধে। ইংরেজ ডাকাতদের সামনে রাণী রাসমণির আবির্ভাবের মতো। সেদিন রাণী রাসমণিকে দেখে ইংরেজ তার অত্যাচারের হাত গুটিয়ে নিয়ে মুষিকের মতো কেন সরে পড়েছিল তা আজও অজ্ঞাত। সেই শক্তি যার বহুরকম রূপ কল্পনা ভক্তজনদের মধ্যে আছে। কখনো দেবী

ভগবতী, কখনো মহাকালী, কখনো কল্যাণী জগদ্ধাত্রী। এই যে লুকায়িত বিদ্যুতপ্রভা ভারতীয় অনেক নারীর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা গেছে। ইন্দিরার মধ্যে সে রকম লুক্কায়িত বিদ্যুত ঝলক কখনো কখনো প্রত্যক্ষ করা গেছে। স্বপ্নাবিষ্ঠ দুটো চোখে যেন জাগতিক জগত থেকে অনেক দূরের কোন উপলব্ধির মায়ায় ভরা। নইলে চার বছরের ইন্দুর পক্ষে যেখানে পশুসদৃশ পুলিশ দেখে মায়ের বুকে মুখ লুকোবার কথা, সেখানে সে নির্ভয় পদক্ষেপে শত্রুর সামনে দণ্ডায়মান।

জন্মান্তর বাদীরা কোন চোখে দেখবেন জানিনা, তবে এক মহাপুরুষের একটা উক্তি তাদের জন্যে না বলে পারছিনা। তাঁকে মহাপুরুষ বলছি এই কারণে যে, মানুষের বৃত্তিগুলোকে তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছেন বলে। হিমালয়চারি সেই মহাপুরুষ সন্ন্যাসী বলেছিলেন, "বঙ্গালকী রাণী রাসমণি পুনরজনম লেকর আয়া"। কথাটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন আমার নেই, তবে সেদিন ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে আনন্দ ভবনের সামনে বৃটিশ পুলিশের সামনে নির্ভয়ে পথ আগলে দাঁড়ানোর মধ্যে কোথায় যেন বৃটিশ দস্যুদের সামনে অগ্নিবর্ষি রাণী রাসমণির সঙ্গে ভাবগত মিল আছে।

সেদিন ইন্দিরা আশ্রয়হীন হলো। ঠাকুরদাদা এবং বাবার আদরের ধন মা কমলার হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ালো। ইন্দুর মা কমলা প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এমনই এক ভবিষ্যতের দিকে সে এগোল যাকে বলা চলে থামের নির্ভরতার পরে খুঁটি নির্ভরতায়। পরবর্ত্তী জীবনে অতি আগ্রহে যে আশ্রয়কে গ্রহণ করতে গেছেন, তাই নির্মম ভাবে ভেঙেচুরে গেছে। তাঁর স্বামী ফিরোজ গান্ধীর মৃত্যুর পর উনি তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউকে বলেছিলেন, "যখনই আমি খুশি হই, আনন্দ করার মতো মনের অবস্থা হয়, তখনই আসে দুর্যোগ।"

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হয়ে কেরলে কংগ্রেসকে সংগঠিত করে যখন নিজের কাজের আনন্দে খুশি, তখনই ঘটে এতবড় দুর্ঘটনা।

ভালোবাসার আশ্রয়স্থলের একটা গম্বুজ নিশ্চিহ্ন। ভাগ্য বলতে সাধারণ অর্থে যা বোঝায় তা যেন ইন্দিরা নেহরুর জন্ম পত্রিকায় লেখা হয়নি।

কন্যা বিবাহপূর্বে পিতার ওপর নির্ভর করবে এটাই ভারতীয় নিয়ম। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল স্ত্রী কমলার মৃত্যুর পর পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষভাবে স্বীয় কন্যা ইন্দিরার ওপর নির্ভর করে গেছেন। আসলে নেহরুজী এমনই এক ব্যক্তিত্ব যার নিজের উপর নির্ভর করতে শেখে না। এ যেন এক অগ্নিগর্ভ ধূমকেতু, যে ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে পরিক্রমারত, আশ্রয়হীন, একক।

সত্যিই মনের দিক থেকে জওহরলাল একক, নিঃসঙ্গও বলা চলে। ভাবলে অবাক হতে হয়, ভারতের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত মানুষটা কি করে নিঃসঙ্গ বা একক হয়। অনেক লোকের ভীড়ে জওহরলাল বা অনেক কাজের মধ্যে জওহরলালের পক্ষে নিঃসঙ্গ থাকাই বা কী করে সম্ভব। নেহরুজী শব্দগত হিসেবে নিঃসঙ্গ ছিলেন না একথা ঠিক, কিন্তু মনের দিক থেকে নিঃসঙ্গ ছিলেন বরাবর। এই নিঃসঙ্গতাবোধের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে একমাত্র সন্তান এবং বন্ধু ইন্দুকে কাছে পেতে চাইতেন। এটা ইন্দিরাজীও ভালো করে জানতেন। জানতেন বলেই ১৯৪৭ সালের প্রারম্ভে আনন্দভবনের ভার নেবার জন্যে আসতে হয়েছিল। এবং তা তাঁর পিতার প্রয়োজন। পিতার আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সেদিন ইন্দিরার ত্যাগ স্বীকার অনেকেই আজ ভুলে গেছে। ভবিষ্যত স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রীর জন্যে এবং তাঁর বহুধা বিচ্ছিন্ন কংগ্রেস এবং সহস্রমুখী দেশের অব্যবস্থার প্রতি রুখে দাঁড়াবার জন্যে তাঁর পিতার পাশে দাঁড়াবার জন্য সেদিন ইন্দিরাকে বড় মর্মান্তিক খেসারত দিতে হয়েছিল। মায়ের শয্যাপার্শ্বে যে উজ্জ্বল যুবকটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেছিলেন, সেদিন ভারত বিভাগের প্রাক্ মুহূর্তে পিতার পাশে

দাঁড়াবার জন্যে ফাটল ধরেছিল। এবং সে ফাটল কোনদিনই আর জোড়া লাগেনি। নিয়তির কী দুর্দ্দমনীয় পরিহাস যে, ইন্দিরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কখনো একটুখানি শান্তি এবং স্বস্তি পেলেন না। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে ইন্দিরা যখন কেরলে কংগ্রেসকে পুন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন, তখন এলো মর্মান্তিক খবর, ফিরোজ মৃত্যু শয্যায়। অজ্ঞান স্বামীর শয্যা পাশে পুরো একটা দিন প্রতীক্ষা করার পরও স্বামীর কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য তার আর হয়নি। ক'দিন পর তাঁদের পরিবারের বন্ধু স্থানীয় একজনকে বলেছিলেন, "যখনই আমরা জীবনে আনন্দের কোন কারণ ঘটেছে, তখনই এসেছে দুর্যোগ।"

ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে আসার পর জওহরলাল বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা দেখে। সবাই যেন সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের প্রতিযোগিতায় কর্মব্যাপৃত। গান্ধীজীর রাজনীতিতে সক্রিয় পদার্পণের আগে পর্য্যন্ত জওহরলাল কংগ্রেসর হয়ে দেশ সেবার কথা বিশেষ চিন্তা করেন নি। যদিও তাঁর পিতা মতিলাল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। কংগ্রেসের সৃষ্টি সেই ১৮৮৫ সাল থেকে তার কী চেহারা তার এক সুন্দর বর্ণনা বা আলোচনা পাই ঋষি অরবিন্দের লেখায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং প্রসারিত দৃষ্টি ভঙ্গির অধিকারী আর এক মণীষার কংগ্রেস সম্বন্ধে বক্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হলেও তৎকালীন ভারতীয় রাজ-নীতির পরিচয় পাওয়া যাবে বলে তার উপস্থাপনা করছি। সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ এবং সমাজতন্ত্রই যে ভারতের জনসাধারণের একমাত্র সার্বিক মুক্তির পথ একথা পণ্ডিতজীই ভারতীয় নেতা হিসাবে প্রথম প্রচারক হলেও অরবিন্দ ঘোষ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে সেই সর্বহারা মানুষদের কথাই বলে গেছেন। সম্ভবতঃ শ্রীঅরবিন্দরই ভারতের প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। সেন্ট পলস্-এ পাঠ্যাবস্থায়

আইরিশ নেতা পার্ণেলের ভক্ত ছিলেন। কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরজি বলেছিলেন, প্রজার জন্যে রাজার সৃষ্টি রাজার জন্যে প্রজার সৃষ্টি নয়। এ উক্তি শ্রীঅরবিন্দকে মুগ্ধ করে ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও তিনি একজন সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং ১৮৯২ সালে দাদাভাই নৌরজির পক্ষে নির্বাচনী বক্তৃতা দেন। শুধু তাই নয় লণ্ডনে, কেম্ব্রিজে পড়াশুনার সময়-গুপ্ত সমিতি প্রাতষ্ঠা করেছিলেন। নাম ছিল Lotus & Dagger-পদ্ম ও ছোরা। ১৮৯২ সালে যিনি কংগ্রেস প্রচারক, ১৮৯৩ সালে তিনিই তার কঠোর সমালোচক। জন্ম লগ্ন থেকে অর্থাৎ ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল নেহরু যুগ পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে অনেকখানি চেনা যাকে। ইন্দু প্রকাশ পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ।

প্রথম প্রবন্ধ (৭ই আগষ্ট, ১৮৯৩)

আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি। দুই বৎসর পূর্বে ইহা আমি করিতে পারিতাম না। আমি তখন কংগ্রেসের অনুরক্ত ছিলাম। দেশের এইরূপ একটি বড় প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসের নামজাদা নেতাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় আমার প্রতি অনেকেই অসন্তুষ্ট হইবেন জানি। কিন্তু এক অন্ধ যদি আর এক অন্ধকে লইয়া পথ চলে, উভয়েই তবে গর্ত্তে পড়িয়া যায়—এই আশঙ্কা করিয়া আমি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি।

দেশপ্রেমিক কোন বড় নেতার ব্যক্তিগত চরিত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা আমরা না করিতে পারি কিন্তু কংগ্রেসের মত একটি প্রতিষ্ঠানকে সমালোচনা না করিয়া পারি না। কেননা ইহার ওপর দেশের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করিতেছে। মূর্তি পূজকেরা যেমন একটি মূর্তিকে পূজাই করে, তাহার দোষ গুণ বিচার করে না—আমরা কংগ্রেসকে নিশ্চই সেইরূপ করি না।

কংগ্রেস নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলিতে পারে না—ইংরেজ সরকারকে অসন্তুষ্ট করিতে ভয় পায়। প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্লাডষ্টোনকে না জানিয়া অথবা তাঁহার প্রশংসা করে, অথচ পার্লামেণ্টে ভারতের কথা আলোচনার সময় গ্লাডষ্টোন ভারতের বিরুদ্ধে তর্ক করেন। ভারতে ইংরেজ শাসন ঈশ্বরের দান বলিয়া আমরা না হক্ মিথ্যা কথা ঘোষণা করি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ (১৮৯৩'র ২১শে আগষ্ট)

……। কংগ্রেস একটি সভামাত্র। এই বৃহৎ সভা দেশের জন্য কোন কার্য্যকরীপন্থা অবলম্বন করিতে অক্ষম।

মিঃ ফিরোজ শা মেটা আদালতে ওকালতি করিবার পদ্ধতি কংগ্রেস সভায় আমদানী করিয়াছেন। তিনি বলেন—কংগ্রেস আমাদিগকে একত্রে বসিয়া কাজ করিতে শিখাইয়াছে। তাহা ঠিক কথা নয়। কংগ্রেস একত্রে বসিয়া কথা বলিতে শিখাইয়াছে মাত্র।

কংগ্রেস শুধু মধ্যবিত্তদের লইয়া গঠিত হইয়াছে। নিম্নস্তরের বিশাল জনসাধারণকে স্পর্শও করে নাই।

ইংরেজ শাসকবর্গের বিরুদ্ধে কড়া কথা বলার কোন অর্থ হয় না। কেননা তাহারা অতি সাধারণ মানুষ। আমাদের দুর্বলতা বাহিরে নয়। আমাদেরই ভিতরে।

কংগ্রেস যদি বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে না পারে, তবে যত শীঘ্র ইহা লুপ্ত হইয়া যায় ততই মঙ্গল।

নয় বৎসর আমরা কংগ্রেসকে পূজা করিয়াছি। ধর্মভাব প্রণোদিত ঠাকুর পূজার মত পূজা করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে।

(এখানে বলা প্রয়োজন ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস সেই বিরুদ্ধে সমালোচনা সহ্য করেনি। সৎ পরামর্শ উড়িয়ে দিয়েছে। যার ফলে

ভারতের সমগ্র জনসাধারণের আশার ধন কংগ্রেস তাদের অন্ধকার থেকে অন্ধকারেই নিয়ে গেছে। ১৮৯৩ সালের সঙ্গে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত একই ধারা। কোথাও কোন সময় বিদ্যুৎ মেঘের মতো আলোর আভাসের পর আবারও বিপুল অন্ধকারে।)

তৃতীয় প্রবন্ধ (২৮শে আগষ্ট, ১৮৯৩)

আমি বলি কংগ্রেসের আদর্শ ভুল, কর্ম পদ্ধতি ভুল, নেতারা বিলকুল নেতৃত্বের অযোগ্য।

কংগ্রেস জাতীয় (National) আখ্যা পাইতে পারে না। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা যে বলে ইহাতে মুসলমান নাই বলিয়া জাতীয় নয়—সে কথা ঠিক নয়। কেননা ইহাতে যথেষ্ট মুসলমান প্রতিনিধি আছে এবং কংগ্রেস মুসলমানদের অভাব অভিযোগ ও দাবী সম্পর্কে অতিশয় বেশী সচেতন।

কংগ্রেস জাতীয় নয় এই কারণে যে—ইহাতে ভারতের জনসাধারণের বা তাদের প্রতিনিধি নাই। ইহাতে আছে শুধু ইংরেজ আমলের ভূঁইফোড় উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, সংবাদপত্র সম্পাদক, চাকুরীজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ও এক শ্রেণীর বণিক সম্প্রদায়। আর আছে কিছুটা জমিদার ও সঙ্গতিসপন্ন রায়ত! ইহারা কেহই জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়।

ইংলণ্ডের লিবারেল সম্প্রদায় যদি একটি সভা করিয়া বলে যে তাহারা ইংরেজ জাতীর একমাত্র প্রতিনিধি—তাহা যেমন ঠিক হইবে না, সেই রূপ কংগ্রেসকে জাতীয় বলিলে ঠিক হইবে না। বস্তুতঃ ইহা একটি দলের বা সম্প্রদায়ের বাৎসরিক সভার অনুষ্ঠান মাত্র। হাউস অব কমন্সের সঙ্গেও আমাদের কংগ্রেসের সঙ্গেও কোন তুলনা হইতে পারে না। কেননা হাউস অব কমন্স যাহা স্থির করিবেন, তাহা তাহারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন। কিন্তু কংগ্রেস বৃটিশ

গভর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন নিবেদন করিবেন, তাহা তাঁহারা নিজেরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন না। সুতরাং হাউস অব কমন্স ও আমাদের কংগ্রেস এক বস্তু নয়।

মিঃ ফিরোজ শা মেটা কলিকাতা কংগ্রেসের ১৮৯০ সভাপতিরূপে বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের (mose) মধ্যে কোনরূপ রাজনৈতিক চেতনা নাই, তাহাদের অভাব অভিযোগ তাহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের শিক্ষিত ভারতবাসীরাই জনসাধারণের অভাব অভিযোগ প্রকাশ করেন। সুতরাং কংগ্রেস 'জাতীয়'ও বটে পপুলারও বটে। মিঃ মনমোহন ঘোষও মিঃ মেটাকে সমর্থন করিয়া বলেন যে—কংগ্রেস ডেলিগেটরা তাহাদেরই প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বা চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে, সুতরাং কংগ্রেস 'জাতীয়' সন্দেহ নাই।

চতুর্থ প্রবন্ধ (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)

কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি আদালতে ওকালতির মত। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে বিচারক বৃটিশ জাতির নিকট ভারতবাসী মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে। মেটা, ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারগণ ওকালতি করিতেছেন।

মেটা ও মনমোহন ঘোষ উভয়েই একমত হইয়া বলিতেছেন—ইতিহাস আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, অশিক্ষিত জনসাধারণের অভাব অভিযোগ শিক্ষকেরাই উত্থাপন করিয়া আন্দোলন করিয়া থাকেন। এবং তাহারই ফলে জাতি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

এই দুই ব্যক্তি এক ইংলণ্ডের ইতিহাস ভিন্ন আর কোন দেশের ইতিহাস পড়েন নাই, বিশেষতঃ ফরাসী দেশের ইতিহাস আদৌ পড়েন নাই। ফরসী জাতি ধীরে ধীরে বা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় নাই। ফরাসী দেশের অশিক্ষিত বিশাল জনসাধারণ ও সর্বহারা দল অগ্নি ও

রক্ত স্নানে পবিত্র হইয়া মাত্র পাঁচ বৎসরে তোরা শতাব্দীর অত্যাচার মুছিয়া ফেলিয়াছে। ইতিহাস আমাদিগকে এ শিক্ষাও দেয়।

তা ছাড়া আয়র্লাণ্ড, ইতালি, আমেরিকা, এথেন্স ও রোম স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস দেয় তাহা মেটা বা মনমোহন ঘোষের উক্তি সমর্থন করে না।

মেটা ও মনমোহন ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা কেবল ইংলণ্ডের আদর্শ ভারতবাসীর সম্মুখে রাখিয়া কংগ্রেসকে পরিচালিত করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমি ইহা সমীচীন মনে করি না। ইংলণ্ডের ধারা ও পদ্ধতি ভারতবাসীর উপযোগী হইবে মনে হয় না।

পঞ্চম প্রবন্ধ (৩০শে অক্টোবর, ১৮৯৩)

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বৃটিশ হাউস অব কমন্সকে স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরেজ জাতির স্বাধীনতার প্রতীক বলিয়া কংগ্রেসী বক্তৃতায় উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অসাধারণ বাগ্মী হইলেও তাঁহার চিন্তাধারায় কোন গভীরতা নেই ; তার চাইতে ম্যাথু আর্ণল্ডের চিন্তায় অনেক গভীরতা আছে। ম্যাথু আর্ণল্ড একজন ভারতবন্ধু ইংরেজ। তিনি ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—ইহাদের প্রথম স্তরের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ভোগবিলাসী জড়বাদী, দ্বিতীয় স্তরের মধ্যবিত্তেরা ক্ষুদ্র ও নীচাশয় এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা পশু ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ইংরেজ জাতির কোন উচ্চ আদর্শ নাই, কোন বৃহৎ কল্পনা নাই ; তাহারা সম্মুখে যেটুকু দেখিতে পায় তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই দেখে না। কিন্তু ফরাসীরা ইহার ঠিক বিপরীত। তাহাদের উচ্চ আদর্শ আছে, সুবৃহৎ কল্পনা আছে, কৃষ্টি আছে। সমগ্র ইউরোপে ফরাসী সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য জাতি। ইংরেজের মন ঘোরে কমন্স সভার চারিপাশে, ফরাসীর মন ঘোরে থিয়েটার, ফরাসী একাডেমি ও মিউনিসিপাল প্রতিষ্ঠানের চারিপাশে। আর আমেরিকাবাসীর মন

ঘোরে ষ্টক এক্সচেঞ্জের চারদিকে। ইংরেজের কিছুটা রাজনৈতিক প্রতিভা আছে।

আমি যে সব ভারতবাসীর জন্যে লিখিতেছি তাহারা ইংরেজী শিক্ষায় ইংরেজী ভাবাপন্ন। ঘটনাক্রমে ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজা হইয়াছে এবং শিক্ষিত ভারতবাসীর ইংরেজী ভাবাপন্ন হওয়ার ইহাই কারণ। কিন্তু প্রাচীন এথেন্সবাসী ও বর্ত্তমান ফরাসী জাতির সহিত আমাদের চরিত্রগত সাদৃশ্য বেশী। ইংরেজ চরিত্রের সহিত আমাদের কোন সাদৃশ্য নাই। অথচ ইংলণ্ডের নিকট হইতেই বস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সামাজিক আদর্শ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহা পণ্ডশ্রম হইতেছে; আমাদের জাতীয় চরিত্রে ইহা খাপ খাইবে না। ইহা ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য ব্যতিরেকে আর কি বলা যায়—কেননা জাতীয় চরিত্রের বিরোধী আদর্শ ও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান ভারতবাসী কিছুতেই পুনর্জ্জীবিত ও শক্তিশালী হইতে পারিবে না।

সপ্তম প্রবন্ধ (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৩)

আমি এযাবৎ যাহা লিখিয়াছি তাহা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মুখরোচক হইবে না। তাঁহারা বলিলেন, ইউরোপের ঐ সব দেশের খবরে আমাদের কি প্রয়োজন? কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় জিনিষকে রক্ষা করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের ভাব, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিকে সাদরে আমাদের মধ্যে আনয়ন করিতে হইবে। নতুবা আমাদের যাহা নিজস্ব তাহা ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিব না।

মিঃ মেটা বলেন, সমাজের নিম্নস্তরের সর্ব্বহারাদের দুর্দ্দশা ও অজ্ঞানতা দূর করা অনাবশ্যক এবং সেজন্য পরিশ্রম করার সময় এখনও আসে নাই। সর্ব্বহারাদের সম্পর্কে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বলে

কিন্তু কেহই কিছু করে না। মিঃ মেটার কথার মধ্যেই বুঝি যে সর্ব্বহারাদের উপেক্ষা করিয়া আমরা এক ঘোর সমাজ বিপ্লবের বীজ বপন করিতেছি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমার এই অভিযোগ যে, তাঁহারাই এই কার্য্য করিতেছেন।

যখন কংগ্রেসের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর আমাদের কোনই আশা ভরসা নাই, তখন এই নিমজ্জমান সর্বহারাদের উপর নির্ভর করা ভিন্ন আমাদের আর কোনই উপায় নাই।

সমাজের নিম্নস্তরের সর্ব্বহারাদের উন্নত করিবার জন্য কংগ্রেস কোনই চেষ্টা করিতেছে না। অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই প্রলেটেরিয়েটদের মধ্য হইতে ভবিষ্যতে এক অতি ভয়ঙ্কর বিপ্লব প্রধূমিত হইয়া উঠিবে।

কংগ্রেস রাজনীতিতে আমাদের নেতৃবৃন্দ শুধু জলের বুদবুদ লইয়া খেলা করিতেছেন। আইন সভা, এক সঙ্গে পরীক্ষা, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক করণ—এইগুলি জলের বুদবুদ। কিন্তু অন্যদিকে গভীর সমুদ্রের তলদেশে যে আলোড়ন হইতেছে এবং যাহার উপর কৃত্রিম সভ্য সমাজের প্রলেপ দেওয়া যাইতেছে—তাহা সমুদ্রের তলদেশের আলোড়নে একদিন ডুবিয়া ভাসিয়া মুছিয়া যাইবে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইহা লক্ষ্য করিতেছেন না। প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

অষ্টম প্রবন্ধ (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪)

সমগ্র জাতি যে একটা জীবন্ত প্রাণী মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিচালিত কংগ্রেসের এরূপ ধারণা নাই। নিম্ন শ্রেণীর সহিত কংগ্রেসের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে এ ধারণা তাহাদের নাই। চারিপাশের অবস্থা সম্বন্ধেও তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। ইহা আমি বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে চেষ্টাও যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের ভুঁইফোঁড় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একদিকে সহানুভূতিহীন

বুরোক্রাসি, অন্যদিকে আবার নির্জীব প্রলেটেরিয়েটদের মধ্যস্থানে থাকিয়া শুধু নিজেরাই উচ্চ পদবী ও ক্ষমতা লাভের জন্য উদগ্রীব হইয়া কংগ্রেসী অন্দোলন সুরু করিয়াছেন।

কংগ্রেসের এই সব ভুঁইফোঁড় মধ্যবিত্তরা না জানে রাজ্যশাসনের কৌশল, না জানে অত্যাচারী শাসনকে যথাযথরূপে বাধা দানের কৌশল ; সে ক্ষমতা ইহাদের নাই। ইহাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য একজন উপযুক্ত নেতার প্রয়োজন। সেই নেতা নাই। ফ্রান্সে যেমন নেপোলিয়ান জন্মিয়াছিলেন ভারতে তেমনি কোন নেপোলিয়ান জন্মেন নাই।

আমাদের দেশে প্রাচীন উচ্চ শ্রেণীরা রাজ্য শাসন করিত এখন তাঁহারা ধ্বংসেরস্মুখ। ইংরেজ আমলের নূতন মধ্যবিত্তেরা রাজনীতি ও রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং আমরা একটা বিদেশী শাসন দ্বারা পরিচালিত, শোষিত এবং পর্য্যুদস্ত হইতেছি—এই তো আমাদের অবস্থা।

একাদশ প্রবন্ধ (৫ই মার্চ, ১৮৯৪)

যে সকল সিভিলিয়ান ইংলণ্ড হইতে আমাদের শাসন করিবার জন্য এখানে আগমন করে তাহারা ভালো বংশের ছেলেও নয়, তাহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং তাহাদের ব্যবহার ও আচরণ দাম্ভিকতায় পূর্ণ।

মিঃ হিউম কংগ্রেসের জন্মদাতা কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। ইনি ইংরেজ শাসনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য কংগ্রেস গঠন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সর্বহারা নিম্ন শ্রেণীকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যেন তাহারা কেহই নয়, কিছুই নয়। কিন্তু আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে তাহারাই সব, তাহারাই সব কিছু, তাহাদের হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি, আশা আকাঙ্ক্ষার চাবিকাঠি। আজ তাহারা অসার নির্জীব জড় পদার্থের মতো আছে

বটে, কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় একদিন যদি তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে তবে প্রলয় কাণ্ড ঘটিবে। একথা কি মিঃ হিউমের্ বিবেচনায় আসে নাই? আসা উচিত ছিল।

সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্ত্তব্য নিম্নস্তরকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিধান।

শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ গুলো উপস্থাপনার প্রয়োজন এই কারণে যে ছিয়াশি বছরের একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক মানসিকতা থাকা সত্বেও বিরাশি বছর বয়সে ভগ্নদশা হলো কেন এবং স্বাধীনতা লাভের পর দু'দেশের বেশী সময় পেয়েও সমগ্র দেশের উন্নতি ঘটাতে পারলো না কেন—তারই আভাস আট বছরের শিশু কংগ্রেসেই বিদ্যমান।

১৯১১ সালে কেম্ব্রিজ ফেরত জওহরলাল ও ঠিক এই কথা ভেবেছেন এবং তাঁর আত্মজীবনীতে ব্যক্ত করেছেন। বৈঠকখানা কংগ্রেস ১৯১৬-১৭ সালের আগে পর্য্যন্ত কেমন যেন জনসাধারণ থেকে বিচ্যুত এক নাট্যশালা। যেখানে লণ্ডনের নাটকই বারবার অভিনীত হ'ত।

গান্ধীজীর কংগ্রেসে যোগদানের পর সত্যিকার মরা গাঙে জোয়ার আসে। কংগ্রেসের ডাকে সেদিন ভারতের সাধারণ মানুষ নির্ব্বিবাদে পথে এসে দাঁড়ায়। সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো সাধারণ মানুষ, যারা সমগ্র জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ তারা আশার আলো দেখতে পেয়েছিল—তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছিল।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বক্তব্য এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অস্বীকার করতে পারলেও, একটি ব্যাপারে প্রত্যেকেই এক মত—

তাহলে তিনিই প্রকৃত পক্ষে সর্বসাধারণকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক জোট করতে পেরেছিলেন। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজীর হয়ে থাকবে। আজকের ভারতে যাঁরা জীবিত রাজনৈতিক নেতা আছেন, কী কংগ্রেসে কী বিরোধী দলে—তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক হাতেখড়ি গান্ধীজীর হাতে।

এতবড় গণ জাগরণ সত্বেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এমন রিক্ত এবং অবক্ষয়ের রূপ নিয়ে এলো কেন? এ যেন এক বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন। বর্ত্তমান ভারতের সার্বিক উন্নতির চিন্তা যিনি করছেন তাঁকে এই অবক্ষয় জনিত রোগের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করতে হচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে ১৯৬৮ সাল পর্য্যন্ত ভারতের ভাবমূর্তির দিকে তাকালে, বহুবিধ রোগে ক্ষত বিক্ষত এক ভারতমাতাই যেন দৃষ্টি গোচর হয়। বন্দেমাতরম্ বলে যে মাকে বন্দনা করা যায় না।

এই জন্য দায়ী কংগ্রেস। কারণ, কংগ্রেসই মূলত ভারতের সমগ্র মানুষের মুক্তির প্রতীক। সেই জন্যে তারই সমস্ত দায়িত্ব। বিভিন্ন স্যোসালিষ্ট স্তরে কম্যুনিষ্ট চিন্তা ধারা থাকা সত্বেও কংগ্রেসই পারে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করে বিশ্বসমাজে তাকে স্বাধীন এবং বীর্য্যবান বলে পরিচয় দিতে। কিন্তু কি ভাবে।

কী ভাবে সেটা সম্ভব? সত্যিকারের একজন সৎ, আদর্শবান নেতার দ্বারা। যাঁর আদর্শ হবে ভারতের সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণ। ইন্দিরাজীর পদক্ষেপ সেই আশার বার্ত্তাই আমাদের কাছে বয়ে আনছে। এতদিন আমরা শুধু মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো অপরিমেয় অন্ধকারে তাকিয়ে সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। অবনমিত মস্তক শুধু অন্ধকারই দেখে। আজ মস্তক সোজা করে দাঁড়াবার আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে।

আশার আলোর কথা আপাততঃ স্থগিত রেখে, দীর্ঘদিন কেন আমাদের কোন আশা বাস্তবে রূপ নেয়নি তার অনুসন্ধান করা

প্রয়োজন। আত্ম সমালোচনা না থাকলে গলদ দূর করার সুযোগ থাকে না। বিরাশি বছরের বৃদ্ধ কেন আমাদের ভালো করতে পারেনি তার পর্য্যালোচনা আগে দরকার।

গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেসের নীতি-রীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং পথের নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন। তার আগে যা ছিল, তা নিয়ে লেখার প্রয়োজন নেই। মোট কথা গান্ধীজীর আদর্শই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ। জওহরলালের মতো মণীষার আর্বিভাব হওয়া সত্ত্বেও গান্ধী আদর্শ পরিচালিত কংগ্রেস-এর পরিবর্ত্তন আসেনি। জাতীয় অন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে জওহরলাল নেহরু সব সময় গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর মনের মধ্যে প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠেছিল। কখনো কখনো তা মন্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত এক অদৃশ্য শক্তি যেন পণ্ডিত নেহরুকে গান্ধীজীর বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানাতে বাধ্য করেছে।

গান্ধীজী পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের কী আদর্শ ছিল, এ প্রশ্ন করা হতে সঠিক উত্তর দেওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে। কেননা, আকৃতি পরিধি এবং জন সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে জাতীয় কংগ্রেসের কোন কংক্রিট প্রোগ্রাম ছিল না। দেশকে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শোষণ মুক্ত করার প্রোগ্রাম নিতে গান্ধীজীর বাইশ বছর সময় লেগেছিল। সেই প্রোগ্রাম নেবার পরও তাঁর মনো ভাবে বৃটিশ উচ্ছেদের বীজ ছিল না। তাঁর অহিংসা মন্ত্র ভারতবর্ষের বিপুল জন মানসে সাড়া জাগিয়েছে সত্যি কথা, এবং সেই অহিংস মন্ত্র ভারতবর্ষকে বিশ্বমানসে অপদার্থ বলে প্রমাণও করেছে। গান্ধীজী মানেই জাতীয় কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস মানেই গান্ধীজীর রাজনৈতিক ধর্ম। অহিংস আন্দোলন যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো, তাহলে ভারতবর্ষের চেহারা আজ অন্য রকম হতো এবং সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন করতো সে অনেক আগে। আগে। হরিজন আন্দোলন, হিন্দু—মুসলমানের ভেদাভেদ দূর করার

প্রয়াশ এবং বিদেশী কাপড় বর্জন, ফলে দেশীয় কাপড় গ্রাম্য পন্থায় অর্থাৎ চরকার দ্বারা তৈরি ও গ্রামের চিরাচরিত রূপটিকে পূর্বাবস্থায় রাখা। এগুলো তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, ধর্মীয় রীতি প্রবর্ত্তনের ইঙ্গিত। সুতরাং এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

হরিজন আন্দোলন ঃ—

হিন্দু ধর্মের ব্যর্থ ধর্মীয় পণ্ডিতরা যে জাতিভেদ প্রথা বা কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করে গেছেন, তা ভারতীয় জনমানসে এক বিরাট অবক্ষয়ের সূচনা করে গেছে। কিন্তু এই জাতিভেদ প্রথার জন্যে শাস্ত্র বা হিন্দু দর্শন দায়ী নয়। দায়ী হচ্ছে কালে কালে স্বার্থান্বেষি কিছু শাস্ত্র ব্যাখ্যাকার। যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, বৈশ্য ও একের সঙ্গে মিলনের ফলে অন্য সম্প্রদায়। কিন্তু এই বিভাগ গুলো ছিল মুলতঃ কর্ম গ্রহণ এবং মানসিক বিভাগ। যেমন ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করলেই সে ব্রাহ্মণ হয়। এটা বংশ পরম্পরায় নির্ভর করে না। ব্রাহ্মণ সন্তান যদি পাষণ্ডের ক্রিয়াকলাপ পায় তবে তাকে ব্রাহ্মণ বলা সমীচিন নয়। অন্য সব জাতিগুলোর ব্যাখ্যাও ঠিক তেমনি। কিন্তু এই যে দর্শন ভিত্তিক জাতি ভেদ প্রকরণ, এটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের চাপে পড়ে মিশ্রিতরূপ নিয়েছে, অপব্যাখ্যা হয়েছে, শেষ পর্য্যন্ত কিছু অচ্ছ্যুৎ বর্ণের আবির্ভাব হয়েছে। আসলে অচ্ছ্যুৎ বা হরিজন গোষ্ঠীর আবির্ভাবের মূল কারণ অর্থনৈতিক বিন্যাস। কাজেই এই যে সমাজের পরিত্যাক্ত হরিজন গোষ্ঠী-এরা আমাদেরই রক্তের কোন সময়ের ফলশ্রুতি—ভারতবর্ষের মানুষ।

গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনর ভ্রান্ত দিকটা নিয়েই আমার আলোচনার বিষয়। নেহরু পরিবার জাতি ভেদ প্রথা কখনো মানেন নি। বিশেষ কোন ধর্মের প্রতিও তাঁরা পক্ষপাতী ছিলেন না। এটা কয়েক পুরুষ ধরে একটা মহৎ নজীর নিঃসন্দেহে। তাছাড়া ভারতবর্ষের

অনেক মণীষী এই জাতি ভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। একা স্বামী বিবেকানন্দেই এ ব্যাপারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁরা বলেছেন, যত্র জীব, তত্র শিব। এই যে সব মানুষকে সমান ভাবা এতে বিশেষ বর্ণের প্রতি কোন ইঙ্গিত থাকে না। কিন্তু গান্ধাজী সবাইকে সমান পর্য্যায়ের এবং সমান স্তরের না বলে, একটা বিশেষ বর্ণের অন্য বর্ণের সঙ্গে সমান পংক্তিতে বসবার আন্দোলন সুরু করেছেন। এতে ফল দেখা দিল বিপরীত। ভারতের রাজনৈতিক চেতনা বিক্ষিপ্ত ভাবে জড়িয়ে পড়লো ধর্মীয় রীতিনীতির সঙ্গে। এছাড়া ও, হরিজন সমাজ কী এটা সবাইকে চিনিয়ে দিলেন। এবং সত্যি কথা বলতে কী, পরোক্ষভাবে তাদেরকে গান্ধাজী নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন। আমার আপত্তি সেখানেই। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গেই তারা সমগ্র জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে পারতো, তাদের আর কোন আলাদা অস্তিত্ব থাকতো না। কিন্তু হরিজন অন্দোলন তাদের সত্যিই ভারতীয় সমাজে আলাদা করে রেখেছে। ভারতের সংবিধানে আজও তারা বিশেষ সুবিধার অধিকারী এবং বিশেষ সুবিধা ভোগী বলে, আজও তারা সমাজে আলাদা বর্ণ হিসাবে রয়ে গেছে। এটাও এক ধরণের বর্ণভেদ প্রথা। দেহের কোন একটি অপুষ্ট অঙ্গের চিকিৎসা করলে, সে অঙ্গকে দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে গেলে দেহেরই ক্ষতি। দেহের সমস্ত রক্ত চলাচলা সঠিক পথে প্রবাহিত হলেও, ঐ বিষয় অঙ্গেরও উন্নতি হতে বাধ্য। তাই হরিজন অন্দোলন, সর্বহারার আন্দোলনের মতো ব্যর্থতার নজীর রেখেছে। কারণটা ঐ বিশেষ অঙ্গের উন্নতি। কথা প্রসঙ্গে সর্বহারা আন্দোলনের ব্যর্থতার নজীর আরো ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সে ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী সময়ে করছি। নিম্ন বর্ণের ইতিহাসে যে বঞ্চনার কথা আছে, সে বঞ্চনার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমাধানের কথা বাদ দিয়ে গান্ধীজী ধর্মীয় ব্যাখ্যায় গেছেন। যে ব্যাখ্যায়, বঞ্চনার যন্ত্রনা বিশেষ ধর্মীয় স্তরে গিয়ে বঞ্চনার নগ্নরূপ

স্তিমিত হয়ে গেছে, আমাদের মনে অর্থাৎ ভারতবর্ষের সর্বস্তরের জন মানসে বিশেষ আলোড়ন তুলতে পারেনি।

হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রয়াস ঃ—

এটাও হরিজন আন্দোলনের মতো এক ব্যর্থতার ইতিহাস। হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রশ্ন তখনই আসে, যখন সেখানে বিরোধ থাকে। অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান বিরোধ আছে বলেই মিলনের প্রশ্ন। এতো প্রয়াস সত্বেও হিন্দু মুসলমান সেই ভিন্ন গোষ্ঠিতে রয়ে গেছে এবং তারই ফলশ্রুতি ভারত পাকিস্তানের জন্ম। মহান নেতা গান্ধীজী যদি ধর্মীয় ভাগটাকে অস্বীকার করে বলতেন, ভারতবর্ষের অধিবাসী মাত্রেই ভারতীয় এবং ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ধর্মীয় ভিত্তিতে কোন দলের সঙ্গেই কোন আপস নেই, থাকতে পারেনা। সেই মহান ডাক না দিয়ে তিনি হিন্দু মুসলমানের সমন্বয় করার জন্যে এমন সব রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি করেছেন, যা আজও বিলীন হয়নি। বর্ত্তমান বাংলা দেশের স্বাধীনতা অন্দোলনকে তাই সর্বস্তর থেকে পূর্ণ সমর্থন যা মনের দিক থেকে পূর্ণ সমর্থন যা মনের দিক থেকে আসা উচিত ছিল —তা আসেনি। অনেকেই সেটাকে বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার মতো ছেলে মানুষী বক্তব্যকে আমল দিচ্ছেন। ১৯১৬-১৭ সালের খেলাফত আন্দোলনে গান্ধীজীর যোগদানকে কোন ক্রমেই ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত একথা কোন ক্রমেই ভাবা যায় না। জিন্না গান্ধীজীকে এ ধরণের অন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে যেন উত্তেজিত না করেন, তাহলে ফল শুভ হবে না। সত্যিই সে ফল শুভ হয়নি। ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালের সেই রক্তক্ষয়ি দুর্ঘটনা আজও ইতিহাসের এক কলঙ্ক অধ্যায়। বৃটিশ সাংবাদিক মোসলে লিখেছেন,

···The filthy and dreadful staughter which turned Calcutta into a charnel house for seventy two hours in August 1946 is important because it did more than murder innocent people. It murdered hopes too. It changed the shape of India and the course of history. The corpses of men, women and children lay stinking in the gutters of chowringhee Square until the only reliable garbage collectors of India, the vultures picked them elean, and with every mouthful, they picked away the fabric of a unitary India,… …

১৯১৬ থেকে ১৯৪৬ এই তিরিশ বছরের হিন্দু মুসলমানের মিলনের প্রয়াস সন্ধিক্ষণে এসে এমন বিভৎসভাবে ফেটে পড়লো কেন? আর কেনই বা ভারতবর্ষ এক মহান দেশ এই আপবাক্য চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো? সম্ভবতঃ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এটাই সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজডির নায়ক কে? আর কারাই বা এর কুশীলব? সে কথায় পরে আসছি। মূলতঃ এর জন্যে বেশ কয়েক-জন প্রথম সারির জাতীয় নেতা দায়ী। দায়ী এই কারণেই যে তাঁরা বৃহত্তর জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসী এ ধরণের আত্মঘাতী হিংস্রতায় নেমে পড়লো কেন, এর ব্যাপক অনুসন্ধান দরকার। পরোক্ষ ভাবে হলেও এর জন্য মিলনের নামে বিরোধকে আরও প্রকট করে তোলা এবং নেতৃস্থানীয় কারও কারও উচ্ছ্বাস বসতঃ অকারণ মন্তব্য করা। কেবিনেট মিশন প্লান ব্যর্থ হবার পেছনেই তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

হিন্দু মুসলমান বিরোধ নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে কেন দেখা দেয় নি, আর কেনই বা ধর্মমত নির্বিশেষে তাঁকে সবাই অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল এবং আজও হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় তাঁকে নেতাজী বলে শ্রদ্ধা করে—এটা গভীর অনুসন্ধানের দরকার।

গান্ধীজী এবং জওহরলালই নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সব চাইতে বেশী হিন্দু মুসলমানের মিলনের চেষ্টা করেছেন এবং তার জন্যে তাঁরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তা সত্বেও তাঁরা কেন হিন্দু মুসলমানকে এক করতে পারলেন না, ভারত ভাগকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন? কারণ সেই একটাই। হিন্দু মুসলমান বিরোধের প্রশ্ন না তুলে, তারাও যদি বলতেন "Give me blood, I will give you freedom" তাহলে ১৯৪৬ সালের কলকাতা, ১৯৪৭ সালের পাঞ্জাবের ঘটনা ঘটত না, ভারতমাতার খণ্ডিত মূর্তি দেখতে হতো না। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে গান্ধীজী সেই মহান ডাক দিতে পারেননি। বলতে পারেন নি, এসো ভারতবাসী, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করো। অহিংস মন্ত্রের প্রবক্তা গান্ধীজী রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার ডাক দিতে না পারলেও সবাইকে একযোগে সংগ্রামে আহ্বান করতে পারতেন। তা পারেন নি বলেই হিন্দু মুসলমানের প্রকৃত মিলন সম্ভব হয়নি। আজও তা বিরাট ক্ষত হয়ে রয়েছে।

বিদেশী কাপড় বর্জন এবং চরকা প্রবর্ত্তন :—

বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের এক ব্যাপক সংগ্রাম নিঃসন্দেহে। তৎকালীন সময়ে ভারতের জনমানসে এক ব্যাপক আলোড়ন এনেছিল। বিদেশী দ্রব্যের প্রতি এই যে ঘৃণা এটা বৃটিশ অর্থনীতির ওপর একটা কঠিন আঘাত হেনেছিল। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এ অন্দোলনও ব্যর্থ বলতে হবে। কেননা কংগ্রেসের সে সময়ে কোন বিকল্প অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম ছিল না। চরকা প্রবর্ত্তনের মতো এক অবৈজ্ঞানিক প্রোগ্রাম ছাড়া, বিভিন্ন সময়ে রাজশক্তির কাছ থেকে পাওয়া সুযোগের দ্বারা আর কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হয়নি। চরকা প্রবর্ত্তনটাই কৃষিভিত্তিক ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির মূল কথা নয় বা বিদেশী বস্ত্র বর্জন নীতি। পাশাপাশি যদি

গঠন মূলক কোন পন্থা না থাকে তাহলে সব আন্দোলনই আন্দোলিত হয়ে এক সময় বিলীন হয়ে যায়। জাতীয় কংগ্রেসে মেঘনাদ সাহা এবং সুভাষ চন্দ্র রচিত এক অর্থ নৈতিক প্রোগ্রাম গান্ধীজীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। গান্ধীজী প্রথমে সেটা গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে করেননি। পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। জওহরলালের প্রগতিশীল দৃষ্টি ভঙ্গির জন্যে তাঁকেও এই অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে সহযোগীতার আহ্বান জানানো হয়েছিল। জওহরলাল রাজিও হয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতিও দিয়ে-ছিলেন কার্য্যে রূপান্তরিত করার জন্যে। কিন্তু কোন এক অশুভ অদৃশ্য হাত এই পরিকল্পনা থেকে কংগ্রেসকে বিরত করলো। স্বাধীন হবার পরও ভারতের অবিসম্বাদিত নেতা কেন সঠিক অর্থনীতির প্রবর্ত্তন করতে পারলেন না তার আলোচনা পরে করছি। মূল কথা, বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের যে প্রচণ্ড সম্ভাবনা ছিল, প্রকারান্তরে তাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হলো। অর্থ নৈতিক প্রগতি যেখানে বড়কথা, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ অর্থনীতি উন্নয়নে তত বেশী প্রয়োগের প্রয়োজন। সেদিকে পদক্ষেপ না করে আমাদের জাতীয় নিদর্শন খালি ঘ্যাঁঘর ঘ্যাঁঘর শব্দ করেই চলেছে, একই জায়গায় অনন্তকাল ধরে

সুতরাং গান্ধীজী অচল জাতীয় কংগ্রেসকে যতখানি সচল করে-ছিলেন, ততখানি প্রাণ স্পন্দনের পরিচয় দিতে পারেন। এ যেন মৃত ব্যাঙের গায়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের মতো ক্ষণিক কম্পন। কেন গান্ধীজী প্রবল ভূমিকম্পের মতো ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করতে পারেননি? কেন দীর্ঘ সময় ধরে জাতীয় অন্দোলন বৃদ্ধের স্থবিরতায় পর্য্যবসিতার এর প্রথম কারণ যুব শক্তিকে অস্বীকার করা। জাতীয় কংগ্রেস কখনোই যুবকদের নিয়ে বৃহত্তর সংগ্রামের ঝুঁকি নেয়নি। ঝুঁকি নেয়নি বলেই জাতীয় আন্দোলন (বাংলার মুক্তি

সংগ্রাম বাদে) কখনো তীব্রতায় পৌঁছয় নি। স্বর্গতঃ মতিলাল নেহরু গান্ধীজীকে একবার পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে প্রগতিশীল কোন যুবককে যে বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত—তাকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেওয়া হোক। সাজেশন হিসাবে দুটো নাম দিয়ে-ছিলেন (এক) জওহরলাল নেহরু (দুই) সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। তৎকালীন সময়ে মতিলালও বুঝেছিলেন, যুবশক্তিকে নেতৃত্ব দিতে হবে। নইলে, স্বাধীনতা আন্দোলন কখনই তীব্রতর হবে না। আজকে জাতীয় কংগ্রেসের নিয়ামক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেটা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করছেন। আর সেই কারণেই আজ প্রগতিশীল যুবকরা কংগ্রেসের হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, পুরণো স্থবির ধ্যান ধারণা পাল্টাতে সুরু করেছে। তিন বছর আগেও যে যুবসম্প্রদায় কংগ্রেসে কল্কে পায়নি, আজ তারা কংগ্রেসের স্তম্ভ বিশেষে। সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবিদের মন থেকে যে জাতীয় কংগ্রেস মুছে যেতে বসেছিল, আজ ইন্দিরাজীর বাস্তব পরিকল্পনা এবং যুবসম্প্রদায়ের সহযোগিতায় নতুন করে গনমানসে প্রতিষ্ঠিত হতে সুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের ক্লীব সম্প্রদায়ের রাজনীতির ফলে মানুষ বামপন্থী আর এক অশুভ রাজনীতির কবলে পড়ে দিনের পর দিন এক অন্ধকার জগতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কোন কিছুতেই মানুষ আর বিশ্বাস রাখতে পারছিল না। কালেক্টিভিজমের শ্লোগান দিয়ে ইনডিভিজুয়ালিজমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভারতের প্রত্যেকটা মানুষই একক, প্রত্যেকেই স্বাধীন, কেউই কারো উপর নির্ভর করবেনা। কেমন হয় সেই চেহারাটা ? সে এক বীভৎস নগ্ন মূর্ত্তি। কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়। আমাদের সৌভাগ্য, সেই চরম পর্য্যায়ে পৌঁছুবার আগে ইন্দিরাজী সেটা উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু তা বলে আমরা সেই চরম ধ্বংস থেকে রেহাই পেয়েছি এমন ভাবলে ভুল করা হবে। কেননা, এ শুধু মাঝ দরিয়ায় ভগ্ন হাল, ছেঁড়া

পাল তরণী ঘূর্ণিতে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছিল ; সেখান থেকে সরিয়ে শক্ত করে তার হাল ধরা হয়েছে। কূল এখনো অনেক দূরে এবং পথও অনেক বিপদ সঙ্কুল।

যুবসম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দেবার জন্যে মতিলালের প্রয়াশ থাকা সত্বেও কেন কংগ্রেসে যুব সম্প্রদায় প্রকৃত নেতৃত্ব পেল না সেটা জানা দরকার। জওহরলাল প্রমুখ কয়েকজন যুবক কংগ্রেসের নেতৃত্ব পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে নেতৃত্বকে সঠিক পথে নিয়ে যাবার পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁরা পাননি। পাননি, জাতীয় কংগ্রেসের অদৃশ্য নেতার দৃশ্য হস্তসঞ্চালনের জন্যে। জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠণে যদিও গণতন্ত্রের পোষাক পরানো ছিল, তা সত্বেও ডিক্টেটারি প্রভাব সেটাকে কার্য্যক্ষম করতে দেয়নি। কংগ্রেস সভাপতির ওপর যিনি ছিলেন, তাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধীহীন অবস্থায় কংগ্রেস কোন পরিকল্পনা নিতে পারেনি। পারেনি বলেই কংগ্রেসের তৎকালীন যুবসম্প্রদায় প্রকৃত যুবসম্প্রদায় হতে পারেনি।

তাছাড়া অহিংসা মন্ত্রে আবিষ্ট কংগ্রেস যুবসম্প্রদায়ের কাছে এমন কোন ঐতিহাসিক নজীর দেখাতে পারেনি যাতে যুবকরা (যারা ভারতের স্বাধীনতার কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করছে) কংগ্রেসের অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশোদ্ধারের কাজে নামতে পারে। বহু যুবক যারা গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বিশেষ করে বাংলার যুব সম্প্রদায়—তাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। গান্ধীজীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তারা আত্মরক্ষা করছিল বৃটিশ হিংস্র পুলিশ বাহিনীর হাত থেকে। আর যারা সত্যিই প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তি নিয়ে গান্ধীজীকে অনুসরণ করেছিলো, কিছু দিনের মধ্যেই মত পাল্‌টে তারা গুপ্ত বিপ্লবী দলে মিশে গেছে। কাজেই গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকে প্রচণ্ড শক্তিধর যুবসম্প্রদায় মুক্তির পথ বলে ভাবতে পারেনি।

পৃথিবীর সর্বকালে এই যুবসম্প্রদায়ই ভাঙাগড়ার কাজ নিয়েছে। তাদের চরিত্রে প্রচণ্ড উত্তেজনা, জিজ্ঞাসী, অনুসন্ধিৎসু, আত্মত্যাগে দ্বিধাহীন। সবচেয়ে বড় কথা এরা জঙ্গী। এই জঙ্গী মনোভাব ছাড়া কোন সাহসিক গঠন বা ভাঙনের কাজ সম্ভব হয় না। তাই তৎকালীন জঙ্গী যুবসম্প্রদায় গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থায় এবং পরে পরে কম্যুনিষ্ট ও সমাজতান্ত্রিক সংস্থায় যেখানে বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে—সেখানে যুক্ত হয়ে পড়েছে। বিপ্লব এমনই এক জিনিষ যা সাধন করতে হলে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন—যা দেহে এবং মনে বিরাজ করবে। একটা বিরাট নদী মাঝে মাঝেই দেশের ধ্বংস করছে, তাকেও কল্যাণময় রূপে নিয়ে যাওয়া যায়। যদি তার গতিপথ বাঁধের দ্বারা সংযত করে অনুর্বর ক্ষেত্রে প্রবাহিত করা হয়। বিপ্লব হলো তাই, পুরনো ব্যবস্থার বাধ্যতা-মূলক আমূল পরিবর্ত্তন। জওহরলাল প্রমুখ যুব সম্প্রদায়, যারা উচ্চ শিক্ষিত, তারা প্রত্যেকে ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার বিপ্লব, আইরিশ বিপ্লব ও রাশিয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, সে সব বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভারতেও সে ধরণের বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নীতি ট্যাক্‌টিস্‌ হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে হলো ক্রীড্‌ হিসেবে। এতে শক্তিশালী বৃটিশ সরকারকে অপসারণ করার কোন প্রশ্নই আসে না। কেননা, সৎ প্রচেষ্টা বা ভদ্র কথায় কোন অত্যাচারি সরকারের মানসিক পরিবর্ত্তন আনে না, নিছক কিছু সুবিধা আদায় ছাড়া। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনেও যে তীব্রতা এসেছিল ১৯২৪ সালের দিকে এবং তার পরেও, সেটাও ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাপুজীর হঠাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার আন্দোলনকারীদের হতাশ করে তুলেছিল। তৎকালীন কংগ্রেসের অনেক কংগ্রেস নেতাই সেটাকে হঠকারিতা ভেবেছিলেন। অর্থাৎ একার ইচ্ছা এবং চিন্তার ফলশ্রুতি হিসেবে কংগ্রেস আন্দোলন

চলছিল। এবং এই ভাবেই কংগ্রেস প্লাটফর্মে বামপন্থীদলের আবির্ভাব। বাংলাদেশ কেন কংগ্রেস আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেলো, এটাও আজ গভীর চিন্তার বিষয়।

১৮৮৫ সাল থেকে যে রাজনৈতিক প্লাটফরম তৈরি হয়েছিল, সেখান থেকে সত্যিকার দেশোদ্ধার বা জাতি গঠনের এবং ভগ্ন ভারতের পুনর্গঠনের কাজ রূপায়িত হয়নি। এর কারণ আগেই বলেছি। বাপুজী যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়েছিলেন, জওহরলাল যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং ভারতের অগনিত বিপ্লবী রক্তের অক্ষরে যা লিখে রেখেছিলেন তার ফলশ্রুতি এরকম হলো কেন?

ভারতবর্ষের মতো একটা দেশকে কয়েক'শ বছরের ধ্বংসের পর নতুন করে তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠন হয়তো সহজসাধ্য নয়, কিন্তু তা বলে স্বাধীনতার পরবর্ত্তী জাতীয় সম্পদ বারোয়ারী লুণ্ঠনের ইতিহাস রচনা করবে—এটাই বা কেন? কারণ দেশটাকে যদি নিজের দেশ ভাবা না যায়, তবে দেশের সম্পদকে সমগ্র ভারতবাসীর ভাবার কোন কারণ নেই। এ সব মহৎ লুণ্ঠনকারীদের কথা স্বর্গতঃ জওহরলাল নেহরু জানতেন। কিন্তু তাদের রোধ করতে পারেননি, কেন পারেননি সেটা সব চাইতে বেশি জানেন বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

পৃথিবীর ইতিহাসে রুশ বিপ্লব এক মহান বিপ্লব নিঃসন্দেহে। রাশিয়ার মানুষ মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়েছিল সেদিন। এ মুক্তি বিদেশী শাসন থেকে নয়, স্বদেশের পশু শাসনের হাত থেকে মুক্তি। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর এই মহান বিপ্লবের দিন। সেই বিপ্লবের মাহেন্দ্র ক্ষণে, লেনিনের বিপ্লবধ্বনি যখন ইথারের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে, সে সময় জন্ম নিলেন জওহরলালের বিপ্লবী চেতনার ফসল ইন্দিরা বা ইন্দু।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ। সমস্ত পৃথিবীব্যাপি এক বিরাট পরিবর্ত্তন

চলেছে। মূলতঃ শিল্প বিপ্লব তথা যান্ত্রিক সভ্যতার ব্যাপক প্রসারের সূচনা হয়েছে। ভারতের মাটিতে তখন ইংরেজ বিতাড়নের চিন্তাধারা দৃঢ় ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯০৫ সাল থেকে ভারতের বিপ্লবী চিন্তাধারার মানুষের মধ্যে একথা স্থিরিকৃত যে, স্বাধীনতা আনতে হলে সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন দেশ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীন হয়নি। ভারতের বিপ্লববাদ সেই ইতিহাসেরই ফলশ্রুতি।

ইন্দুর মধ্যেও সেই ভাবধারা বর্ত্তমান ছিল। ঠাকুরদাদা মতিলাল নেহরু মানসিকতায় একজন বিপ্লবী ছিলেন। শেষ বয়সে কংগ্রেসে যুক্ত থেকেও তিনি বিপ্লববাদের সমর্থক ছিলেন। কোন কিছুর সঙ্গে আপোষ করা তাঁর চিন্তার বাইরে ছিল। বাংলাদেশের কংগ্রেস অধিবেশনের সূচনায় সভাপতি মতিলালকে যে বিপ্লবী সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়েছিল, ভারতের তৎকালীন কোন নেতা সে সম্বর্দ্ধনা লাভ করেননি। সরাসরি বিপ্লবী দলে যুক্ত না থাকলেও, চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু পরোক্ষভাবে বিপ্লবী দলে যুক্ত ছিলেন একথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার। অহিংসা মন্ত্রের দ্বারা বৃটিশ সরকারকে ভারত থেকে বহিষ্কার করা যাবে—এটা সম্পূর্ণভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন না। এবং বিশ্বাস করাটাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন সংগ্রামী মানুষ। বেঁচে থাকার জন্যে, প্রতিষ্ঠার জন্যে, আদর্শের জন্যে প্রতিমুহূর্ত্তে সংগ্রাম রত ছিলেন। তাঁর 'আনন্দ ভবন' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান।

সেই মানসিকতার ফসল জওহরলাল এবং বিপ্লবী জওহরলালের পুত্র-কন্যা-বন্ধু ইন্দিরার মধ্যে সে চিন্তাধারা অনেক ব্যাপ্ত ও সুদৃঢ়।

বাল্যকাল তাঁর নিঃসঙ্গ ভাবেই কেটেছে। মা-বাবা দুজনেই দেশের কাজে বহির্মুখী নয়তো জেলে। ক্ষুদ্র মানুষ অথচ মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এসে মাঝে মাঝে ইন্দিরার খেলার সাথী

হতেন। ইন্দিরা বলে থাকেন শিশুকালে শিশুদের সঙ্গে খেলেছি বলেও মনে পড়ে না।

শৈশবেই তাকে সুইজারল্যাণ্ডের স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। সেখান থেকে যখন ফিরলেন তখন তাঁর বয়স দশ বছর। পিতার পার্টিতে কাজ করা উচিত, তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন একথা সে সময় থেকে ইন্দু উপলব্ধি করতেন। বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক প্রতিভা অনস্বীকার্য্য। এটা হঠাৎ হয়নি, এটা ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সেই দশ বছর বয়সে কংগ্রেসকে সহায়তা করার জন্যে বাচ্চাদের নিয়ে একটা বাহিনী গঠন করেছিলেন, যার নাম দিয়েছিলেন বানর ব্রিগেড। এরা কংগ্রেস কর্মীদের চিঠি নিয়ে ছুটোছুটি করতো, পিকেটিং-এ যোগ দিত। ১৯৩০ এর আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশের লাঠিতে আহত লোকদের সরকারী হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হ'ত না। ইন্দুর মা কমলা দেবী আনন্দভবনে তাঁদের বাড়ীর একটা ঘরকে হাসপাতালে পরিণত করেছিলেন। ওটুকু ঘর আর ওটুকু সেবা হয়তো পর্য্যাপ্ত ছিলনা। কিন্তু মা মেয়ের ভালবাসা সে অভাব পূর্ণ করতো। ইন্দিরাজী বলেছেন —"ছেলেটিকে নিদারুণ আহত অবস্থায় আনা হ'ল, সকলে বললো. এ তো মরবেই, মরবার আগে যতটা পার একে আরাম দাও। আমি ঈশ্বরকে ডেকে বললাম একে যদি না বাঁচাও তবে আমি তোমার ওপর বিশ্বাস ছেড়ে দেবো। ছেলেটি বেঁচেছিল।" এমনধারা বহু ছোট খাটো অথচ মহৎ নজীর ইন্দিরার আছে।

জন্ম মুহূর্ত্ত থেকে যে নীড়চ্যুত তার বেঁচে থাকা নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য। কারণ, সুদৃঢ় ভূমির ওপর দাঁড়াতে না পারলে মানুষ গড়ে ওঠে না। ইন্দিরার পয়ের নীচের জমি বারবার সরে গেছে। স্কুলের লেখাপড়া তাঁর বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। নেহরু যখনই অবসর পেতেন, তখনই একমাত্র আদরের ধন ইন্দুর কথা ভাবতেন। অতি কর্মব্যাস্ত

উদ্ধার মতো জওহরলাল মেয়ের কথা ভেবে বিমনা হয়ে পড়তেন। ইন্দুকে লেখা বহু চিঠির মধ্যে পিতা জওহরলালের সেই স্নেহ প্রবণ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে কমলার কথা ভেবে অস্থির হন, কমলার আবর্ত্তমানে ইন্দুর কি হবে এ চিন্তা সুদুর বিদেশেও তাঁকে সুস্থির থাকতে দিত না।

অযত্ন এবং পরিশ্রমের ফল হিসাবে দেখা দিল কমলা দেবীর যক্ষা। ডাক্তার দেখাতে জওহরলাল স্ত্রীকে নিয়ে ছুটলেন কলকাতায়। পথে বিহারের ভূমিকম্প। রোগ ভুলে স্বামী স্ত্রী আর্তের সেবায় ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন। ইন্দু তখন শান্তি নিকেতনে কবিগুরুর কাছে। তারপর ইন্দু এলেন পুণার স্কুলে।

১৯৩৬ সাল ইন্দিরার জীবনের এক গুরুতর সময় নিঃসন্দেহে। কেননা কমলাদেবী গুরুতর অসুস্থ হয়ে সুইজারল্যাণ্ডের সেনাটোরিয়ামে ভর্ত্তি হলেন। মায়ের দেখা শোনার জন্তে লেখা পড়া ছেড়ে ইন্দিরাকেও সেখানে যেতে হল। প্রত্যেক দিন মায়ের শয্যা পার্শ্বে ইন্দিরা চুপচাপ বসে থেকে মায়ের করুণ মুখ প্রত্যক্ষ করতেন, সেই নির্জন নিঃসঙ্গ সময়ে নীরবে পাশে এসে দাঁড়াতো সুদর্শন যুবক ফিরোজ। ফিরোজ গান্ধীর জন্ম বোম্বাইতে হলেও তাঁদের পারিবারিক বাসস্থান ছিল এলাহাবাদে। শৈশবে ইন্দিরার যে ক'জন খেলার সাথী ছিল তার মধ্যে ফিরোজ অন্যতম। ফিরোজ ছোট বেলা থেকে পার্টির কাজে খুব খাটতেন। নেহরু পরিবারের মধ্যে একমাত্র কমলাদেবীকেই ও সব চাইতে বেশী ভক্তি করতেন ও ভালোবাসতেন। সেই জন্য ইন্দিরার সমব্যথী হয়ে কমলাদেবীর শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত থাকতেন। ইন্দিরা ফিরোজকে নতুন ভাবে প্রত্যক্ষ করলেন। কমলাদেবীর সেই অন্তিম সময়ে আরো একজন মহাপুরুষ তাঁর শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র। ইন্দিরার আশ্রয়স্থল কমলাদেবী চিরকালের জন্যে বিদায় নিলেন।

জওহরলাল স্নেহচ্যুত ইন্দিরাকে নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর লণ্ডন। অক্সফোর্ডের সোমারভিল কলেজে মেয়েকে ভর্ত্তি করেছিলেন জওহরলাল। ফিরোজ তখন লণ্ডনে। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর ছাত্র। কৃষ্ণমেননের সঙ্গে পরিচয় সেখানে।

ইণ্ডিয়া লীগের কর্ণধার কৃষ্ণমেনন, জওহরলালের সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই তাঁকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে নেহরুজীই ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব নিতে পারবে। তার জন্যে বিদেশে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, সভাসমিতি মারফৎ জওহর-লালের প্রচার করতেন। জওহরলালের অর্থ নৈতিক দুরবস্থার সময়ে কৃষ্ণমেনন পণ্ডিতজীর বিখ্যাত পুস্তকের প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। এভাবে কৃষ্ণমেনন বিদেশে জওহরলালের একমাত্র নির্ভরশীল ব্যক্তি হয়ে পড়েন। জওহরলাল শেষ দিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণমেননকে নিজের ছত্র ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। একটি লোকের সামান্যতম কাজের প্রতিদান দিতে গিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে এক বীভৎস আত্মগ্লানির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গান্তরে সে আলোচনার চেষ্টা করবো।

২৬শে মার্চ ১৯৪২ সালে পিতার অমতে ইন্দিরা ফিরোজকে বিয়ে করলেন। অমতের কারণ ছিল ইন্দিরা ব্রাহ্মণ কন্যা এবং ফিরোজ পার্শী। যে জওহরলাল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন না, নিজেকে বহু ধর্মের মিলিত চরিত্র বলে ভাবতেন, তাঁর পক্ষে ইন্দিরার বিবাহের বিরোধীতা একটা বিরাট রহস্য ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে ভারতীয় আদর্শ এবং ভাবধারা নেহরু পরিবার কখনো ত্যাগ করতে পারেননি। নইলে মুসলমান এবং খৃষ্টান ভাবধারায় থেকেও মতিলাল তাঁর ছেলে জওহরলালের জন্মদিন করলেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ নিয়মানু-সারে। আর তাঁর ছেলে জওহরলাল কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাত না থাকা সত্বেও মেয়ের অসম ধর্মে বিবাহকে মানতে পারলেন না। এতেই বোঝা যায় নেহরু পরিবারের মহিলারা যে ভারতীয় আদর্শের

আলোকবর্তিকা হাতে নিয়েছিলেন তাঁর দীপ্তি পুরুষদেরও স্পর্শ করেছিল। হাজার হাজার বছরের সংস্কার রক্তের অণু পরমাণু থেকে অত শীঘ্র অপসৃত করা সম্ভব নয়। তার মানে এই নয় যে তাঁরা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে ভুগছিলেন।

পিতার অমতে ফিরোজকে ইন্দিরার বিয়ে করাটা এক দিক থেকে খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। যারা মনে করেন ইন্দিরা পুরনো কংগ্রেসের ধারক বাহক এবং জওহরলালের প্রতিলিপি তাদের শিক্ষার জন্যেই একথা বলা দরকার যে, প্রয়োজনে পিতার বিরোধীতা করতে ইন্দিরা দেরি করেন নি। এ ঘটনায় দেখা গেল এক নেহরুর দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে আর এক নেহরুর দৃঢ় সঙ্কল্পের সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে জয় হয়েছে ইন্দিরার। ফিরোজ ইন্দিরা দেশে ফিরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারশানের সভ্য হয়েছিলেন।

অক্সফোর্ডে অধ্যায়নকালে ঠাণ্ডা লেগে ইন্দিরা প্লুরিসিতে আক্রান্ত হন এবং গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পিতা তাকে সুইজারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেন। তখন যুদ্ধ চলছিল। অল্প দিনেই সেরে উঠেন। কিন্তু জার্মানদের হাতে ফরাসীদের পরাজয়ের দরুণ সেখানেই আটকা পড়ে গেলেন। সুইজারল্যাণ্ডের সবকটি সীমান্ত তখন বন্ধ হয়ে যায়। এক বছর চেষ্টার পর কোন রকমে দেশে ফিরে আসেন। অক্সফোর্ডে আর ফেরা হলো না।

দেশে ফিরেই তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিলেন। এবার তাঁর নিজের জেলে যাবার পালা। ইন্দিরা বিনা বিচারে আটক হলেন এবং ফিরোজের হল দেড় বছরের কারাবাস। নিয়তির পরিহাসে একই জেলে দুজনে রইলেন, কিন্তু দিনে দুবারের বেশী পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হতো না। যে দিন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, সেদিন তার প্রবল জ্বর। জেলে পৌছুবার পরই ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার ডিম, ওভালটিন এবং ফল পথ্য লিখে দিলেন। ডাক্তার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জেল

সুপারিন্টেডেণ্ট ইন্দিরার চোখের ওপর প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আম ইন্দিরার খুব প্রিয়। বাড়ী থেকে আম পাঠালে ওগুলো ওঁর কাছে এসে পৌঁছাত না। জেলার এসে দাঁত বের করে বলতো, আপনার বাড়ী থেকে পাঠানো আমগুলো খুব ভালো ছিল। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেগুলো খেয়েছি।

স্বাধীনতার কিছুদিন আগে জওহরলাল কন্যাকে আনন্দ ভবনে নিয়ে আসেন সম্ভবতঃ ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে। অতিথি অপ্যায়নের দায়িত্ব এবং নিঃসঙ্গ পিতার সাহচর্য্যের জন্যে। নিজের সংসার স্বামীকে এমন কি নিজের সুখ সুবিধাকে বিসর্জন দিয়ে পিতার পাশে এসে দাঁড়ান। ফিরোজ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এর জন্যে। যুক্তিবাদী ইন্দিরা ভাবাবেগকে কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। নিজের সুখের চাইতে দেশ তার কাছে অনেক বড়। রাজনীতির ঘরে বাস করা সত্বেও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে লালসা না থাকার দরুণ স্বাধীন ভারতবর্ষকে লুটপাটের মহাসমারোহে দর্শক হয়ে ছিলেন। ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।

স্বাধীনতার কিছুদিন আগে পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ইন্দিরাকে বিধান সভা নির্বাচনে দাঁড়াতে বলেন। ইন্দিরা রাজি হননি। এই প্রত্যাখ্যানে পন্থজী খুব চটে গেলেন। ঐ টুকু একটা মেয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে একথা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। কারণ ইন্দিরার শুকনো চেহারার মধ্যে ভাসা ভাসা দুটো কবি সুলভ চোখ থেকে যেন সব সময় কারুণ্য আর আত্ম সমপর্ণের ভাব স্পষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু ওর মধ্যে যে ক্ষুরধার বিদ্যুৎ প্রবাহ আছে এটা কচিৎ কদাচিৎ বোঝা যেত। চার বছর বয়সের ইন্দুর চোখের সে প্রভা প্রত্যক্ষ করেছে বৃটিশ সৈনিকরা আনন্দ ভবন লুট করার সময়। সে প্রভা প্রত্যক্ষ করেছে অল্পদিন আগে নরঘাতী ইয়াহিয়া এবং নিক্সন।

ছোটবেলা যে জোয়ান অব আর্ক হবার স্বপ্ন দেখতো তার মধ্যে সে বজ্র দৃঢ়তার জন্মের খবর অনেকেই রাখেন না। পন্থজীও তাঁকে বুঝতে পারেনি। তাই ব্যাপারটা গান্ধীজীকে বললেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন ইন্দিরাকে যেন রাজী করান হয়। গান্ধীজীর অনুরোধও ইন্দিরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। স্বাধীনতার পর প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে তাঁকে দাঁড়াতে অনুরোধ করা হয়েছিল, প্রতিবারই তিনি তা প্রত্যাখান করেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলতেন, —পার্লামেণ্ট বা বিধান সভায় ঢুকলে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বেন। অনেক সৎ কংগ্রেস ম্যানের ধারণা, তাহলে, পিতার মতানুযায়ী তাঁকে চলতে হবে এবং পিতা নেহরু যা বলবেন তাতেই তাকে ঢেঁড়া সই দিতে হবে। পার্লামেণ্ট বা আইন সভায় তিনি যাননি বলে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বা মর্যাদা কোথাও খর্ব হয়নি। এটা বিদেশী নীতিবিদ এবং সাংবাদিক যাঁরা ভারতে এসেছেন তাঁরা জানতেন। বরং রাজনৈতিক হালচাল এবং বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ হয়েছিল 'সীমাবদ্ধ' রাজনীতির বাহিরে থেকে। নইলে ভারতবর্ষের সার্বিক হট্ট-চট্টের মধ্যে পড়েও সঠিক ভাবে হাল ধরতে পারতেন না।

বান্দুং সম্মেলনে তিনি পিতার সঙ্গে ছিলেন। সেখানে চৈনিক প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পিতা কোন বিতর্কের মধ্যে চটে উঠলে বলতেন,—বাবা শান্ত হও! নেহরুকে শান্ত হতে বলার সাহস আর কারও ছিল না। ইন্দিরা রাশিয়া গিয়েছেন, কেন্দ্রিয় রাশিয়ার উন্নতিতে মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাশিয়ার প্রলেটা-রিয়েট ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে বলেছেন।

১৯৫৯ সাল ইন্দিরার রাজনৈতিক জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ বছর। জানুয়ারী মাসে কংগ্রেসের মধ্যে একটা বামপন্থী উপদল সৃষ্টি হয় এবং তারা জিঞ্জারগ্রুপ নামে পরিচিত। ইন্দিরা এই গ্রুপে যোগ দেন।

এই উপদলের অনেকেই কংগ্রেসের নির্বাচনে বা সাধারণ নির্বাচনে হেরে যায় এবং অনেকে আবার কৃষ্ণমেননের সঙ্গে যোগ দেয়। ফেব্রুয়ারী মাসে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

ইন্দিরা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলো। লিক এবং ব্লিৎস তাঁর উচ্চ প্রশংসা সুরু করে দিলেন। লিখলেন, এবার গতিশীলতার (Dynamic) যুগ আসবে।

ছয় মাসের মধ্যে কম্যুনিষ্টরা দেখলো যে ইন্দিরা নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে গদি থেকে নামিয়ে দিলেন। কৃষ্ণমেনন কম্যুনিষ্ট সরকারকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ৩১শে জুলাই নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কেরলে কংগ্রেস পুনরায় সরকার গঠন করলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যদি ভাবেন যে ইন্দিরা কম্যুনিষ্ট বিরোধী, সে কথা সত্য নয়। ইন্দিরা আগ্রাসী কম্যুনিজমকে বাধা দিয়েছেন সত্য কথা, কিন্তু তাদের সংগঠন শক্তির ওপর তাঁর পূর্ব্ব আস্থা আছে। একথাও তিনি বলেছেন যে জনসাধারণের গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ আছে, কিন্তু কম্যুনিষ্ট আদর্শের আকর্ষণ তার চেয়ে বেশী। সোস্যালিষ্ট নেতা পুরুষত্তম ত্রিকম দাস বলেছেন যে, মাঝখানের অল্প কয়েকদিন বাদ দিলে সারা জীবনই ইন্দিরা কমুনিষ্টদের সহযাত্রী। সবই ধারণা। কেরল মন্ত্রি সভার পতন ঘটাবার পক্ষে জওহরলাল সক্রিয় ছিলেন না। বলতে গেলে এক্ষেত্রে পিতা কন্যার বিপক্ষে এবং তাতে কন্যার জয়।

১৯৫৩ সালে দক্ষিণ ভারত ভাষার ভিত্তিতে পূর্ণগঠিত হয়। বোম্বাই এবং পাঞ্জাবের ভাষাভিত্তিক পুর্ণগঠন দাবী অগ্রাহ্য করে নেহরু ঐ দুইটি রাজ্যকে দ্বিভাষী প্রদেশে পরিণত করেন। কিন্তু ইন্দিরা অনুভব করেন যে, বোম্বাইর ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়া উচিত এবং তা হলে সেখানে শান্তি স্থাপিত হবে। সে সময়ে গুজরাটী এবং মহারাষ্ট্র ভাষাভিত্তিক সংগ্রাম সারা ভারতের সহাবস্থান নীতির ওপর প্রচণ্ড

আঘাত হেনেছিল। ওদিকে পাঞ্জাবে ভাষাভিত্তিক প্রদেশের দাবী অনেকখানি ক্রুর পন্থার দিকে এগোচ্ছিল। ইন্দিরার নেতৃত্বেই মহারাষ্ট্র ও গুজরাট পৃথক প্রদেশে পরিণত হল। এই বাস্তব রাজনৈতিক জ্ঞান বহু প্রবীন কংগ্রেস নেতা দেখাতে পারেননি। কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে কেরল কংগ্রেসের হাতে ফিরিয়ে আনার কৃতিত্বও তাঁর। নেহরু মনস্থির করতে পারছিলেন না। ইন্দিরা তাই স্বর্গতঃ প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্র প্রসাদকে হস্তক্ষেপ করতে বলেন। যে কোয়ালিশান, কম্যুনিষ্টদের পরাজিত করে, তা তাঁরই সৃষ্টি।

নেহরুর পর প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, এ প্রশ্ন তৎকালীন রাজনীতিবিদদের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছিল। সক্রিয় রাজনীতির পাদপীঠ পার্লামেণ্ট সদস্যদেরই নেতা বোঝাতো এবং অতি পরিচিত কংগ্রেস ম্যানদের নিয়েই সে জল্পনা কল্পনা। তাতে যে ক'টা নাম খুব পরিচিত এবং জওহর পরবর্ত্তী প্রধানমন্ত্রী হবার ন্যায্য দাবীদার, তাদের সবার শেষে ইন্দিরার নামকরণ। কেননা, স্বার্থান্বেষী কংগ্রেস ম্যানদের অনেকেই তাঁকে পছন্দ করতো না। নেহরুর কন্যা হিসেবে উনি হয়তো অনেক বেশী সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন, এ ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে কেউ কেউ তাঁকে ঈর্ষা করতেন, আর কেউ কেউ অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি ভেবে ইন্দিরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলেন। শুধু গবেষণা নয়, দল পাকানোর কাজও আরম্ভ হয়ে যায়। কংগ্রেসে প্রধাণতঃ দুটো উপদল ছিল। মোরারজী-পাতিল এর আমেরিকাপন্থী দল এবং কৃষ্ণমেননের কম্যুনিষ্টপন্থী দল। কৃষ্ণমেনন বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন জনসাধারণ তাঁকে চায় না। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সদলবলে জয়লাভের কোন সম্ভাবনা তার নেই। এই কারণে তিনি ইন্দিরাজীকে সামনে রেখে কৌশলে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। নেহরুর উত্তরাধিকার শুধু দেশে নয় বিদেশেও আলোচনার বিষয়। এসব আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে নেহরুর উত্তরাধিকারী হিসেবে আটজনের নাম

সংগ্রহ করা যায়। উল্লেখযোগ্য মোরারজী দেশাই, কৃষ্ণমেনন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরাগান্ধী, চ্যবন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, এস. কে. পাতিল, বি. এম. কাউল। এদের মধ্যে শেষ চারজনকে নম্বর না দিয়েই ছেটে দেওয়া যায়।

জয়প্রকাশজী অর্দ্ধমৃত এবং রাজনীতি থেকে ঘটা করে বিদায় নিয়েছিলেন। তা সত্বেও আগ বাড়িয়ে রাজনীতিতে মাথা গলাতেন এবং মাঝে মাঝে বিপরীত মন্তব্য করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতেন। চ্যবন, তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক সুখ্যাতি অর্জনে প্রায় ব্যর্থ, এস, কে, পাতিল মোরারজী দেশাইর লেজুর হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন, আর বি, এম, কাউলের সর্বভারতীয় কোন পরিচিতি ছিল না।

বাকী চারজনের মধ্যে কৃষ্ণমেননকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কল্পনা করা যায় না। কেননা জ্ঞান থাকলেই প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্যতা বর্তায় না। নেহরু বিহনে কৃষ্ণমেনন সূর্য্যহীন চন্দ্রের মতো। কৃষ্ণমেননের একটি দূরদৃষ্টি ছিল, তাহল ভারতের ভাবী কর্ণধারকে তিনি লণ্ডনে থাকতে চিনতে পেরেছিলেন। সে সুযোগে অখ্যাত কৃষ্ণমেনন নেহরুর ইমেজের সহায়তায় সর্বভারতীয় নেতার পর্য্যায়ে পড়েন। নইলে দেশের জন্যে বা কংগ্রেসের জন্যে তাঁর কোন দান নেই। চীন ভারত যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণতির কৃতিত্ব থাকার দরুণ আর এক নেহরুর সাহায্যের প্রত্যাশায় ব্যস্ত ছিলেন।

মোরারজী দেশাই-এর একটা ইমেজ কংগ্রেসে ছিল। নেহরুকে কোন দলের পক্ষে না ধরলে, মোরারজীর দলই মোটামুটি শক্ত খুঁটি। কংগ্রেস পলিশিকে প্রায় সময় মোড় নেওয়াবার জন্যে মোরারজী সক্রিয় ছিলেন। ইন্দিরার দ্বারা বিতাড়িত হবার পরও তিনি হাল ছাড়েন নি। বহুভাবে চেষ্টা করেছেন ইন্দিরাকে কক্ষচ্যুত করতে। এমন একটা মানুষকে জনসাধারণের জানা দরকার। কেননা, ব্যক্তিগত জীবনে

যিনি সন্ন্যাসী, রাজনৈতিক জীবনে তিনি সাধারণ মানুষের হত্যাকারী। তাঁর পরিচালিত অর্থনীতি দেশের চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছে। সেই মোরারজী বিদায়ের দু বছরের মধ্যে ভারত সম্পূর্ণতার দিকে এগুচ্ছে কি করে? একবার মোরারজীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে অনেকের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলাম। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর ঘৃণ্য উক্তি আজও ঘৃণার সঞ্চার করে। বলেছিলেন, "যাঁরা খেতে পায়না, তারা বেঁচে থাকে কেন?"

মোরারজী দেশাই ভোর পাঁচটার আগে ঘুম থেকে ওঠেন। তারপর বিছনায় যোগাভ্যাস করেন। তাকে দেখে কখনোই নেহরুর উত্তরাধিকারী মনে হয়না। বরং অঙ্কের মাষ্টারমশাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। খুব আস্তে কথা বলেন, যেন খুব শ্রান্ত।

মোরারজীকে অনেক সময় কংগ্রেস পার্টির সন্ন্যাসী, লৌহ মুখোসের অন্তরালের মানুষ, লোহার ডাঁটায় পদ্মফুল ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয় এবং ক্রমওয়েল ও স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তুলনাটা নিঃসন্দেহে ভুল। কেননা, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন এনে দেশকে নবজীবন দিয়েছেন, ইংলণ্ডের প্রধান সমস্যা বেকারী দূর করেছেন। মোরারজী দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাকে বাড়িয়ে হিমালয় প্রমাণ করেছেন এবং কলমের এক খোঁচায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা হঠাৎ কেড়ে নিয়ে পুরুষানুক্রমে উপার্জনশীল মানুষকে কেমন করে মৃত্যুর গহ্বরের দিকে ঠেলে দেওয়া যায় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কংগ্রেসের এই সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষের প্রতি যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার।

পাশ্চাত্য দেশেরা তাঁকে বলে রক্ষণশীল, কম্যুনিষ্টরা বলে প্রতিক্রিয়াশীল, তিনি নিজে বলেন তিনি গান্ধীবাদী। আসলে তিনি

কাহারও লোক নন, কাহারও মুখপাত্র নন, কোন আদর্শের প্রতিও তিনি অনুরক্ত নন। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাঁকে আপনজন মনে করে বটে তবে এটাও তারা জানে যে তাকে পকেটে রাখা যাবে না। কিন্তু বিড়লাদের ব্যাপার আলাদা। অবশ্য মোরারজী এমন ভাব দেখান যে তিনি বিড়লাদের ক্রীড়নক নন, কিন্তু বিড়লাদের ক্ষতি হয় এমন কাজ কখনও তিনি করেন নি। অন্যান্য শিল্পপতিদের প্রতি কখনো কঠোর হলেও বিড়লাদের সেই কঠোর ব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়ে রাখতেন।

এর পর মোরারজীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সর্ব ভারতীয় স্বীকৃতির প্রশ্ন আসেনা। অবশ্য কংগ্রেস সংসদের ওপর দলীয় প্রভাবের দ্বারা প্রধান মন্ত্রী হওয়া যায়, তবে তাতে জনসাধারণের স্বীকৃতি থাকে না, আর থাকে না সর্বভারতীয় উন্নতির প্রশ্ন। যদিও তৎকালীন অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের আগের কংগ্রেসের জাঁদরেল নেতাদের মধ্যে দেশের উন্নতি জাতীয় কথাগুলো, 'ইলেকশন' নেতার বামপন্থী স্লোগান এর মতো, তবুও জনসাধারণের অসীম সৌভাগ্যের দরুণ সেদিন অর্থাৎ জওহর-লালজীর মৃত্যুর পর মোরারজী প্রধান মন্ত্রী হননি। পরিবর্তে সেদিন নেতাহীন সংকটের মধ্যে, ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে অব্যবস্থার মধ্যে, যিনি কর্ণধার হলেন, সেই স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অতি চাটুকার যেমন কেউ ছিল না, অতি বিরুদ্ধবাদীও কেউ ছিল না। হয়তো রাঘববোয়াল কংগ্রেস ম্যানরা সেদিন ভেবেছিলেন, প্রধান মন্ত্রীর কাজের বিঘ্ন সৃষ্টি হলে বা দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন আনতে না পারলে তিনি পদত্যাগ করবেন। কেননা তার বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করে থাকেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী সৎ এবং আদর্শবাদী। রেলমন্ত্রী থাকা কালীন শাস্ত্রীজী রেল দুর্ঘটনার সমস্ত দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে পদ-ত্যাগ করেছিলেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর পদে সম্ভবতঃ প্রতিমুহূর্তে

ও রকম রেল দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। কাজেই দু'দিন পরই এই ছোট, সং এবং ভালোমানুষটা পদত্যাগ করবে। তারপর তারা (?) দখল করবে তখৎ-এ-তাউস।

সম্ভবতঃ সব চাইতে সম্ভাবনাময় তবু প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্যাকাশে শনি বক্রি ছিল। নইলে, ওই দুর্বল ছোট্ট মানুষটি ইস্পাতের মতো ধারালো এবং শক্ত হয়ে রইলেন কি করে! ভারতবাসীর জাতীয়তা-বোধ যখন টুকরো টুকরো হয়ে যাবার মুখে, বিদেশী অর্থনীতির হাতে পরোক্ষভাবে আমরা মেরুদণ্ডহীন পরাধীন হতে চলেছিলাম, সে সময় ছোট্টমানুষটি হিমালয়ের মতো শরীর নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, আমরা এখনও স্বাধীন, এখনোও শক্তিশালী। তাঁর দেড় বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বে ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে এমন কিছু পরিবর্তনের সূচনা করতে পারেন নি এটা সত্য কথা। কিন্তু তিনি আমাদের মেরুদণ্ডকে সোজা এবং শক্ত করে দিয়েছিলেন। একথা অনস্বীকার্য্য যে সেই শক্ত মেরুদণ্ডকে আজকের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে সামগ্রিক উন্নতির পথে সহকারী হিসাবে পাচ্ছেন।

স্বাধীনতা পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসে লালবাহাদুর শাস্ত্রী অতি অবশ্যম্ভাবী এক নাম, বিরুদ্ধবাদীরাও সশ্রদ্ধ ভাবে স্মরণ করবেন। বিদেশী সাংবাদিক হাঙ্গেন লালবাহাদুর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, সে বক্তব্যকে আমি সামনে রাখছি। কেননা, দেশজ লোকের কথাকে আমরা সহজে মূল্য দিতে চাই না। তাছাড়া, যারা ভারত এবং তার মানুষদের স্বভাবতঃ ছোট করে দেখার অভিলাষী ; সাপ, জঙ্গল, সাধু অ্যধুষিত অঞ্চলেও যে একজন সত্যিকার মানুষ আছে—এ স্বীকৃতি গ্রহণ যোগ্য এবং অনুধাবণযোগ্য।

আমরা জানি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সেরূপ ক্ষমতার সুযোগে কৃষ্ণমেনন কীভাবে দেশটাকে বিকিয়ে দেবার তালে ছিলেন। তাছাড়া নিজের আখের

ঘুছোবার এতবড় সুযোগ আর কি আছে! গ্রাম্য প্রবচনে আছে, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হলে বাড়ী করতে পারে, এম, এল, এ হলে বাড়ী এবং গাড়ী, আর মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলে রাজ্য এবং রাজকন্যা। এ ধারণা এবং এ ধারনার বশবর্ত্তী ক্রিয়া কলাপের দরুণ, দেশটা একেবারে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌছে গিয়েছিল। গণতন্ত্রের নরম স্বভাবের দরুণ নেতৃস্থানীয় সবাই একএকটা খুদে বিড়লা টাটা হবার স্বপ্নে বিভোর ছিল।

সুতরাং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে লালবাবাহুর শাস্ত্রী প্রভৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। নেহরু এবং মোরারজী দুজনে একবার বিদেশে ছিলেন তখন ভারত সরকার তিনিই চালিয়েছেন। লালবাহাদুরের বিশেষত্ব ভদ্র ব্যবহার এবং কর্ম্মে দৃঢ়তা। এ দুটি গুণ বিদেশীদেরও দৃষ্টি এড়ায় নি। হাঙ্গেন বলেছেন, প্রথম যখন এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, আমি বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবতে লাগলাম এ কার কাছে এসেছি। ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী না স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অফিসের এক চাপরাসী। তাঁর বেশভূষা, কথাবার্ত্তায় চালচলনে এমন একটি নম্রভাব রয়েছে যার ফলে তাঁকে বড়জোর অফিসের একটি নিম্নস্তরের কেরাণী মনে হতে পারে। তিনি বলেছেন যে, ভারতে সরকারী উচ্চপদাধিকারী বহু লোকের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন, তার মধ্যে লালবাহাদুর একমাত্র লোক যিনি প্রকৃত বিনয়ী। হাঙ্গেন বলেছেন—একমাত্র এই মানুষটিকেই দেখেছি টেলিফোন অপারেটরকে 'প্লিজ' বলেন এবং কোন পত্র বাহক চিঠি দিয়ে গেলে তাকে 'ধন্যবাদ' দেন। এই একটি মাত্র মন্ত্রী দেখছি যিনি কোন জনসভায় গেলে মঞ্চে উঠেন না নিচে বসেন। দিল্লীর বাইরে গেলে তিনি ভি, আই পি'র সুযোগ নিতে চান না, সরকারী বড় বাড়ীর পরিবর্ত্তে ছোটবাড়ী পছন্দ করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হবার পরও এলাহাবাদে গেলে সরকারী বাড়ীতে না উঠে নিজেদের ভাড়া বাড়ীতে থাকতেন।

ভাড়া বাড়ীর বাড়ীওয়ালা তাদের পরিবারকে ঐ বাড়ী থেকে তুলে দেয়। তখনও তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নিজেরা অন্য কোন বাড়ী সংগ্রহ করতে পারলেন না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর তখন তাঁদের একটা বাড়ী খুঁজে দেবার জন্যে প্রকাশ্যে আবেদন জানালেন। অনেকেই সেদিন বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, একি কথা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে যে কোন বাড়ী রিকুইজিশন করতে পারেন, অথচ তিনি বাড়ী খুঁজতে লোকের সাহায্য চাইছেন! সেদিন লোক তাঁহাকে উদ্বাস্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে ঠাট্টা করেছিলো।

এ ব্যাপারটার উল্লেখের দরুণ তাঁর দুর্বল চিত্ততার প্রমাণ হয়না, বরং ক্ষমতাশীল ব্যক্তির সততার বা ক্ষমতার অপব্যবহার না করার দৃষ্টান্ত বলা চলে। শাস্ত্রীজীর এ সব দৃষ্টান্ত যখনকার তখন ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে অতি ক্ষমতা প্রয়োগ চলছিল। ক্ষমতার মদমত্ততায় শাসন যন্ত্র শোষণ যন্ত্রের রূপ নিয়েছিল। হয়তো শাস্ত্রাজী সেই শোষণ যন্ত্রের পরিবর্ত্তন আনতে পারবেন বলে, "আপনি আচরি ধর্ম পারেরে শিখায়" গোছের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

এ সব শুধু অন্যকে শিক্ষা দেবার জন্য নয়, এ সব তাঁর চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শাস্ত্রীজীকে দেখলে বোঝা যায় ভারতীয় আদর্শ কাকে বলে।

হাঙ্গেন তাঁকে unusual Indian Minister বলে অভিহিত করেছেন। এই একটি মাত্র মন্ত্রী কোন কর্মচারী অভুক্ত থাকলে তাকে ডেকে নিজের খাবার থেকে ভাগ দিতেন। কেউ গোপন কথা বলতে এলে, উঠে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনের সময় দেখলেন ভোটার তালিকায় তাঁর মায়ের নাম নেই। অন্য মন্ত্রীরা হলে কি করতেন একথা সবাই জানেন, কিন্তু লালবাহাদুর কিছুই করলেন না।

ভারতের শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা খুব প্রখর।

বিশেষতঃ বিদেশী শিক্ষায় যারা উচ্চ শিক্ষিত। লালবাহাদুরের মধ্যে superiority বা inferiority কোন কম্‌প্লেকসই নেই। তিনি সত্যি-কার বিনয়ী এবং ভদ্র। ভারতীয় শিক্ষা এবং সংস্কার সত্যিকার মানুষ হবার সুযোগ দেয়। বর্ত্তমান ভারতের দুরবস্থার পেছনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার একটা বিরাট ভূমিকা আছে। বঙ্কিমের কথায় বলা যায় ভারতীয় শিক্ষা যখন পূর্ণতা দিতে পারবেনা তখন বাকীটুকু পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে পূর্ণ করে নেওয়া দরকার। তার মানে এই নয় যে, নিজেদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করে বিদেশী শিক্ষার অগভীর জলের মৎস্য হওয়া। যে দেশের সর্ব প্রধান জ্ঞান ভাণ্ডার বেদের প্রথম শ্লোকে আছে—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম······"

"সবাই একসঙ্গে চল সবাই একই ভাবধারা প্রকাশ কর। তোমাদের সকলের মনকে নিয়ে এক বিরাট মন সৃষ্টি কর।···"

সমগ্র মানব কল্যাণের জন্যে যাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, তাদের আমদানি কৃত শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। এমন কি সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র কোন ব্যাপারেই আমদানির প্রয়োজন নেই। আমদানিকৃত সম্পদের ওপর নির্ভর করে কোন স্বাধীন দেশ যেমন বাঁচতে পারে না, তেমনি নিজের অতীত এবং ভালো সবকিছুকে বর্জন করে জাতি অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ কামনা করবে এমন জাতির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। শাস্ত্রীজী সেই ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁর আচরণেই তা প্রকাশ হতো।

সোশ্যালিজম সম্বন্ধে লালবাহাদুর বলেন—আমি উহা চাই এই জন্যে যে, উহাতে ধনী এবং দারিদ্রের আর্থিক বৈষম্য কমিয়ে আনবে। লাল-বাহাদুর নেহরুকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁকেই সকল

প্রকারে মেনে চলতেন। ঘটনাটাও দুর্লভ। নেহরুর স্বাধীনতা পরবর্ত্তী রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন দুর্লভ সংগ্রহ একটিও ছিল না। পিতার আদর্শ এবং কর্ম পদ্ধতির ওপর পূর্ণ আস্তাশীলা হওয়া সত্বেও শ্রীমতী গান্ধী তাঁর পিতার প্রতিটি কাজ এবং ব্যবস্থাপনাকে যুক্তিহীন ভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। আর অন্যরা, যাঁরা নেহরুর ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ লালবাহাদুরের মতো নির্ভেজাল নীরব সহকারী হতে পারেন নি। শাস্ত্রীজীর শিক্ষা এবং সংস্কার এক দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একবার যাকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছেন, তাঁকেই মেনে চলেছেন। এজন্যে অনেকে বলে থাকেন তাঁর নিজস্ব বিদ্যা বলে কিছু নেই, নেহরুর বিদ্যাই তাঁর বিদ্যা।

আমরা জানি এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। নেহরুর অভিজ্ঞতার থেকে শিক্ষা নেওয়ার মধ্যে হীনমন্যতার কিছু নেই। আজকের বিশ্বের অনেক বিশিষ্ট ব্যাক্তিই যেখানে শিক্ষা গ্রহণ করছেন, সেখানে লালবাহাদুরের বেলায় লজ্জার কিছু নেই। তবুও বলবো নেহরুর বিদ্যাই লাল-বাহাদুরের বিদ্যা, নেহরুর শিক্ষাই শাস্ত্রীজীর শিক্ষা—একথা সর্বৈব সত্য নয়।

দৃঢ়তা এবং স্বকীয়তা তাঁর চরিত্রে কখনো অভাব হয়নি। পার্লামেণ্টে বহু বক্তৃতায় তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। নেহরুর নেতৃত্ব মুখে মেনে নিয়ে, প্রকাশ্যে বা গোপনে তাঁর নিন্দা করা লালবাহাদুরের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। যে দেশে আনুগত্য ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য, সেই দেশে লালবাহাদুর একটি আনুগত্য ধরে থাকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শাস্ত্রীজীর নিজস্ব ইচ্ছা আছে এবং তার চেয়েও যা অস্বাভাবিক, তাঁর বিবেক আছে। হাঙ্গেন বলেছেন, He is an example of constancy in a country where allegiance is too often negotiable. Sastri has a will of his own and

what is more unusual, a conscience. যথা সময় এ দুটোই তিনি প্রয়োগ করতে পারেন। যাঁহারা তাঁর নম্রতাকে দুর্বলতা ভেবেছেন তাঁরাই হতচকিত হয়েছেন তাঁর গর্জনে। নেহরুর পরে কে, এই প্রশ্নে বলা যায় লালবাহাদুর নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা পরিচালনের সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি।

তাই আজ লালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্বপ্ন কালীন কর্মকাণ্ডকে সামনে রেখে পথ চলার জন্যে তাঁর জীবনের কিয়ৎ অংশের আলোচনা দরকার। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহরলালকে চেনার জন্যে অন্ততঃ সঠিক বিশ্লেষণের জন্যে লালবাহাদুর এবং শ্রীমতী গান্ধীকে একান্তভাবে জানা প্রয়োজন। অল্প ক'মাসের প্রধান মন্ত্রীত্বে তালগোল পাকানো কংগ্রেস নেতৃত্ব, মহান নেতা জওহরলালের তিরোভাবের জন্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং সর্বোপরি ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ এসব কিছুর জন্যে লালবাহাদুর অর্থনীতিতে তেমন পরিবর্ত্তন আনতে পারেন নি একথা সত্য। তবু, রাজনীতির ক্ষেত্রে তার সৎ চরিত্রের উপস্থাপনা কতখানি সম্ভাবনা ছিল তারই অনুসন্ধান প্রয়োজন। ভারতের সামগ্রিক উন্নতির জন্য, সার্বিক চরিত্র গঠনের জন্যে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

লালবাহাদুরের জন্ম কাশীতে, জন্ম তারিখ ২রা অক্টোবর ১৯০৪ সাল। তাঁহাদের পরিবারিক পদবী শ্রীবাস্তব। কংগ্রেস আন্দোলনে বহুবার তিনি কারাবরণ করেছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর হাতে-খড়ি গোবিন্দ বল্লভ পন্থের কছে। কর্ম্মকুশলতা ; কর্মনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততার জন্যে পন্থ তাঁর ওপর খুব নির্ভর করতেন। ১৯৫১ সালে নেহরু কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হয়ে তাঁকে সেক্রেটারী জেনারেল করে দিল্লী নিয়ে গেলেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচন লালবাহাদুরই চলিয়েছিলেন। প্রথম

মন্ত্রীসভায় তিনি রেলমন্ত্রী হলেন। ১৯৫৬ সালে আরিয়ালুরে এক রেল দুর্ঘটনায় ১৪৪ জন যাত্রী নিহত হয়। উহার সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে তিনি পদত্যাগ করেন। সব মন্ত্রীরা, যদি এমন হতো, তবে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরার কাজ অনেক সহজ হতো। বরং ভারতের মন্ত্রীরা অযোগ্যতার বোঝা মাথায় নিয়েও মেরিসিপাট্টা হয়ে গদীতে বসে থাকেন।

১৯৫৮ সালের মার্চে তিনি পরিবহন ও সংযোগ দপ্তর নিলেন। জীবনবীমা কেলেঙ্কারীতে অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী পদত্যাগে বাধ্য হলে দপ্তর পুনর্ব্বন্টন হয় এবং লালবাহাদুর শিল্প এবং বাণিজ্য মন্ত্রী হন। ১৯৫৬ সালে ফেব্রুয়ারীতে পন্থ অসুস্থ হয়ে পড়লে লালবাহাদুর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজ দেখতে থাকেন এবং পন্থের মৃত্যুর পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে বহাল হন।

পন্থ এবং লালবাহাদুরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে লোকসভায় প্রবেশের সুন্দর বিবরণ বিদেশী সাংবাদিক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—পন্থ যখন হলে ঢুকতেন, মনে হতো যেন সম্রাট আকবর রাজকীয় চালে এসে ঢুকছেন, আর শাস্ত্রী কখন এসে নীরবে ট্রেজারী বেঞ্চিতে প্রথম সারিতে বসতেন, তা দেখাই যেত না। কিন্তু শাস্ত্রীজীকে দেখলে মনে হতো যে বিপুল গুরু দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়েছে এবং তাতে তিনি মোটেই ভীত নয়।

লালবাহাদুর ঘুম থেকে উঠতেন সাড়ে পাঁচটায়। আগে অর্থাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হবার আগে নিয়মিত যোগাভ্যাস করতেন। তাঁর সেক্রেটারি বলেন, তিনি যে ভাবে কাজ করেন তাতে মনে হয় তিনি অমর। শাস্ত্রীজী ঘুম থেকে ওঠার অনেক আগেই দর্শনাথার সমাবেশ ঘটতো তাঁর বাড়াতে। বৈঠকখানায় সবার জায়গা হতো না বলে, বাগান এবং অন্যান্য জায়গায় লোকজন ছাড়িয়ে থাকতো। পাগড়ীধারী শিখ থেকে অর্দ্ধনগ্ন সাধু পর্য্যন্ত সব ধরণের লোক আসতো। তাঁর

বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সবাইকে আলাদা ডেকে কথা বলতেন এবং প্রত্যেকটা লোক ঘরে ঢুকলে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করতেন। অন্য মন্ত্রীদের মতো সোফায় শুয়ে কথা বলতেন না বা দর্শনার্থীদের কাউকেও পদচুম্বন করতে দিতেন না, যেটা অনেক মন্ত্রীই করতেন।

কংগ্রেস পার্টিতে তাঁর স্থান ছিল খুব উঁচুতে। তৃতীয় নির্বাচনে প্রার্থী তালিকার চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন তিনজন—নেহরু, ইন্দিরাগান্ধী এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রী। এই সময় কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিলেন সঞ্জীব রেড্ডী। প্রার্থীর নাম চড়ান্ত ভাবে স্থির করবার সময় নেহরু কেবল মাত্র ইন্দিরা এবং লালবাহাদুরের সঙ্গে পরামর্শ করেন, কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচন কমিটি অন্য আটজন সভ্য এবং কংগ্রেস সভাপতিও প্রায় সময় উপেক্ষিত হয়েছিলেন। লালবাহাদুর প্রতিদিন এত লোকের কথা শোনেন যে, জনসাধারণের মনের গতি তাঁর খুব ভালো জানা থাকতো।

পার্টি পরিচালন ব্যাপারে শাস্ত্রীজীর জ্ঞান যত প্রখর, স্যোসালিজম বা অর্থনীতির ব্যাপারে ততটা নয়। অর্থনীতি সম্বন্ধে তিনি বলেন—"আমাদের ধনসম্পদ ন্যায্য ভাবে বণ্টন করা উচিত। সম্পদ বিকেন্দ্রীকৃত হওয়া চাই, অবশ্য এতে একথা বোঝায় না যে প্রত্যেকের একই বেতন হবে বা প্রত্যেকে একই আকারের বাড়ী পাবে। প্রত্যেকে পর্য্যাপ্ত বস্ত্র পাবে এবং পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে, এটাই হওয়া উচিত।" শাস্ত্রীজীর সঙ্গে ইন্দিরাজীর পার্থক্য এখান থেকেই। নেহরুর মতো লালবাহাদুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার বিরোধী নন, আবার দেশাই বা পাতিলের মতো বৃহৎ ধনীদের প্রতি অনুরাগও তাঁর নেই। অল্পে তৃপ্ত ভারতীয় আদর্শের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা চলে।

বৃহৎ শিল্পের প্রতি নেহরুর মতো সোভিয়েত ষ্টাইল মনোভাব শাস্ত্রীজীর নেই। তিনি হেসে বলেন—বৃহৎ কারখানা দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হইনা। অর্থনৈতিক পলিশি নির্দ্ধারণে তিনি

কখনো মাথা ঘামাননি। কম্যুনিজমের প্রতি তাঁর সহানুভূতি নেই। সেপ্টেম্বর মাসে নেফায় যখন চীনা উপদ্রব সুরু হয় তখন শাস্ত্রীজী সোজা ভাষায় বলেছিলেন—ওদের বিতাড়িত করতেই হবে, এছাড়া গত্যন্তর নেই।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে তিনি বিনা বিচারে আটক আইন প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু কখনোই তা নিষ্ঠুরতার পর্য্যায়ে পৌঁছায়নি। সহৃদয়তার সঙ্গে শাসন কার্য্য পরিচালনা করতে হয় এটা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এবং এটা তাঁর সকল কাজের মাধ্যমেই ফুটে উঠতো। একজন সিনিয়র আই, সি, এস, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার পর বলেছিলেন—"সব বিষয়ে শাস্ত্রী যে সুস্পষ্ট ধারণা আছে তা বলা যায় না, but he has strong moornings. নৃশংস মনোভাব থেকে তিনি এতখানি মুক্ত এবং সকল প্রকার নিষ্ঠুরতার এমন বিরোধী মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। তিনি ইনটেলেকচুয়াল নন কিন্তু বুদ্ধিমান। ভারতের সুরুচিসম্পন্ন সাধারণ লোকদের মতো অনুভূতি এবং চিন্তা-শক্তি তাঁর আছে। গ্রামের অতি সাধারণ মানুষটিরও মনের ভাব তিনি স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারেন।" তাঁর একজন সহকর্মী বলে থাকেন—"সঙ্কটকালেই শাস্ত্রীর প্রকৃত বুদ্ধির পরিচয় মেলে।"

১৯৫৬ সালে ইনষ্টিটিউট অফ্ পাব্লিক্ ওপিনিয়ন নেহরুর পর প্রধানমন্ত্রী কে হতে পারেন, সে বিষয়ে অভিমত সংগ্রহ করেছিলেন। ওতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, দ্বিতীয় মোরারজি দেশাই, তৃতীয় কৃষ্ণমেনন এবং চতুর্থ লালবাহাদুর শাস্ত্রী চ্যবন এবং পাতিলের স্থান তারও পরে।

ব্যক্তিগত আলোচনায় হঙ্গেনের কাছে লালবাহাদুর বলেছিলেন যে, মোরারজীর সঙ্গে তিনি প্রধান মন্ত্রীত্ব নিয়ে প্রতিযোগীতা করবেন না, ইন্দিরার সঙ্গেও না হয়তো তার প্রয়োজনও হবে না। শাস্ত্রীর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীও প্রতিযোগিতায় মানবেন না। কেননা, ইন্দিরা

লালবাহাদুরকে সঠিক ভাবে চিনতেন। মোরারজী যে ভাবে নিজেই নিজেকে জনসাধারণের বিরাগ ভাজন করে তুলেছিলেন, তাতে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবার সম্ভবনা কমে এসেছি। কেবলমাত্র কংগ্রেস অফিসে দল পাকিয়ে প্রধানমন্ত্রী হবার সম্ভাবনা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণমেনন ইন্দিরাকে পক্ষে টানার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত সে প্রচেষ্টা স্তিমিত ছিল না। কিন্তু সে চেষ্টায় তিনি সফল হাতে পারেন নি কারণ, কৃষ্ণমেননের কূটদৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও ইন্দিরা গান্ধীকে তিনি কখনোই সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি।

প্রধানমন্ত্রীত্বের পূর্ণ যোগ্যতাই লালবাহাদুরের ছিল, কিন্তু তাঁর সারল্য এবং ভদ্র মন ভারতবর্ষের মতো সঙ্কটপূর্ণ দেশ, ততোধিক সঙ্কটপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অর্থ নৈতিক চরম অব্যবস্থার মধ্যে খাপ খায় না। যে জন্যে জওহরলালের মতো জ্ঞানবান এবং হৃদয়বান প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ভারতের হাল সঠিকভাবে ধরতে পারেননি। লাল-বাহাদুর পলিটিসিয়ান তবে ডিপ্লোম্যাট নন। অন্তর্ঘাতী শত্রু এবং বহিশত্রু উভয়কে রুখতে হবে, একাধারে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাই লালবাহাদুর কোন পরির্ত্তন আনতে পারেন নি, না কংগ্রেস পার্টিতে, না অর্থনীতিতে। যা ছিল তাই চলছিল। তাঁর শাসন কালীন প্রধানমন্ত্রীত্বে একটি কাজ তিনি করে গিয়েছিলেন, তাহলো ভারতের জাতীয় চরিত্রের পুনরুজ্জীবন। আমরা যে তার পরাধীন নই মার খেলে যে পালটা মার দিতে জানি—এ বিশ্বাসটুকুর প্রতিষ্ঠাতা নিঃসন্দেহে লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরে পাকিস্তানের সঙ্গে অপরিশোধিত যুদ্ধের পর ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত আর কোন যুদ্ধের চিন্তা আসেনি। সমগ্র বিশ্বে আমরা নিরপেক্ষতার বাণী নিয়ে ঘুরেছি। ভেবেছি, আমাদের মতো পৃথিবীর সব রাজনীতিবিদরাই সৎ। ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী অন্যকে বিশ্বাস করার কথা যেমন আছে, তেমনি

কৃষ্ণের কূটকৌশল এবং পরবর্ত্তী কালে কৌটিল্যও আছে। অথচ বন্ধুত্ব-পূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শের প্রতি এতই বিশ্বাস ভাজন হয়ে পড়েছিলাম যে, কূটনীতির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। দীর্ঘ পরাধীনতার জন্যে এমনিতেই আমাদের মেরুদণ্ড ভগ্ন, তার ওপর বিদেশী শিক্ষা বাকী শক্তিটুকুও হরণ করে নিয়েছে। তারই আলোকে স্বাধীনতা কী জিনিষ সামগ্রিক ভাবে মানুষ তা উপলব্ধি করেনি এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যে যুদ্ধের প্রয়োজন এটাও তখন অনুধাবণ করা যায়নি। শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই এটা ছিল না, এটা সরকারের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। ১৯৫৭ সাল থেকেই আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ফল ফলতে সুরু করলো। ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসরায়েলকে আমরা স্বীকার করতে পারলাম না, অথচ ধর্মীয় ভিত্তিতে পাকিস্তান আমরা মেনে নিয়েছি। হাঙ্গেরিকে বাফার ষ্টেট হিসেবে রাখার জন্যে রাশিয়ার হাঙ্গেরি আক্রমন মেনে নিয়েছি, কিন্তু তিব্বতকে বাফার ষ্টেট হিসাবে রাখার কথা ভাবিনি। এমনি আরো বহু উদাহরণ আছে যা ধর্মীয় গোঁড়ামীর মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ১৯৫৬ সালে পৃথিবীর বৃহত্তম সমাজতান্ত্রিক দেশ ভারতকে আক্রমন করলো। আমরা নিরপেক্ষ দেশ, কেউ আমাদের আক্রমণ করতে পারে না এ বিশ্বাস ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কথা স্মরণে রাখলে পোলাণ্ডের নিরপেক্ষতার ফল আমরা জানতে পারতাম, জানতে পারতাম নিরপেক্ষ আমেরিকাকে কেন রুজভেলট যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিলেন।

১৯৫৬ সালের চীন ভারত যুদ্ধে আমাদের প্রচণ্ড হার এক বিরাট শিক্ষার কারণ হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে শাস্ত্রাজী ভারত পাকিস্থান যুদ্ধে সঠিক পথ বেছে নেবার জন্যে আমরা জিতেছিলাম। এবং তারই জন্যে আমাদের স্বাধীনতা মানসিকতা অনেক বেড়ে যায়, আমরা আবার মেরুদণ্ড ফিরে পাই। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৫৭ সালের পাকিস্তানের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ পরিকল্পনাকে ভারত চোদ্দ দিনে

স্তব্ধ করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লালবাহাদুর শাস্ত্রীই আমাদের প্রথম উপলব্ধি করলো যে আমরা স্বাধীন, প্রয়োজন হলে সর্বস্ব পণ করে আমরা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি।

"We need peace for our progress. We want peace at home and abroad. We stand for world peace. Tensions are not abnormal They crop up even in families, between brothers and sisters. We have always stood for a peaceful and friendly solution of all tensions. That has always been our endeavour and it continues to be so even to day. But if there is invasion on our border, we will meet such armed agression with armed might."

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আবেগময় উক্তি। যা কথা তাই কাজ। ভারতের কোন নেতৃস্থানীয় কারও এমন স্থির প্রতিজ্ঞ উক্তি নেই। উক্তি অনেকেরই আছে, যা শব্দভাণ্ডার পূর্ণ করেছে কিন্তু উক্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক উক্তি এমন হওয়া চাই যার বাস্তবতা থাকবে।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে শাস্ত্রীজী আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু ' সালের শেষ পাদে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আমরা বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের অতি অবশ্যম্ভাবী প্রধান চরিত্রের ভূমিকা পেয়েছি। এ কৃতিত্ব ইন্দিরা গান্ধীর, এ কৃতিত্ব তাঁর সমর্থনকারী ভারতবর্ষের জনসাধারণ। মন্ত্রী পরিষদ একযোগে ইন্দিরা সহযোগীর ভূমিকায় থাকার দরুণ কী প্রধানমন্ত্রী, কী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই বিশ্বের দাবা খেলায় অগ্রবর্ত্তী চালে এগিয়ে ছিল। এ জয় শুধু যুদ্ধ জয় নয়, এজয় শুধু রাজনৈতিক জয় নয়, এ জয় শুধু বৃহৎ মার্কিনী কূটচক্রকে ব্যর্থ করে দেবার জয় নয়, এ জয় ভারতীয় আদর্শের। ইন্দিরাজী আজ তারই পুরোহিত।

প্রধানমন্ত্রীর জীবনীকাররা কিসের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে

এগোবেন জানিনা, তবে দৈনন্দিন ঘটনা পঞ্জীর ওপর নির্ভর না করে, ইন্দিরার অন্তর জগতের বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

শান্তি চাই আমাদের উন্নতির জন্যে, শান্তি চাই ঘরে এবং বাইরে। আমরা বিশ্ব শান্তির জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।—জওহরলালের উক্তির সঙ্গে এর সাযুজ্য আছে। ইন্দিরার অনেক কিছুর ওপর তাঁর পিতার প্রভাব আছে। বিশেষ বক্তৃতা মঞ্চে তাঁর আবির্ভাব।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ব শান্তির প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছেন। যতখানি সচেষ্ট ছিলেন, পৃথিবীর কোন মহৎ ব্যক্তিই অতখানি প্রচেষ্টা চালান নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবারও কোন যুদ্ধে পৃথিবী জড়িয়ে না পড়ে, তার জন্যে নেহরুজীর শান্তি প্রচেষ্টা বিশ্ব ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমন কি বিশ্ব শান্তির জন্যে কখনো কখনো নিজের দেশের কথাও ভুলে যেতেন। সমস্ত বিশ্বশক্তিগুলো, বিশ্বের ছোটখাটো দেশের উন্নতির জন্যে যুদ্ধ চিন্তা বন্ধ রাখবে এমন কথাটা প্রায় অসম্ভব। তবুও জওহরলাল স্বপ্ন দেখতেন, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একই সঙ্গে উন্নতিকামী প্রত্যেকে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ, যুদ্ধ সমস্ত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন আজও সফল হয়নি।

কেন হয় নি? প্রথমতঃ সব রাষ্ট্রনায়করা জওহরলাল নেহরু নয় বলে। অর্থাৎ নেহরু চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হলেও সে চিন্তাকে অন্তরের সঙ্গে মিশিয়ে কাজে নামেন নি। এই সুযোগে নিজেদের যুদ্ধশক্তি বাড়িয়ে চড়িয়ে চলেছে। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষ এবং বিশ্বের রাজনৈতিক, মানুষদের মনের পরিবর্ত্তন আনা সম্ভব নয় বলে। সেই জওহরলাল নেহরু বিশ্বের প্রয়োজনে বিশ্ব শান্তি চেয়ে চেয়ে বিদায় নিলেন, যাবার সময় দেখে গেলেন বিশ্বশান্তি সহযোগী হোতা মহান চীন ভারত আক্রমন করে বসলো। পঞ্চশীলের পাদপীঠে চৈনিক বহি-বিষয়ক চিন্তা যখন পাঠ নিচ্ছে, অভ্যন্তরীণ চিন্তা নায়করা তখন গোপনে ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভারত আক্রমণ হলো, সম্পূর্ণ

রকম যুদ্ধ প্রস্তুতি না থাকার দরুণ ভারত পরাজিত হলো। পাশব শক্তিকে প্রতিরোধ ক্ষমতা না জন্মালে শান্তির কথা বেমানান। দুর্বল সব সময় শান্তি চায়, কিন্তু সবলের শান্তি চাওয়া প্রকৃত শান্তির ওপর আস্তা থাকা।

বিশ্ব শান্তির কথা বলে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পিতার প্রতিধ্বনি করছেন এমন মনে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাঁর বাচন ভঙ্গিতে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের ধ্বনি আছে যা মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তাঁর 'But if there is invasion on our border, we will meet such armed aggression with armed might কথাটা শরীরে শিহরণ এনে দেয়। জওহরলাল বিশ্বাস করতেন না বন্ধু দেশ ভারত আক্রমণ করতে পারে, ইন্দিরা বোঝেন রাজনীতিতে আর যাই থাক বন্ধুত্ব নেই।

হয়তো জওহরলালজী ভেবেছিলেন, পার্শ্ব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপুর্ণ ব্যবস্থা থাকলে, যুদ্ধ প্রস্তুতির বিপুল ব্যায় বহন করতে হবে না। বরং সে টাকায়, ভারতের অর্থনীতিতে সুদৃঢ় করে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে চীন এবং পাকিস্তান; নেপাল, কলম্বো বর্‌মা ইত্যাদি দেশের অনেক আবদার তিনি মিটিয়েছেন। অথচ চীনের সঙ্গে ভারত যখন মুখোমুখী সংগ্রামে রত, তখন এসব রাষ্ট্রগুলো অন্দরমহলে গভীর ঘুমে নিমগ্ন। আজ বিশ্বের দরবারে বন্ধুহীন ভারত, নিজের দৃঢ়তায়, স্বীয় শক্তির পরিচয়ে প্রতিভাত। এবং সেই শক্তি এবং তার নেতৃত্বকে বিশ্বের মহাশক্তিধররা অস্বস্তির সঙ্গে মেনে নিচ্ছে। পার্শ্ববর্ত্তী ছোট রাষ্ট্ররা সমীহ করে বন্ধুত্বের হাত প্রসার করছে। দুর্বল যারা তারা সবলের প্রচ্ছায়ায় থাকে। ১৯৫২ সালে ভারত চীনের থেকে যখন দুর্বল প্রমাণিত হলো, পার্শ্ববর্ত্তী ছোট রাষ্ট্রগুলো তখন চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৫৭ সালে ভারতের হাতে আগ্রাসী পাকিস্তানকে পেটানোটা অনেক দৈব দুর্ঘটনা ভেবেছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলা দেশের প্রয়োজনে যখন

যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো, তখন বিশ্বের ১০৪ টা স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে। সেই বিরাট এবং ব্যাপক বিশ্বশক্তিকে সামনে রেখে ভারত পাকিস্তানকে প্রচণ্ড আঘাত দিল এবং তাদের সম্বিত ফিরে আসার আগে স্বাধীন বাংলা দেশ বিদেশী কবল মুক্ত হলো। তখন বিশ্বের নায়করা ভাবতে লাগলেন, ভারতের এ জয় দৈব প্রভাবে জয় নয়। তাই আজ অনেক বিরুদ্ধ শক্তি ভারতের দিকে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করছে।

তাই পিতা জওহরলালের বিশ্ব শান্তির প্রচেষ্টা আর তাঁর কন্যা শ্রীমতী গান্ধীর শান্তি প্রচেষ্টা এক নয়। না আকারে, না প্রকারে।

আদর্শ, চিন্তা, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ—এ সব ইন্দিরা গান্ধী পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন। সবচেয়ে অবাক হবার মতো হলো মনোরঞ্জনকারী ক্ষমতা। এদিক বাদ দিয়ে, অন্তর্মুখীন ভাবধারায় স্বরূপরাণী এবং কমলা নেহরুর প্রভাবই ইন্দিরার মধ্যে প্রবল। প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, এই নারীদ্বয়ের প্রভাবই অত্যধিক। জওহরলালের প্রভাব, মা এবং ঠাকুরমার প্রভাবের সঙ্গে সাযুজ্য এনেছে, বিরোধ ঘটায়নি। তাই প্রথম জীবন থেকে জোয়ান অব আর্ক-এর ভূমিকায় পুনরাবির্ভাব হবে যে নারীর সে পারিপার্শিক সব কিছু থেকেই রসদ আহরণ করবে।

জওহরলালের সঙ্গে থেকে পৃথিবীর সমস্ত মনীষার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে, পৃথিবীর বৃহত্তর গণতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী কন্যা হবার দরুণ, রাজনীতির খেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত। সর্বোপরি রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক বোধ সৃষ্টি। এটা সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক গদীচক্রের সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে না পড়ার জন্যে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত গণভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবার প্রতি আন্তরিক অনীহা। গান্ধীজীর অনুরোধেও ইন্দিরা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হননি। ১৯৫৫-৫৬ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে

থাকা, ১৯৫৯-৬০ সালে কংগ্রেস সভাপতি, ১৯৫৭ সালে শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পর মহাদুঃসময়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়া ব্যাতিরেকে ইন্দিরাজী নিজের আগ্রহ বা ইচ্ছায় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। দেশের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসাই তাঁকে রাজনীতির মহাপ্রধানে টেনে এনেছে। যাঁরা আজ ইন্দিরাকে ক্ষমতালিপ্সু বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টা করছেন ও তাদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি—যাঁর পিতা বিশ্ব নেতৃত্বের আসরে একজন, যাঁর ঠাকুরদাদা জাতীয় কংগ্রেসে "গ্রাণ্ড মোগল" বলে পরিচিত যাঁর আশীর্ব্বাদক গান্ধীজী, যাঁর ওপর রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম স্নেহ তাঁর পক্ষে ব্যাপক ক্ষমতা আসার জন্যে খুব কী পরিশ্রমের প্রয়োজন? তবে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হতে এত দেরি হলো কেন? ইন্দিরাজী এ ক্ষমতা অর্জন করেছেন স্বীয় ক্ষমতায়। ভালো সার্টিফিকেটের বলে প্রধান মন্ত্রীর চাকরি পাবার ব্যাপার হলে সেটা অনেক আগেই সম্ভব হতো। ১৯৫৭ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে বিশ্লেষণ করলে, বুঝতে অনেক সহজ হবে।

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ সালে, শাস্ত্রীজীর মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতির নাটক যখন জমজমাট—তখন ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। উপদলে বিভক্ত এবং জাতীয় দল হিসেবে কংগ্রেস যখন রোগগ্রস্ত—সে সময় প্রভাবশালী বষিয়ান নেতা মোরারজী দেশাইকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে ইন্দিরাজী প্রধান মন্ত্রী হন। সেদিন ইন্দিরার পক্ষে ভোট পড়েছিল ৩৫৫ এবং মোরারজীর পক্ষে ১৬৯। ভোট যুদ্ধে জয়ী হয়ে যেমন তিনি খুব খুশী হননি, পরাজিত হলেও যেমন দুঃখিত হতেন বলা যায় না। তাঁর উক্তিতেই সেটা পরিস্ফুট। অনেকটা তাঁর পিতার ঢঙে জনসাধারণের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে বলেছিলেন, 'I thank those who voted for me and those who voted against me... Once elections are over it is only fit and proper that differences

should be forgotten and we should all work together.' এবং এ কথাও তিনি বলেছেন, I have always considered myself a 'desh sevika.' There is something in this country which enables its people. for all their illiteracy and backwardness, to rise to the occasion when face to face with great challenges.'

সে বছরই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রথম ভাষণে প্রথমেই স্বর্গতঃ প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের পরিকল্পনা রূপায়ণের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "We have promises to keep to our people—of work, food, clothing and shelter, health and education." এ সব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হবে। এবং ভবিষ্যতের ওপর দৃঢ় প্রত্যয় রেখে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যাকে এবং ব্যবস্থাপনার দ্বারা সমৃদ্ধির পথে এগোতে হবে। তাঁর ধারণা অনুযায়ী দেশের দুরবস্থার জন্যে দায়ী Policy-কে ক্ষীয়-মানতা নয়, Policy কে কার্য্যে পরিণত না করাটা।

তাঁর বক্তব্য : In economic development as in other fields of national activity...there is a disconcerting gap between inteution and action. To bridge this gap we should boldly adopt whatever for reaching changes in administration may be found necessary."

শুধু তাই নয় ১৯৫৭ সালের মধ্যে ভারত খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবে এরকম আশ্বাসও তিনি দিয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালের প্রধানমন্ত্রীর গদী আহরণ, নিছক ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা নয়, দেশকে উন্নত করার এক মহান প্রতিজ্ঞা তাতে ছিল।

১৯৪৭ সালে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় চরিত্র বিকাশে বাধা স্বরূপ ছিল। তাছাড়া বিভক্ত ভারত-অঙ্গহীন ভারতেরই ভাবমূর্তি। সেই পঙ্গু ভারত স্বমহিমায় আবারও বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো যদি সর্বস্তরের নেতাদের মধ্যে দেশ

গঠনের প্রেরণা থাকতো, থাকতো জাতীয়তাবোধের চেতনা। এক বিরাট দেউলিয়া মনোভাব নিয়ে স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক খেয়োখেয়ি সুরু হলো, অজ্ঞানতা প্রসূত মতবাদের বাজার হয়ে বসলো ভারতবর্ষ। দীর্ঘ পরাধীনতার ক্ষয়রোগ নিয়ে ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের সহজভাবে পা দিয়ে এক মহাদুর্বিপাকে জড়িয়ে পড়লো। গণতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় দেশদ্রোহীরা যত্রতত্র বাধা হয়ে দাঁড়ালো। দেশাত্মবোধ এবং গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক হয়ে যারা আত্মপ্রকাশ করলো, তারাও মূলতঃ সেই শত্রুসংস্থারই লোকজন। নইলে স্বাধীনতার দীর্ঘ বিশ বছর পরও আমরা যে তিমিরে, সে তিমিরে। আমাদের ভালো Policy-র অভাই নেই, অভাব হলো সেই Policyকে কার্য্যে রূপায়িত করার লোকের।

এই প্রচণ্ড অবক্ষয়ের মুখে ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হলেন। জাতীয় কংগ্রেস জরাগ্রস্ত, বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী দলগুলো ক্ষমতা দখলের কাছাকাছি। তেমনি দুঃসময়ে কংগ্রেস তরণীর হাল ধরলেন ইন্দিরা। জাতীয় স্বার্থেই হয়তো তাঁকে কঠোর হতে হয়েছে। এই ধরণের কঠোরতার অভাব ছিল বলেই জওহরলাল এত করেও কিছু করতে পারলেন না। কিন্তু জওহরলাল মানসিকতা পূর্ণ ইন্দিরা সে ভার গ্রহণ করলে। এক সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে তিনি হাল ধরলো। কংগ্রেস নেতা নির্বাচিত হবার পর ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তৃতার সময় তাকে মনে হয়েছিল 'জোয়ান অব আর্ক'। যে জোয়ানের স্বপ্ন ইন্দিরার। যে স্বপ্নকে পূর্ণভাবে গ্রথিত করে দিয়েছিলেন তার পিতা জওহরলাল।

কন্যা ইন্দুকে লেখা পত্রগুচ্ছগুলো সাহিত্যের আসরে এক বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। তারই একটা চিঠি সম্ভবতঃ ১৯৩০শে লেখা। তাতে কন্যাকে নেহরুজী লিখেছিলেন, "How fascinated you were when you first read the story of Jeanone d' Arc and how your ambition was to do something like her.... One little test I

shall ask you whenever you are in doubt. It may help you. Never do anything in secret or anything that you would wish to hide. For the desire that you want to hide anything means that you are afraid, and fear is a bad thing and unworthy of you. Be brave, and all the rest follows."

পিতার কাছ থেকে নেতৃত্বের গুণাবলী পেয়েছিলেন। কিন্তু মানসিক দুর্বলতাটুকু ধ্বংস করতে পেরেছিলেন মায়ের সাহসিক মনোভাবের দরুণ এবং স্থির লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকার প্রেরণাও মা'র কাছ থেকে পাওয়া। জীবনের প্রথম পদার্পনেই নিঃসঙ্গতা কী জিনিষ তা জানতেন। তাইতো তিন বছরের ইন্দু তার পুতুলগুলোকে জীবন্ত ভেবে দেশাত্মবোধক বক্তৃতা দিতেন এবং বাড়ীর কর্মচারীরাও সে জ্বালাময়ী বক্তৃতার হাত থেকে রেহাই পেতো না। যেহেতু তাদের বাড়ীটা রাজনৈতিক ঝড়ের কেন্দ্র ছিল, সেজন্যে তাঁকে রাজনীতির পাঠ নেবার জন্যে দূরে যাবার প্রয়োজন হতো না। গৃহবধূরা—স্বরূপরানী এবং কমলা তাঁদের স্বামীদের সহায়তায় এবং দেশের প্রয়োজনে রাজনীতির অংশিদার। তাঁদের নীরব দেশসেবা হয়তো প্রথম পাতার স্বীকৃতি পায়নি, কিন্তু ইতিহাসকাররা তাঁদের অস্বীকার করতে পারবেন না। তাঁকে স্বীকার করলে স্বীকার করতে হবে স্বরূপরানী এবং কমলাকে।

প্রথম জীবন থেকেই তৎকালীন রাজনীতির আবেশ থেকে দূরে থাকতে পারেন নি। পিতৃমাতৃ সূত্রেই তিনি নিজস্ববোধ, রঞ্জকক্ষমতা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা। খুব ছোট বেলা থেকে রাজনৈতিক কাজে অংশ নিয়েছেন। সংগঠনের প্রতি তার আগ্রহ এবং ক্ষমতা তখনই প্রকাশ হয়েছে। বাচ্চাদের নিয়ে তাঁর গঠিত 'বান্দা চরকাসংঘ' ও বানর বাহিনী সে প্রতিভারই পরিচয় দেয়। এ সব বাহিনীর ছেলে মেয়েরা কংগ্রেস কর্মীদের সাহায্যে সদাব্যস্ত

থাকতো। খাদ্য এবং সেবার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত। জীবনের অভিজ্ঞতা ক্রমান্বয়ে তাঁর জীবনে এসেছে। পুলিশের লাঠির স্বাধ এবং জেলের খাদ্যাস্বাদনও তাঁর জীবনে ঘটেছে। আজকের ইন্দিরাগান্ধী সেই ইন্দুরই পরিণত রূপ। হঠাৎ ভারতের আকাশে আবির্ভূত কোন নক্ষত্র নয়।

ইন্দিরা দেবী, ভবানী, পরী ইত্যাদি জাতীয় প্রসংশা তাকে কখনো মহৎ করবে না। আজকে যারা তাঁর এ ধরণের প্রসংশায় মুখর তারাই পরোক্ষভাবে প্রধান মন্ত্রীর শত্রুতা করছেন। ইন্দিরা শুধু ইন্দিরাই অন্য কিছু নয়। অন্যের সঙ্গে তুলনার মধ্যে বাহাদুরি কিছু নেই। আবার যারা তাকে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক, নয়া ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠাতৃ ইয়াহিয়ার দোস্ত বলছেন, তারাও একই রকম শত্রুতা করছেন এবং তা প্রত্যক্ষভাবে। পৃথিবীর কোন দেশেই বিরোধীপক্ষের নেতারা নেতৃত্বকে খর্ব করার জন্যে বিশ্বব্যাপী প্রচার চালান না। এক ভারতবর্ষ ছাড়া সম্ভবতঃ পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষরাই নিজের দেশকে ভালোবাসেন। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলা দেশ এবং ভিয়েতনাম দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যায়। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ কোন বিশেষ মতবাদের ছত্রছায়ায় ঘটেনি। বরং বলা চলে সার্বিক নেতা হো চি মিন-এর নেতৃত্বে দলমত নির্বিশেষে দেশোদ্ধারের পবিত্র কর্তব্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং সেটা সাম্রাজবাদী শক্তি আমেরিকার বিরুদ্ধে। বাংলা-দেশের মুক্তি যুদ্ধও সেই প্রকারের। এখানেও দলমত নির্বিশেষে দেশোদ্ধারে সামিল এবং সেটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা সরকার পুষ্ট নরপিশাচ ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে। অথচ অবাক হবার মতো ব্যাপার হলো, ভিয়েৎনামেরটা মুক্তি যুদ্ধ আর বাংলা দেশেরটা সি, আই. এর সহযোগিতায় ইন্দিরার যুদ্ধ। বিংশ শতাব্দীতে অবাক যুক্তি! দেশের এক বৃহৎ শিক্ষিত অংশ এ ধরণের দেশদ্রোহীতার আওতায় পড়ে। সে বিশ্লেষণ পরে করছি। কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারা ভারতে কীভাবে অনুপ্রবিষ্ঠ

হলো সে সম্বন্ধে আলোচনা করবো। আর এ মতবাদ ভারতের সামগ্রিক উন্নতির সহায়ক হবে কিনা এ আলোচনাও করবো। সমাজতন্ত্র কথাটা এত ব্যাপক যে শিক্ষিত ব্যক্তি কেউই এর প্রকাশ্যে বিরোধীতা করতে সাহস পায় না। অথচ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ কোন শব্দার্থই ভারতীয় অভিধানে অনটন হয়নি। সাম্যবাদ—সমাজবাদের আধুনিক জন্মদাতাদের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের চিন্তা ধারায় পরিব্যাপ্ত। আধুনিক ভাষ্যকাররা গণতন্ত্রের-সমাজবাদের —সাম্যবাদের—যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রবন্ধাকারে তুলে ধরছি। তার আগে প্রথমদিকে উল্লেখিত সত্য এবং ধর্ম্মের ব্যাখ্যার পর ঋক বেদের প্রথম শ্লোকের কথা বলেছি। তাই তুলে ধরছি।

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম
দেবাভাগং যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে।
সমানি ব আকূতি সমানাহৃদয়ানিবঃ
সমানমস্তু বো মনো যথাবঃ সুখহাসতি॥"

(অজ্ঞানতা বশতঃ এর শব্দগঠন বা ভুল বানান যদি হয়ে থাকে, তার জন্যে মার্জনা চাইছি)

ভাবার্থ:—

সবাই এক সঙ্গে চল, সবাই একই ভাবধারা প্রকাশ কর, তোমাদের সকলের মনকে নিয়ে এক বিরাট মন সৃষ্টি কর।

পূর্বকালে দেবতারা যেরূপ মিলিতভাবে যজ্ঞের হবিঃ গ্রহণ করতেন, তোমরাও তদ্রূপ মিলিত ভাবে জগতের যাবতীয় সম্পদ সকল ব্যবহার কর।

তোমাদের সকলের একই আদর্শ হোক. তোমরা সকলে সকলের সঙ্গে অভিন্ন হৃদয় হও।

তোমাদের সকলের মনকে একভাবে গড়ে তোল, যাতে তোমরা সকলে সুন্দরভাবে মিলে যেতে পার।

এ ধরণের শত সহস্রাধিক শ্লোক বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভগবত, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং বহু ধর্মগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। আধুনিক ভারতে বিবেকানন্দ তাঁর গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে সেই মানবকল্যাণমুখী বাণীর ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ নির্দ্দেশ করেছেন। ভারতের আরো বহু সাম্প্রতিক কালের মণীষা কল্যাণমুখী চিন্তাধারার দিক্ নির্দ্দেশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সমগ্র শিল্পে, সাহিত্যে সঙ্গীতে ভাস্কর্য্যে কিসের নির্দ্দেশ রয়েছে, তা কী আমরা তলিয়ে দেখেছি? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সে সবের বিশ্লেষণ করে কী আমরা সে সব ঋষি চিন্তা বর্জন করেছি? এক কথায় উত্তর দেওয়া যায়—না। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা মূল্যহীন হয়ে যাবার ভয়ে, বড়কে বড় বলে স্বীকার করলে নিজেদের ছোট হয়ে যাবার ভয়ে, দেশের উপর আরেক ধরণের শোষণের নিমিত্তে আমরা 'আলো'কে বর্জন করে এক মহা অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছি। মহামতী হেগেল যে দর্শন থেকে পুষ্ট, তাঁর শিষ্য যে দর্শন থেকে শিক্ষিত আমরা সে প্রশিষ্যের রসাস্বাদনে মগ্ন। 'ধন্য সেলুকস্ কী বিচিত্র এদেশ' একথাই বেরিয়ে আসে।

'সমাজবাদ' ব্যক্তি বা কোন বিশেষ মালিকানার অধিকারে নয়। "আমরা সমাজবাদের কথা বলেছি, সুতরাং অন্যের বলার অধিকার নেই। অন্যবা নকল, আমরা আসল। অন্যরা সরকারের পা চাঁটে, আমরা চাঁটিনা। আমাদের পথ সঠিক, অন্যটা ভুল। মেকী গণতন্ত্র মেকী সমাজতন্ত্র, মেকী সাম্যবাদ। বিপ্লব আসছে, আসবে।" এমনি কত শ্রাব্য অশ্রাব্য ধ্বনি ভারতের আকাশে বাতাসে নিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভারতের বায়ুমণ্ডল এক দুষিত গ্যাসে আজ পূর্ণ। হতাশ হয়ে সাধারণ মানুষ ভাবছে, "আমরা কোথায় চলেছি।"

সত্যিই'ত এ আমরা কোথায় চলেছি ? স্বর্গে বা নরকে ? কেন ? এর কোন উত্তর নেই।

তাই ইন্দিরাজী সমাজবাদের কথা বললে হাসি পায়, কম্যুনিষ্ট ভাবধারার লোকেরা বললে কান্না পায়। কারণ আর কিছুই না, 'সমাজবাদ' কথাটা বহু বছর ধরে শুনতে শুনতে মানুষের কাছে সেটা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

অথচ আমরা সমাজবাদের বুলি না আওড়ে সত্যিকার সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে স্ব স্ব ক্ষমতাকে কাজে লাগালে সমাজতন্ত্র সত্যিই হয়তো এত পেছিয়ে পড়তো না। "ক্ষমতা না পেলে কিছু করা যাবে না" যারা বলে তাদের কিছু করার আগ্রহ যে নেই এটা প্রমাণিত। ভাঁওতা বাজীতে সাময়িক সুবিধা হয়তো হয়, কিন্তু সত্যিকার কাজ হয় না, আজকে ইন্দিরা গান্ধী সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না কেন ? কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত নন বলে ? না, তাদের চরিত্র পাল্টাবে না বলে ? যদি তাই হয়, তবে ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্টরাও সত্যিকার কম্যুনিষ্ট নয়। কেননা, ভারতীয় সংস্কারাধীন চরিত্র বলে। আর যারা অপুষ্ট কম্যুনিষ্ট তাদের দ্বারা আসল কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আদর্শ ভালো হলে চলবে না, আদর্শকে রূপায়িত করার মতো আদর্শ চরিত্র দরকার। ব্যক্তি যদি খারাপ হয়, তবে কোন সৎ মতবাদই কার্য্যকরী বা ফলপ্রসূ নয়। বিপ্লবী নেতা ফ্রাঙ্কো আজ বিশ্বের বিভীষিকা। এমনি প্রমাণ আরো আছে। অথচ ব্যক্তি সৎ হলে, বিশেষ মতবাদের পৃষ্ঠপোষক না হয়েও মানুষের কল্যাণ করতে পারে। একক ব্যক্তিত্ব এক নায়ক হতে পারলে, অনেকে মিলেও তেমনি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সর্বহারার একনায়কত্ব কী বস্তু ? গণতান্ত্রিক সমাজবাদ নিয়ে যারা ঠাট্টা করেন, তাদের কাছে প্রশ্ন—

ধারাবাহিক ভাবে ক'টা প্রবন্ধ দিলাম, মতবাদ গুলো অনুধাবন

করার জন্যে। তারপর ইন্দিরাজী সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন কিনা আলোচনা করবো।

॥ বৈজ্ঞানিক সোসালিজম ॥

আধুনিক সোসালিজম্ এবং কম্যুনিজমের বনিয়াদ হচ্ছে মার্কসের রচনাবলী। মার্ক্সবাদের বিশেষত্ব এই যে উহা যেমন একটি নিজস্ব মতবাদ ও আদর্শ সৃষ্টি করেছে, তেমনি অন্য অনেক আদর্শকেও প্রভাবান্বিত করে পৃথিবীতে নূতন চিন্তধারা এনেছে। মার্ক্সের আদর্শ খণ্ডন করতে গিয়ে ফাসিষ্ট মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। মার্কস নিজে তাঁর আদর্শকে বৈজ্ঞানিক সোসালিজম বলে অভিহিত করেছিলেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস দাবী করেছিলেন যে সমাজ বিজ্ঞানে তাঁদের থিওরী হচ্ছে শেষ কথা। তাঁহারা বিশ্বাস করেছিলেন যে সমাজ সম্বন্ধে অন্য কোন থিওরী বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুলতায় এবং নির্ভরশীলতায় তাঁহাদের মতবাদের সমকক্ষ হতে পারবে না! বিশ্ব সমাজ সম্বন্ধে মার্কসের থিওরীতে সমসাময়িক বিভিন্ন মূল সমস্যার উল্লেখ এবং সমাধান এত বিস্তৃত ভাবে করা হয়েছে যে তা কেউই উপেক্ষা করতে পারেনি। বিগত একশত বৎসর যাবৎ মার্ক্সের থিওরী নিয়ে যত গবেষণা এবং আলোচনা হয়েছে, তেমন আর কোন থিওরী নিয়ে হয়নি।

॥ হেগেলের দর্শন ও ডায়ালেকটিক।

মার্কসের দর্শনের মূলে রয়েছে হেগেলের দর্শন। হেগেলের দর্শনের অনেক জিনিষ মার্কস গ্রহণ করেছেন; আবার হেগেলের বহু সিদ্ধান্ত খণ্ডনও করেছেন। হেগেলের দর্শন অনুধাবন না করলে মার্কসের দর্শন বোধগম্য হয় না।

হেগেলের দর্শনের অন্যতম মুলসূত্র এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই পরিবর্ত্তিত হচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে এই পরিবর্ত্তন ঘট্ছে। পরিবর্ত্তনই

একমাত্র পদার্থ যার কোন পরিবর্ত্তন নেই। (The only unchanging thing is change itself) কোন পদার্থ সম্পূর্ণ স্থায়ী নয়। সব সময় পরিবর্ত্তিত হচ্ছে।

হেগেলের মতে কেবলমাত্র আইডিয়ার মধ্যেই বাস্তবের অস্তিত্ব। দৃশ্যমান বস্তু বা ঘটনার কোন মূল্য নেই। প্রকৃত বিশ্ব হচ্ছে আইডিয়ার বিশ্ব এবং আইডিয়ার পরিবর্ত্তন হচ্ছে প্রকৃত পরিবর্ত্তন। সুতরাং আইডিয়ার জগতে পরিবর্ত্তন কিরূপে আসে তাহার ব্যাখ্যা হেগেলেকে করতে হয়েছে। একেই বলে হেগেলের ডায়ালেকটিক।

ডায়ালেকটিকের মূল ভিত্তি তিনটি—থিসিস, এন্টিথিসিস এবং সিনথিসিস। যে আইডিয়া নিয়ে আলোচনার সূচনা হয় এবং যাহা আমরা কাজে লাগাই তা থিসিস। কোন আইডিয়া তার সম্পূর্ণ বিপরীত আইডিয়া ভিন্ন থাকতে পারে না। "আলোক বলিলেই সেই সঙ্গে মনে আসবে বিপরীত অন্ধকার"। মূল আইডিয়ার বিপরীতার্থক আইডিয়াকে বলা হয় এন্টিথিসিস। মানুষের মনে এরূপ অসংখ্য থিসিস এবং এন্টিথিসিস রয়েছে। ইহাদের উভয়ের মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে সংঘর্ষের প্রবণতা রয়েছে এবং সেই সংঘর্ষ হতে আসে নতুন আইডিয়া বা নীতি এবং তাকে বলা হয় সিনথেসিস।

এই সিনথিসিস যে নতুন আইডিয়ার সৃষ্টি করবে তাও কালক্রমে বিপরীতার্থক আইডিয়ার জন্ম দেবে এবং আবার উভয়ের সংঘর্ষ নতুন আর একটি আইডিয়া জন্মাবে। এই সংঘর্ষের শেষ নাই, অনন্তকাল ধরে তা চলতে থাকবে। লা রসিনল (Le Rossignol) তার "মার্কস হতে ষ্টালিন গ্রন্থে হেগেলিয়াম ডায়ালেকটিকের আর একটি দৃষ্টান্ত ওতে দিয়েছেন। হেগেলের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, ওতে সব সময় গতি রয়েছে কিন্তু পরিবর্ত্তন খুব কম হচ্ছে। ইতিহাসের উন্নতি তদনুপাতে দ্রুততর হচ্ছে এবং তার মধ্যে ধৈর্য্য, কর্ত্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, বিচার বোধ, স্বাধীনতা এবং প্রেম প্রভৃতি

উচ্চ হতে উচ্চতর মূল্যবোধে পৌঁছবার সংগ্রাম চলছে। ঐশ্বরিক ইচ্ছার জ্ঞান বা প্রকাশ মানুষ নিজের মধ্যে ক্রমশঃ উপলব্ধি করছে এবং তা প্রগতির পথে চলেছে। এর কারণ প্রতিটির আংশিক সত্যের বিপরীত একটি কল্যাণময় সত্য রয়েছে, সেই এন্টিথিসিস অসম্পূর্ণ আইডিয়াকে বাতিল করছে এবং সিনথিসিস সেই বাতিলকে বাতিল করিয়া (negation of negation) পূর্ণ সত্যে উদ্ভাসিত হচ্ছে।

এ সম্পর্কে হেগেল নিজের কথা বলেছেন: "বৈজ্ঞানিক প্রগতির জীবন ও আত্মা হচ্ছে এই ডায়ালেকটিক নীতি, সতত গতিশীল একমাত্র এই নীতি বৈজ্ঞানিক অর্থের স্বভাবসিদ্ধ সম্পর্কের এবং প্রয়োজনের যোগান দেয়। যেখানেই গতি, সেখানেই জীবন, বাস্তব জগতের যেখানেই কোন কিছুর পরিণতি লাভ করছে সেখানেই দেখা যাবে ডায়ালেকটিক তার কাজ করে চলেছে। বিশ্বের একমাত্র গতিশীল নীতি হচ্ছে পরস্পর বিরোধিতা।"

মার্ক্সের দর্শন ও ডায়ালেকটিক

হেগেলিয়ান দর্শনের অনেকটাই মার্কস অনুমোদন করেছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলতার থিওরীকে মার্কস গভীর সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং পরিবর্ত্তনের পদ্ধতি বুঝানোর জন্য হেগেলের থিসিস, এন্টিথিসিস এবং সিনথিসিস ডায়ালেকটিক সাথে গ্রহণ করেছেন।

হেগেলের সাথে মার্কসের মতবিরোধ ঘটেছে এইখানে যে "একমাত্র মানুষের মনে এবং আদর্শের জগতেই বাস্তব আছে এবং আদর্শের সংঘর্ষের ফলেই সকল সংগ্রাম বা সংঘর্ষ আসছে" হেগেলের এই থিওরী মার্কস গ্রহণ করতে পারেন নি। মার্কস বললেন যে বাস্তব রয়েছে বস্তুগত ঘটনায়, মনের ধারণায় নয়। যে থিসিস এবং এন্টি-থিসিসের সংঘর্ষের পরিবর্ত্তন আসছে তা বিশ্বের বস্তুগত বা মেটেরিয়াল

শক্তিতে রয়েছে, পরস্পর বিরোধী আইডিয়া মাত্র নয়। ফলে যে সিনথেসিস আসলে তাও বস্তুগত এবং দৃশ্যমান হচ্ছে। সুতরাং হেগেলের আইডিয়ালিজম স্থলে মার্কস বসালেন মেটিরিয়ালিজম। মার্কস বলেছেন তাঁর ডায়ালেকটিক এবং হেগেলের ডায়ালেকটিক ভিন্ন বললে যথেষ্ট হবে না, তাঁর ডায়ালেকটিক হেগেলের ডায়ালেকটিকের সম্পূর্ণ বিপরীত।

বস্তুবাদ বা মেটিরিয়ালিজম সম্পর্কে মার্কসের মতের সংক্ষিপ্তসার দাঁড়াচ্ছে এরূপ ঃ

(১) প্রকৃতির সাথে মানুষের সংগ্রামের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা উহার মধ্যে রয়েছে।

(২) ওটা হচ্ছে দার্শনিক বাস্তববাদ বা রিয়ালিজম, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে মানুষের বস্তুগত বাস্তববোধ ওতে রয়েছে।

৩) মানুষের ইচ্ছাশক্তি এবং অভিপ্রায় মতামত এবং আইডিয়া ইতিহাসের গতি-প্রভাবান্বিত করে, এই থিওরী ওতে রয়েছে।

আধুনিক গবেষকেরা বলেছেন যে মার্ক্সকে determinist অথবা determinism বিরোধী কোনটাই বলা যায় না অর্থাৎ মানুষ ইতিহাসের অসহায় ফল মাত্র, ইতিহাস সৃষ্টিতে মানুষের কোন হাত নেই একথাও তিনি বলেননি, আবার পারিপার্শ্বিক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে মানুষ নিজেই নিজের শক্তিকে ইতিহাসের গতি নির্দেশ করতে পারে, এটাও তিনি বলেননি। মার্কসের মতে ইতিহাস মানুষের কাজের ফল, আবার মানুষও ইতিহাসের ফল। মানুষ কোন্ পথে ইতিহাসের গতি নির্দেশ করবে তা ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভর করবে, ঐ ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক আবার মানুষের কাজের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হবে। মার্কস ইতিহাসের উপর জোর দেননি, জোর দিয়েছেন মানুষের উপর, তার অবস্থা, তার সমস্যা এবং ঐগুলির সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়ার উপর।

মার্কসবাদে স্বাধীন ইচ্ছা বনাম বহিঃ শক্তির দাসত্ব (determinism) নিয়ে এ যাবৎ যে তর্ক চলেছে সে বিষয়ে মায়ার বলেছেন যে এই তর্ক এখন আর কোন সমস্যা নয়। মার্ক্সিষ্ট সমাজবিজ্ঞানের এটি এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। হার্ভার্ডের অধ্যাপক মায়ার বলেছেন ইহা যে একটি সমাজবিজ্ঞান বা সোসিওলজি তা স্বীকার করতেই হবে। মার্কস এবং এঙ্গেলসের সমস্ত মুল রচনা এখন উদ্ধার হয়েছে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ (Social institutions) ও সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য এখন সমগ্রভাবে জানা গিয়েছে। তাঁদের সমস্ত লেখার মধ্যমনি হচ্ছে মানুষ। এঙ্গেল্‌স স্পষ্ট বলেছেন, সামাজিক সম্পর্ক আমাদের মগজ হতে আবিস্কার করলে চলবে না বাস্তব জীবনে তা খুঁজতে হবে।

ব্লুজেট বলেছেন যে মার্কসের অনুরক্ত অনেকে এখন বলেন যে মার্কস মনের উর্দ্ধে ম্যাটার বা বস্তুকে স্থান দিয়েছিলেন একথা বলা ভুল। ঘটনা পরম্পরা সম্পর্কে মার্ক্সের ব্যাখ্যাকে "মেটিরিয়ালিষ্টিক" বললে শুধু এইই বোঝায় যে ওটা হেগেলের দার্শনিক আইডিয়ালিজম হতে ভিন্ন। তাঁরা বলেন যে মন বনাম বস্তু বা ম্যাটার এই তর্ক মার্কস আদবেই তোলেন নি। জি. ডি. এইচ. কোল তাঁর "মার্কস প্রকৃত পক্ষে কি বুঝিয়েছেন" বইয়ে বলেছেন যে "মার্কস প্রকৃত মন এবং প্রকৃত বস্তু উভয়কে হেগেলের Absolute এর বিরুদ্ধে সমান ভাবে তুলে ধরেছেন, Absolute দুটিকেই ঘিরে ফেলছিল।

তথাপি মার্কসের দর্শন এবং হেগেলের দর্শন সমান বিশ্বজনীন। মার্কস তাঁর দর্শনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেন নি, উহাকে শুধু শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ ও সামাজিক পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। মার্কসের সিদ্ধান্তে এই যে শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ ও সামাজিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন সাধনের এক ধরণের দৃশ্যমান বিষয়ের ক্ষমতা অন্য ধরণের চেয়ে বেশী। এই দৃশ্যমান বিষয় পাওয়া যায় অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে। মূল থিসিস এন্টিথিসিস এবং সিনথেসিস

সকলেরই চরিত্র অর্থ নৈতিক, এবং মানব সম্পর্কের অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নতি অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভরশীল। পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যায় মার্কসের আগ্রহ যতটা ছিল ততটাই ছিল পরিবর্ত্তন সাধনে। বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে মার্কস তাঁর দর্শন উৎসর্গ করেছেন, এবং প্রচলিত অর্থ নৈতিক ও সমাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর ডায়ালেকটিক যাহাতে অস্ত্ররূপে ব্যবহার হয় তাও তিনি চেয়েছেন।

মানুষের সংজ্ঞা

প্রচলিত সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে মার্কসীয় সমাজ বিজ্ঞানের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে মানুষের স্বভাব সম্পর্কে উভয়ের ধারণায়। মানব স্বভাবের ভাবাত্মক ব্যাখ্যায় আপত্তি করেছেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন যে পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানব স্বভাব বদলাবে। মানুষকে তার সংস্কৃতি হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না, উহার মধ্যে তাকে বিচার করতে হবে। মার্কসের এই মতবাদের ঘোর বিরোধিতা সেদিন হয়েছে। মার্কস এবং এঙ্গেলস দুজনেই যদিও বলেছেন যে তাঁদের সমাজ বিজ্ঞানের প্রথম ধাপ হচ্ছে মানুষ। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সুনির্দ্দিষ্ট এবং অকাট্য সংজ্ঞা তাঁরা দেননি। তাঁরা শুধু বলেছেন যে মানুষ হচ্ছে একটি সুনির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক বাস্তু-বস্তু, একটি নির্দ্দিষ্ট সংস্কৃতির অঙ্গ। তাঁদের মতে বুর্জ্জোয়া থিওরীতে মানুষকে ক্যাপিটালিষ্ট অবস্থার মধ্যে বাস্তব জীবন মানুষরূপে না দেখে মানব স্বভাবের কাল্পনিক ধারণার উপর নির্ভর করা হয়েছে।

এঙ্গেলস বলেছেন, "মানুষ একটি সচেতন এবং উদ্দেশ্য সাধনক্ষম জীব।" সচেতন এবং উদ্দেশ্য সবিনক্ষম বলিতে তিনি বুঝিয়েছেন যে মানুষ যুক্তি দ্বারা নিজের স্বার্থ বুঝিতে পারে, বুদ্ধি দ্বারা ওর জন্য সংগ্রাম করতে পারে। শ্রেণী সম্পর্কে

সমগ্র বুনিয়াদ এই দুটির উপর নির্ভর করে। মার্কস একদিকে মানুষকে যুক্তিবাদী বলে দেখিয়েছেন। আবার অপর দিকে মানুষ কতটা যুক্তিহীন হতে পারে তারও প্রমাণ দিয়েছেন। মার্কসের আধুনিক সমালোচকেরা ইহাকে তার পরস্পর বিরোধিতা বলে মনে করেন কিন্তু বস্তুতঃ ওটা তা নয় আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধিতার ভিতর দিয়েই মার্কস তার বক্তব্য পরিস্কার করতে চেয়েছেন।

মানুষের সচেতনতা বলতে বোঝায় নিজের এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তার সজাগ জ্ঞান। পারিপার্শ্বিক তার জীবন যাত্রার অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে তা সে বোঝে। এই জ্ঞান হ'তে তার উদ্দেশ্য সাধন ক্ষমতার চেতনা আসে, বিরূপ পারিপার্শ্বিককে সে নিজের অনুকূলে আনবার প্ল্যান সুরু করে। মার্ক্সবাদের এই সচেতনতা এবং উদ্দেশ্য সাধন ক্ষমতা বা বুদ্ধিকে বলা হয়েছে "শ্রম"। শ্রমের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পারিপার্শ্বিক হতে নিজের এবং নিজের জাতির জীবন রক্ষার উপায় আহরণ। তাই হচ্ছে মানুষের জীবন সংগ্রাম এবং পারিপার্শ্বিক ও প্রকৃতির সহিত এই জীবন সংগ্রমকেই মার্কসবাদে বলা হয়েছে "উৎপাদন"। এক মাত্র মানুষের বেলাতেই পারিপার্শ্বিক ও প্রকৃতির সহিত এই সংগ্রামকে সচেতন সংগ্রাম বলা যায়। সুতরাং মানুষই একমাত্র জীব যে উৎপাদন করতে পারে। মার্কস এবং এঙ্গেলস "জার্ম্মান আদর্শ"—তে বলেছেন: অন্য জন্তুর সাথে মানুষের তফাৎ এই যে মানুষ উৎপাদন করতে পারে"। ক্যাপিটাল-এ মার্কস আরও সহজ করে বলেছেন: "মাকড়সার জাল বোনাকে তাঁতির কাপড় বোনার সাথে তুলনা করা যায়, মৌমাছির সেল তৈরির কৃতিত্ব অতি বড় ইঞ্জিনীয়ারকেও লজ্জা দেয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মৌমাছির সঙ্গে নিকৃষ্টতম ইঞ্জিনিয়ারের তফাং এই যে ইঞ্জিনিয়ার বাস্তবে তার নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু করবার পূর্ব্বে কল্পনায় সমগ্র কাঠামোটি অঙ্কন করে নেয়, মৌমাছি তা

পারে না"। ভার্ণন বেনাবল তাঁর "মানব স্বভাবঃ মার্কসীয় মত" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

উৎপাদনের কথা বলতে গিয়ে মার্কস সব সময় প্রকৃতি এবং সমাজ উভয়কে অভিন্ন বলে ধরেছেন। যেখানেই মার্কস মানুষের সচেতনতার উল্লেখ করেছেন সেখানেই এর উপর জোর দিয়েছেন।

সচেতনতা বলতে মার্কস বুঝিয়েছেন সামাজিক পারিপার্শ্বিক ব্যক্তির সচেতনতা অর্থাৎ সামাজিক সচেতনতা (Social consciousness)। উৎপাদনের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "সমস্ত উৎপাদন হচ্ছে একটি নির্দ্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এবং ওর সাহায্যে প্রকৃতি হতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ"। সুতরাং মানুষ হচ্ছে সেই জন্তু যে উৎপাদন করতে পারে—এই সংজ্ঞা দ্বারা ইহাই বোঝাচ্ছে যে প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সংগ্রাম হচ্ছে মানুষের মূল ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক পরিবেশের সাথে তার সংগ্রাম হচ্ছে তা হতে উদ্ভুত আনুষঙ্গিক দ্রব্য। মার্কসবাদের একটি পরিহার্য্য বিষয় হচ্ছে এই মতবাদ যে মানুষের সামাজিক সংঘর্ষ প্রকৃতির সহিত তার সংঘর্ষের একটি আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। মায়ার বলেছেন এই মনোভাব মার্কসবাদকে ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা বলা যায়। আবার সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে মার্কসবাদের ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ বলে মনে করলে মার্কসবাদের থিওরী কিছুই বোঝা যায় না।

মার্কসের সামাজিক থিওরীর মূল কথা এই কয়টি ঃ

প্রথম, উৎপাদন সব সময়েই সামাজিক কাজ, ব্যক্তির কাজ নয়। মার্কস বলেছেন সমাজের বাহিরে ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় উৎপাদন যে সমাজে মানুষ নেই এবং কথা বার্ত্তা নেই সেই সমাজের ভাষায় উন্নয়নের মতই অবাস্তব।

দ্বিতীয়, সমাজের বিভিন্নরূপ থাকতে পারে এবং তার ভিতর দিয়ে

ব্যক্তি জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। মার্কস এবং এঙ্গেলস সমাজের বিভিন্ন রূপ পর্য্যবেক্ষণ করছেন, প্রকৃতির সংঙ্গে সংগ্রামে কিরূপ সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা দেখেছেন এবং মানব সমাজ এক স্তর হতে অন্য স্তরে কিরূপে উপনীত হয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করেছেন।

সামাজিক শ্রেণীভেদ

মার্কসবাদ মতে সমাজের রূপকে মূলতঃ উৎপাদনের সংগঠনের-রূপে দেখতে হবে এবং সমাজের প্রাথমিক বস্তু হিসাবে শ্রম বিভাগ মানতে হবে। শ্রম বিভাগের সঙ্গে সামাজিক টেকনোলজিকাল উন্নতির সম্পর্ক রয়েছে। যে সমাজে লোকে লোহা গলাতে শেখেনি সেখানে কামারশালা কল্পনা করা যায় না। মার্কসবাদে শ্রেণী কাঠামোকে শ্রম বিভাগের বৃহত্তর রূপ বলে ধরা হয়েছে। সুতরাং শ্রেণী কাঠামো জিনিষটিও সমাজের টেকনোলজিকাল উন্নয়ন স্তরে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে।

যথা, স্বাধীন শ্রম ভিন্ন যান্ত্রিক যুগ এসেছে অথবা যন্ত্র ভিন্ন প্রলিটেরিয়াট সৃষ্টি হয়েছে মার্কসবাদ তা কল্পনা করতে পারে না। ইতিহাসের কোন এক সময়ে কোন এক শ্রেণী কাঠামো এবং কোন এক টেকলোলজিকাল উন্নয়নের স্তরে একে অপরকে বুঝতে পেরেছে এবং যে সামাজিক সম্পর্ক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি পূর্ণ হয়নি কোন শক্তি বা আইন তাকে বাঁচতে পারেনি। মার্কস বলেছেন,—আইন সম্পত্তি ঘটিত কোন বিশেষ সম্পর্ক পাকা করে দিতে পারে অর্থাৎ ব্যাপক হারে জমির জমির মালিকানা বজায় রাখতে পারে। কিন্তু জমির ব্যাপক মালিকানা যতক্ষণ উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ থাকে ততক্ষণই ঐ সমস্ত আইনের অর্থনৈতিক সার্থকতা থাকে,—যেমন ছিল ইংলণ্ডে। উহার বিপরীত অর্থে বলা যায় যে সামন্ত

তান্ত্রিক জমি ব্যবস্থা যদি অসময়ে ভেঙ্গে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় যেমন হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবে, তা হলে তা স্থায়ী হবে না, আইন সত্বেও খণ্ডীকৃত জমি পুনরায় একত্রীভূত হতে থাকবে।

এঙ্গেলস উত্তর আমেরিকা, গ্রীস, রোম, আয়ারল্যাণ্ড, স্কটলাণ্ড রাশিয়া এবং জার্মেনির ইতিহাস আলোচনার দ্বারা দেখিয়েছেন যে উৎপাদন ব্যবস্থা এক প্রকার হলে সামাজিক কাঠামো এক প্রকার হবে। তিনি বলেছেন যে এই সাদৃশ্যে দুইটি জিনিষ প্রমাণ হয়ঃ প্রথম, ক্ষীয়মান রোমান সাম্রাজ্যে সামাজিক কাঠামো এবং সম্পত্তির সম্পর্কে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন স্তরের সহিত নিখুঁত ভাবে খাপ খায়. দ্বিতীয় পরবর্ত্তী চারশত বৎসরে উৎপাদনের এই স্তরে বেশী ওঠেও নি, বেশী নামেও নি, সুতরাং একই ধরণের প্রয়োজন বিদ্যমান থাকতে একই প্রকারে সম্পত্তি বণ্টন ও শ্রেণী বিভাগ ঘটেছে।

এই কারণে জোরের সাথে বলা হয়েছে যে মার্কসীয় থিওরীতে যন্ত্র এবং সামাজিক সংগঠনের এই পরস্পর নির্ভরশীলতা খুব অন্তরঙ্গ জিনিষ। ইহাকেই বলা হয়েছে উৎপাদনের শক্তিপুঞ্জ (forces of production) । মার্কসবাদের আধুনিক সমালোচকেরা বলেছেন যে মার্কসীয় সমাজ বিজ্ঞানে ইহা একটি অপরিহার্য্য সংজ্ঞা এবং উহার ব্যাখ্যা অতিশয় কঠিন। এই সংজ্ঞার গুরুত্ব এই যে এই উৎপাদনের এই শক্তি সমূহের উপরেই সমগ্র সামাজিক কাঠামো নির্ভর করছে। মার্কস বলেছেন "মানুষের উৎপাদন শক্তির একটি বিশেষ উন্নয়ন স্তর কল্পনা কর তখন দেখবে এক ধরণের বাণিজ্য এবং ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহার চলছে। আবার উৎপাদন বাণিজ্য এবং ভোগ্যদ্রব্যে বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট উন্নয়ন স্তর কল্পনা কর, তার সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ সামাজিক কাঠামো, পারিবারিক ব্যবস্থা শ্রেণী সংগঠন, এক কথায় সমাজ ব্যবস্থা দেখতে পাবে। একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা কল্পনা কর, উহার বাহ্যিক প্রকাশ-রূপে একটি নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠন দেখবে"।

সামাজিক ব্যবস্থার বনিয়াদ এবং কাঠামোর চারিটি সুনির্দ্দিষ্ট স্তর মার্কস নির্দ্দেশ করেছেন :

১) নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠন।

২) সামাজিক কাঠামো বা সিভিল সোসাইটি।

৩) প্রচলিত উৎপাদন, বাণিজ্য ও ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহার ব্যবস্থা।

৪) উৎপাদনের শক্তির উন্নয়নের স্তর।

এ হতে বোঝা যায় উৎপাদনের বাস্তব শক্তি, যন্ত্র এবং ক্ষমতা, সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে এবং তা হতে সকল প্রকার সামাজিক দৃশ্যমান ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়।

ইতিহাসের গতি নির্দ্দেশ করে টেকনোলজি, অতএব মার্কসের থিওরীকে টেকনোলজিকাল ডিটারমিনিজম বলা যেতে পারে। মার্কসের আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে জন হ্যালোওয়েল (Hollo-well) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর বইয়ের নাম Main currents in modern political thought. তিনি বলেছেন "মার্কসের মতে ইতিহাস বোধগম্য, কারণ তা টেকনোলজির ইতিহাস ; সমস্ত যন্ত্র মানুষের তৈরী সমালোচকদের অনেকে হ্যালোয়েলের এই কথা সমর্থন করেন। কিন্তু মায়ার উহাতে আপত্তি করে বলেছেন, মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনাবলী যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে পড়েছেন তাঁহারাই দেখেছেন যে মার্কস তাঁর সমগ্র থিওরী গড়ে তুলেছেন একটি নির্দ্দিষ্ট সমাজের শ্রেণী কাঠামোর উপর, উহার টেকনোলজির উপর নয়। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক অন্য সমস্ত পার্থিব অবস্থার ফল, এই কথা বললে মার্কসীয় থিওরীকে কোন একপ্রকার টেকনোলজিক্যাল ডিটারমিনিজম মনে হতে পারে কিন্তু ইহাও পরিস্কার যে টেকনালোজি এবং সামাজিক কাঠামোর এই সম্পর্ক বিষয়ে মার্কসের আগ্রহ অত্যন্ত কম। টেকনোলজির পরিবর্ত্তে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে তাঁর ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান গবেষণার

মূল ভিত্তি স্বরূপ ধরেছেন। অর্থনৈতিক কাঠামো নির্দ্দেশ করা যায় (may be determined) আবার অপরদিকে তা নির্দ্দেশ করতে পারে (determines) এবং এই থিওরীতেই হচ্ছে মার্কসবাদের বিশেষত্ব। A contribution to the critique of Political Economy গ্রন্থে মার্কস বলেছেন:

মানুষ যে সামাজিক উৎপাদন করে তাতে এমন সমস্ত পারস্পরিক নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় যা অপরিহার্য্য এবং তাহাদের নিজস্ব ইচ্ছার বহির্ভূত; উৎপাদনের এই সমস্ত সম্পর্ক তাদের উৎপাদনের বস্তুগত শক্তিসমূহের উন্নয়নের একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। উৎপাদনের এই সমস্ত সম্পর্কের সমষ্টি হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো। ওটা হচ্ছে প্রকৃত বনিয়াদ, যাহার উপর আইনগত এবং রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে এবং সামাজিক চেতনার নির্দ্দিষ্টরূপ নির্ভর করছে।

"উৎপাদনের সম্পর্ক" বলিতে মার্কস "শ্রেণী কাঠামো" বুঝিয়েছেন। উভয়টি তাঁর নিকট একার্থবোধক। সুতরাং কোন সমাজ ব্যবস্থায় কোন কিছু অনুসন্ধান করতে হলে মার্কসিষ্টকে সর্ব্বাগ্রে শ্রেণী কাঠামো বিচার করতে হবে। সমাজের মূল শ্রেণী কাঠামো বুঝবার জন্য টেকনোলজির গুরুত্ব আছে, ইহাই মার্কস বলেছেন।

শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে হলে সমাজের উৎপাদন পদ্ধতিতে তাদের স্থান কোথায় তা দেখতে হবে, আয় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বণ্টন ব্যবস্থা মাত্র দেখলে চলবেনা। আয় এবং সুযোগের বৈষম্য সব সমাজেই থাকে, তাকে সামাজিক শ্রেণীভেদের অঙ্গ বলেও মনে করা হয় কিন্তু তা শ্রম অনুসারে সামাজিক বিভাগের আনুষঙ্গিক চরিত্র মাত্র, মূল চরিত্র নয়।

মার্কসবাদে জোর করে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সকল

সম্পর্ক শোষণ প্রবণ হতে বাধ্য; সব সমাজেই এমন কোন কোন শ্রেণী থাকে যারা শ্রমের অধিকতর চাপ বহন করে কিন্তু সামাজিক উৎপাদনের সামান্যতম অংশ ভোগ করে আবার কোন কোন শ্রেণী অধিক বিশ্রাম পায় কিন্তু অধিকতর সুযোগ সুবিধা লাভ করে। মার্কস প্রশ্ন করেছেন,—শোষকশ্রেণী তার ক্ষমতা বজায় রাখে এবং শোষণ সম্পর্ক চিরস্থায়ী করে কিসের জোরে?

তার একমাত্র উত্তর—ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতার উৎস কোথায়? অধিকতর সংখ্যার জোরে এই ক্ষমতা আসেনি কারণ শোষকশ্রেণী সব সময়েই শ্রমজীবী শোষিতশ্রেণী অপেক্ষা সংখ্যায় কম। যুদ্ধ এবং দাবিয়ে রাখবার সুযোগও এর কারণ নয়, কারণ ঐ দুটি সুযোগই ক্ষমতার আনুষঙ্গিক ক্ষমতা আছে বলেই তা এসেছে। মার্কসের মতে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারাই অপর সকলের উপর প্রভুত্ব করতে পারে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য তারাই বজায় রাখতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যে শ্রেণীর হাতে থাকে সেই শ্রেণী শাসকশ্রেণীতে পরিণত হয়। ঐ ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠে সংস্কৃতির কাঠামো। একটা সমাজের শ্রেণী কাঠামো সেই সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন কিরূপ হবে তা' নির্দ্দেশ করে।

শ্রেণী সংগ্রাম।

শক্তিশালী বুর্জ্জোয়া শ্রেণীকে মার্কস ধরেছেন তাঁর মূলভিত্তি বা থিসিস এবং নিপীড়িত জনসাধারণ বা সর্ব্বহারা শ্রেণীকে বলেছেন এন্টিথিসিস। এই থিসিস এবং এন্টিথিসিসের সংঘর্ষই মার্কসের বিখ্যাত শ্রেণীসংগ্রাম। এই সংগ্রামের ফলেই ক্যাপিটালিষ্ট কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে এবং পরিণামে যে সিন্থিসিস আসবে তাতে শ্রেণীহীন সমাজ বা আদর্শ কম্যুনিজম স্থাপিত হবে। মনে হতে পারে যে শ্রেণীহীন

সমাজে পৌঁছলেই বুঝি শ্রেণী সংগ্রাম বা মার্কসীয় ডায়ালেকটিকের অবসান ঘটবে। মার্কস কিন্তু তা মনে করেননি, তিনি বলেছেন এই সংঘর্ষ চিরন্তন। শ্রেণীহীন আদর্শ সমাজের এন্টিথিসিস কি হবে এবং ডায়ালেকটিক সংঘর্ষে সিনথিসিসের দ্বারা আবার কিরূপ সমাজ গঠিত হবে তা' কল্পনা করা কঠিন। শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে ইতিহাসের ডায়ালেকটিক অগ্রগতি শেষ হবে একথা তিনি ভেবেছিলেন কিনা তা আমাদের জানা নেই তবে এ'কথা ঠিক যে ডায়ালেকটিক পদ্ধতিকে তিনি চিরন্তন গতিশীল বলে মনে করেছিলেন।

মার্কস এবং এঙ্গেলস দুজনেই বলেছেন যে শ্রেণী সংগ্রাম সব সমাজেই চিরদিন ছিল কিন্তু ক্যাপিটালিষ্ট সমাজে এই সংগ্রাম অনেক বেশী প্রকাশ্য এবং পরিস্কার হয়ে গেছে। বুর্জোয়াশ্রেণী বলতে মার্কস বুঝিয়েছেন সেই জনসমষ্টিকে যাদের হাতে সম্পত্তি আছে, সেই সম্পত্তি নগদ টাকা, জমি অথবা মূলধন সবই হতে পারে। যেহেতু বুর্জোয়া শ্রেণী সর্ব্বহারাদের শোষণ করে সেই অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করে সেই হেতু মার্কস মহাজন, জমিদার এবং কারখানা মালিকের মধ্যে পার্থক্য করেনি, তিনটিকেই বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত করেছেন। অপরদিকে সর্ব্বহারা বলতে বুঝিয়েছেন শ্রমজীবী এবং মজুরী অর্জ্জনকারী বিপুল জনসমষ্টি যাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় নিযুক্ত সম্পদের মধ্যে কোন সম্পত্তি নেই, বাড়তি টাকাও নেই; মজুরীর বিনিময়ে শ্রমশক্তি বিক্রয় ভিন্ন জীবিকা অর্জ্জনের আর কোন উপায় তাদের নেই। বুর্জোয়া শ্রেণীকে শ্রম বিক্রয় দ্বারা যে মজুরী তারা পায় সর্ব্বহারা শ্রেণী তার দ্বারা কোন ক্রমে জীবনধারণ করে। ক্যাপিটালিষ্ট সমাজ সম্পূর্ণরূপে এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে একথা মার্কস মনে করেন নি, এই দুটির মাঝখানে একটি পেতি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয়েছে এও তিনি বলেছেন। পেতি বুর্জোয়া শ্রেণীতে তিনি ধরেছেন ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক দোকানদার, চাষী প্রভৃতি; তাঁর মতে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী

বিচারে এদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল না বললেও রক্ষণশীল অনায়াসে বলা যায়, পেশাজীবী শ্রেণীকেও পেতি বুর্জোয়ার মধ্যে ধরা যায়—যদিও মার্কস এক সময়ে ওদেরকে সর্ব্ব শ্রেণীভুক্ত করে বলেছিলেন ডাক্তার, উকীল, পুরোহিত, কবি এবং বৈজ্ঞানিকদের শোষণ করে বুর্জোয়ারা ওদেরকেও সর্ব্বহারায় পরিণত করেছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ে মার্কস মাথা ঘামান নি কারণ তাঁর মতে ঐ শ্রেণী বেশীদিন টিকবেনা। কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে মার্কস এবং এঙ্গেলস বলছিলেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীচের স্তর এবং শাসকশ্রেণীর একটি ছোট অংশ ক্রমশঃ সর্ব্বহারায় পরিণত হবে কিন্তু সর্বহারা শ্রেণী হতে কেউ মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীতে উন্নীত হবে এ কথা তিনি কোথাও বলেন নি।

প্রাচীন ফিউডাল সমাজ ভেঙ্গে পড়বার পর আধুনিক ক্যাপিটালিষ্ট শ্রেণী সংগ্রাম সুরু হয়েছে। মূলধন সংগঠনের পুরানো ব্যবস্থায় কিছু লোক উৎপাদনের উপযুক্ত সম্পদ এবং বাড়তি টাকা সংগ্রহ করেছিল, ওর সাহায্যে তারা অন্য লোক ভাড়া করে, তাদের শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করেছে এবং তাদেরকে শোষণ করেছে, তদবধি বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমজীবী সর্বহারাদের শোষণ করছে। বুর্জোয়া যে অর্থ উৎপাদন করে তাতে বিলাসিতা করেও প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে এবং সেই উদ্বৃত্ত অর্থ সে আবার খাটাইয়া আরও বেশী শোষণ করতে পারে। যেহেতু শ্রমজীবী শ্রেণীর কোন সম্পত্তি নেই সেই কারণে কোনরূপে জীবনধারণের তাগিদে তারা বুর্জোয়া প্রদত্ত যে কোন মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য হয়। ফলে ধনী আরও ধনী হয় এবং দরিদ্রের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। বুর্জোয়া এবং সর্বহারার সংঘর্ষ তিক্ত এবং আপোষবিহীন হয়। সর্বহারা যতক্ষণ তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য না পাবে ততক্ষণ সে কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেনা। ফলে বুর্জোয়াদের শোষণ বন্ধ করতে হবে এবং জীবিকার উপায় বন্ধ হয়ে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উভয়শ্রেণীর

একটি ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম চলতে থাকবে। মার্কস এবং এঙ্গেলস কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টোতে বলেছেন—বুর্জোয়া শ্রেণী ধ্বংস হওয়াই উচিত।

মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী

ক্যাপিটালিজম সম্বন্ধে মার্কস কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর অর্থ নৈতিক কাঠামো বদলে গেছে এবং ক্যাপিটালিষ্ট শোষণ বন্ধ করবার উপযুক্ত এক পার্লামেণ্টারি উপায় আবিস্কৃত হয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারে ক্যাপিটালিষ্ট শোষণ অসম্ভব কমে এসেছে। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যকরী হতে পারছেনা।

মার্কস বলেছিলেন যে ক্যাপিটালিজমে একবার চড়া বাজার এবং তারপরে মন্দা আসবে এবং এই চড়া মন্দার তীব্রতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। দ্রুত উন্নতিশীল ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি এবং তার এন্টিথিসিসের সংঘর্ষ দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকবে। মূলধন ক্রমেই অল্প সংখ্যক বুর্জোয়ার হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়বে। সমগ্র ভাবে দেশের উৎপাদন সম্পদ, দক্ষতা সবই বাড়বে কিন্তু শ্রমিকের বেলায় জীবন ধারণের উপর্যুক্ত সামান্য মজুরী মাত্র জুটবে। বেকার সমস্যা বেড়ে শ্রমিকের রিজার্ভ বাড়বে, ক্যাপিটালিষ্ট প্রথায় শ্রমিকের চাহিদা কমবে, বহু লোক কাজ জোটাতে পারবে না। ধনীর বৈভব এবং শ্রমিকের দারিদ্রের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ দেখা দেবে। উৎপাদনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি হবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্যাপিটালিষ্টরা সঙ্গবদ্ধ হবে। ইহারা বৈদেশিক বাজার হস্তগত করতে অগ্রসর হবে। ঐ সমস্ত বাজারে ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য এরা সাম্রাজ্য সৃষ্টি করবে এবং বুর্জোয়া কবলিত রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করবে। এরাই বিশ্বব্যাপী

সাম্রাজ্যবাদ হয়ে দাঁড়াবে। ক্যাপিটালিষ্ট কবলিত সব দেশ বৈদেশিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করবে এবং তখন এদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বেধে যাবে। বিভিন্ন ক্যাপিটালিষ্ট দেশের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধবে। অবশেষে এক প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শেষে এবং নিদারুণ মন্দায় ক্যাপিটালিষ্ট পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়বে। এই সন্ধিক্ষণে সর্ব্বহারার দল বিদ্রোহ করবে, বিপ্লবের পথে ক্ষমতা হস্তগত করবে এবং রাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট ও অর্থনীতির উপর নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করবে। ক্যাপিটালিষ্ট পদ্ধতির ধ্বংসের বীজ তার জন্মের মধ্যেই রয়েছে। ঐ ধ্বংস তখন আসবে।

মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। কিন্তু গত পনের বৎসরে পৃথিবীর বহু ক্যাপিটালিষ্ট দেশের সমাজ ব্যবস্থায় যে আমূল অর্থ নৈতিক এবং রাজ-নৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাতে আগামী যুগে মার্কসীয় থিওরী অনুযায়ী ক্যাপিটালিষ্ট থিসিস এন্টিথিসিস ঘটবার মত অবস্থা আর আসবার সম্ভাবনা প্রায় তিরোহিত হয়েছে বলা যায়। জাগ্রত জনমত সৃষ্টি হয়েছে, শ্রমজীবিরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। ক্যাপিটালিষ্ট একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করবার আইন সঙ্গত উপায় আবিস্কৃত হয়েছে, পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে বিনা রক্তপাতে সমাজ ব্যবস্থার আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের উপায় জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ে ক্যাপিটালিষ্ট সাইকল বা চক্রবৎ আবর্ত্তন বন্ধ করবার জন্য প্লানিং বা রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক ফর-মূলা কার্যকরী হয়েছে। ক্যাপিটালিষ্ট পদ্ধতিতে ধন বণ্ঠনের যে বিপুল বৈষম্য ছিল পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে তা তিরোহিত হয়েছে। মার্কস যা চেয়েছিলেন সমাজ জীবনের বহু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ তা লাভ করেছে।

মার্কস আজ জীবিত থাকলে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্যে আনন্দিত হতেন। কিন্তু আজ এক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। ক্যাপিটালিজমের

শোষণ ক্ষমতার উপর ব্রেক কষে গিয়েছে কিন্তু তার শোষণ ক্ষমতা বন্ধ হয়নি। ক্যাপিটালিজম ভবিষ্যতে আর কখনো যাতে মাথা তুলতে না পারে তার জন্য সকল সময়ে তার উপরে ব্রেক মজবুত রাখতে হবে। পার্লামেন্টারি উপায়ে তা রাখা যায় এ প্রমাণিত হয়েছে সুতরাং সব দেশই ঐ উপায়ে ক্যাপিটালিজমকে সংযত রাখতে চেষ্টা করছে।

এরই নাম গণতান্ত্রিক সোসালিজম। এই সোসালিজম বৃটেন এবং জার্ম্মানীতে চালু হয়েছে। আমেরিকায় একই বস্তু প্রচলিত হয়েছে ভিন্ন নামে—পিপলস ক্যাপিটালিজম। আমেরিকান ক্যাপিটালিজম গণ-তন্ত্রের চাপে শোষণ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু নাম ছাড়েনি।

কম্যুনিষ্ট বিপ্লব

মার্কস বলেছিলেন যে ক্যাপিটালিজম যখন ধ্বংস হবে তখন সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী গড়ে না উঠলে অরাজকতা আসবে। বুর্জ্জোয়া শ্রেণী নিজেই তার ধ্বংসের পথে অভিমুখে অগ্রসর হবার সময় একটি শক্তিশালী বিরোধী শ্রেণী সৃষ্টি করে দিয়েছে। কমুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে মার্কস এবং এঙ্গেলস বলে-ছিলেন বুর্জ্জোয়া শ্রেণী ধ্বংস এবং সর্ব্বহারা শ্রেণীর অভ্যুদয় উভয়ই সমান অপরিহার্য্য।

এখানেই প্রশ্ন উঠেছে সর্ব্বহারা শ্রেণী ক্ষমতা অধিকার করবে কোন উপায়ে, রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে অথবা শান্তিপূর্ণ উপায়ে? এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর মার্কস দিয়েছেন কিন্তু তার সুস্পষ্ট মত ছিল এই যে রক্তাক্ত বিপ্লব প্রয়োজন হবে। স্বেচ্ছায় ধনিরা ক্ষমতা ছড়াবে না, ক্ষমতা তাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে। তরবারির জোরে যারা বেঁচেছে তরবারির জোরেই তারা মরবে।

কমুনিষ্ট বিপ্লব প্রথম ঘটবে কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কস

বলেছেন সর্ব্বাধিক উন্নত ক্যাপিটালিষ্ট দেশেই উহা ঘটবে। জার্ম্মান অথবা ইংলণ্ডের মধ্যে প্রথমে কোন দেশে বিপ্লব হবে তা তিনি স্পষ্ট বলতে পারেননি। প্রথমে বললেন ইংলণ্ডে হবে তারপরে বললেন ইংলণ্ডে নয় আগে জার্ম্মানীতে হবে, আবার মত বদলিয়ে বললেন ইংলণ্ডেই প্রথম বিপ্লবের সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু ঘটল তার বিপরীত। উন্নত ক্যাপিটালিষ্ট দেশে প্রথম কমুনিস্ট বিপ্লব ঘটল না। ঘটল একেবারে অনগ্রসর কৃষি প্রধান দেশ রাশিয়ায়।

মার্কস বলেছিলেন যে বিপ্লব আসন্ন এবং অপরিহার্য্য করতে হলে তিনটি সর্ত্ত চাই—প্রথম, ক্যাপিটালিস্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন এবং বণ্টনের যে সব শক্তি কাজ করছে সেগুলি ভেঙে পড়া চাই ; দ্বিতীয় শাসক শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য নস্ট হওয়া চাই এবং তৃতীয়, ধর্ম্মঘট দাঙ্গা এবং গণ বিক্ষোভ প্রভৃতি শ্রেণী চেতনার অকৃত্রিম প্রকাশ থাকা চাই।

১৯২৯-এ আমেরিকায় মন্দার সময় ঠিক ঐ অবস্থা ঘটেছিল। ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন এবং বণ্টন পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়েছিল। শাসক শ্রেণীর এবং অর্থনৈতিক নেতাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। একজনে এক এক প্রকার মত প্রকাশ করেছেন। দাঙ্গা এবং গণ বিক্ষোভ যথেস্ট হয়েছিল। আমেরিকার ন্যায় উন্নত ক্যাপিটালিস্ট দেশে কমুনিষ্ট বিপ্লবের সকল অবস্থা এবং লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তা কেন আসল না? রাজনীতি বিজ্ঞান এবং অর্থনীতির আধুনিক পণ্ডিতেরা বললেন যে এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমেরিকায় শ্রেণী চেতনা সম্পন্ন সর্বহারা শ্রেণী গড়ে উঠেনি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রচুর শক্তিশালী রয়েছে। আমেরিকার গণবিক্ষোভে শ্রমিক, কৃষক, ডোলপ্রাপ্ত ভিক্ষুক হতে সুরু করে শিল্পপতি পর্য্যন্ত সকলেই যোগ দিয়েছে এবং সকলেই নিজেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অঙ্গ বলে মনে করেছে। আধুনিক সমাজে কমুনিষ্ট বিপ্লবের সর্ব প্রধান সর্ত্ত শ্রেণী চেতনা সম্পন্ন সর্বহারা শ্রেণীর

বিলোপ ঘটছে। শ্রমিক শ্রেণী এখন আর সর্বহারা নয়। অনেক শ্রেণী অপেক্ষা তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল হয়েছে। কাজের অনেক বেশী সিকিউরিটি মিলেছে এবং আধুনিক শ্রমিক কিছু অধিক মজুরী ও বোনাসের বিনিময়ে ক্যাপিটালিষ্টের অচ্ছেদ্য অংশীদার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা বিপ্লব চায় না।

প্রলিটেরিয়াটের ডিক্টেটরশিপ

বিপ্লবের পর সামাজিক পরিবর্ত্তন আনতে হলে সর্বহারার ডিক্টেটর-শিপ প্রয়োজন এটা মার্কসের নির্দ্দেশ। মার্কসের মত বিপ্লব ঘটালেই সেই মুহূর্ত্তে আদর্শ সমাজের আবির্ভাব ঘটবে না। শ্রেণীহীন কমুনিষ্ট কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠা করতে হলে বেশ কিছুদিন প্রলিটেরিয়াটের ডিক্টেটরী চালাতে হবে। বিপ্লবের পর প্রলিটেরিয়াট ডিক্টেটরশিপ ক্যাপিটালিজমের সমস্ত চিহ্ন মুছে দেবে। এমন কি ক্যাপিটালিষ্ট আদর্শবাদ পর্য্যন্ত বজায় থাকবে না। এই পরিবর্ত্তন আনতে বল প্রয়োগ এবং রক্তপাত করতে হবে। সর্বহারার ডিক্টেটরশিপ কমুনিষ্ট পার্টি পরিচালনা করবে।

পূর্ণ কমুনিজম

প্রলিটেরিয়াটের ডিক্টেটরশিপ হওয়া মাত্র কমুনিষ্ট সমাজ স্থাপিত হবে না, চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা তা আনতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং জনসাধারণ যখন প্রস্তুত হবে তখনই আদর্শ কমুনিষ্ট সমাজ স্থাপন সম্ভব হবে। প্রথমতঃ ক্যাপিটালিষ্ট আদর্শের শেষ কণাটুকুরও উচ্ছেদ সাধন করতে হবে। সম্পত্তির মালিকানার দ্বারা আয় করা যায়, এই কথা প্রতিটি লোককে ভুলিয়ে দিতে হবে। কেউ বেশী কেউ কম উপার্জ্জন করবে এ কথাও সকলকে ভুলতে হবে। উৎপাদনে বা অন্য কাজে ব্যক্তিগত ক্ষমতার বৈষম্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার মজুরী পাওয়া

যায় এটাও লোককে ভুলতে হবে। মানুষ তার সাধ্যমত কাজ করছে এটাই আসল কথা, কেউ ভাল কেউ খারাপ কাজ করছে তা দেখলে চলবে না। প্রাণ দিয়ে শ্রমিক কাজ করছে কিনা তা দেখলেই যথেষ্ট হবে, কে কিরূপ উৎপাদন করছে তার বিচারের প্রয়োজন নেই। উৎপন্ন সমুদয় দ্রব্যের মালিক সমাজ, ব্যক্তিগত ভাবে যার যা প্রয়োজন সে তাই গ্রহণ করবে। যে যত পারে উৎপাদন করবে এবং যার যা প্রয়োজন তাই সে নেবে— এই হবে কমুনিষ্ট অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক আদর্শ। উৎপাদন যখন প্রচুর বাড়বে কোন দ্রব্যের মূল্য তালিকা তৈরির প্রয়োজন থাকবে না, যার যা প্রয়োজন সে তাই নিতে পারবে তখনই মানুষের মনে, কাজে আমূল পরিবর্ত্তন আসবে। যখন এরূপ সামাজিক অবস্থা আসবে তখন শ্রেণী বিভেদ শ্রেণী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তা বিচারের প্রয়োজন বা সুযোগ থাকবে না। এই অবস্থা যেখানে আসবে সেখানে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন থাকবে না কারণ মানুষে মানুষে যেখানে ভেদ আছে, সেখানেই বিবাদ ঘটে এবং সেই বিবাদ মেটাতে রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে হয়। যেখানে বিভেদ নেই সেখানে বিবাদও নেই, সুতরাং বল প্রয়োগের এজেন্সিরূপে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। একেই বলে রাষ্ট্র উবে যাবে এবং অদৃশ্য হবে (State will wither away and disappear)। একটি সমাজে প্রতিটি মানুষের স্থান ও মর্য্যাদা যখন একেবারে সমান হয়ে যায় তখন উৎপীড়ন করারও লোক থাকে না, উৎপীড়িত হবারও কেউ থাকে না। মার্কস এবং লেনিন দুজনেই বলেছেন যে এই অবস্থায় রাষ্ট্রের অবসান ঘটে না (not abolished) রাষ্ট্র অদৃশ্য হয় এই মাত্র।

বিপ্লব হতে সুরু করে রাষ্ট্র অদৃশ্য হবার অবস্থা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত কত সময় লাগবে এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর মার্কসীয় থিওরেটিসিয়ানরা দিতে পারেননি। মার্কস নিজে বলেছেন,—"এ জন্য পনেরো কুড়ি

এমন কি পঞ্চাশ বছর সিভিল এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধ করতে হতে পারে। শুধু পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন মাত্র নয়, রাজনৈতিক লাগাম হাতে নেবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিজের অন্তরের পরিবর্তন ঘটাবারও প্রয়োজন আছে।" লেনিন বলেছেন প্রলিটারিয়াটের নিজের পেতি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তির পরিবর্তন একবার মাত্র আঘাতে দূর হবে না, সুদীর্ঘ এবং কঠোর গণ সংগ্রামের ফলেই তা আসতে পারে।

ক্ষুদ্রচিত্ত এবং কলুষিত উপায়ে কমুনিষ্ট বিপ্লব সফল হতে পারেনা, মার্কস এবং লেনিনের এই শিক্ষা আধুনিক যুগের কমুনিষ্টরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

মার্কসীয় দর্শন নিঃসন্দেহে পৃথিবীর মানব নামক জীবদের সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণের একমাত্র এবং নির্ভরশীল দর্শন। যান্ত্রিক বিপ্লব সূচিত হবার পর থেকে মানব সমাজের অতি দ্রুত পরিবর্তনের মুখে যে সব সমস্যা, সমাজ ভেঙ্গে পড়ার করুণ অবস্থা, তার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসীয় দর্শন নিঃসন্দেহে পুরোহিত। বিশ্বের সমগ্র সম্পদ কতিপয় ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত আর পৃথিবীর বাকী বৃহত্তর অংশ শোষিত এবং নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে—এমন অবস্থায় সেই অবক্ষয়িত মানুষদের সামনে আশার আলো জ্বেলেছেন কার্ল মার্কস। কিন্তু মার্কসীয় দর্শনের অনুগামীরা মার্কসবাদের প্রয়োগের সময় বিভিন্ন রকম গোঁড়ামীর প্রচলন করে, সামগ্রিক মানব কল্যাণকর মতবাদকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। নইলে দীর্ঘ এক'শ ছাব্বিশ বছরের বয়ক্রমকালে সে আবার যুবা অবস্থা থেকে শিশুর পর্য্যায়ে চলে যাচ্ছে কেন? সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজ স্তিমিত কেন? বস্তুবাদী ব্যক্তিরা আজ এত স্বপ্নে বিভোর কেন? সমস্ত অপকর্মকে মার্কসবাদের ব্যাখ্যা দিয়ে জাতে উঠবার চেষ্টা কেন? এমনি আরো শতশত প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে এত বিরোধ কেন? আর কেনই বা শোষিত মানুষ সংগঠিত না হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে?

এর বিষদ ব্যাখ্যার অবতারণা করার চেষ্টা করছি না। মোটামুটি ভাবে আলোচনা করবার চেষ্টা করবো।

প্রথম কথা ক্যাপিটালিজম এবং সোসালিজমের মধ্যপন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে বর্ত্তমানে। পার্লামেণ্টারি পদ্ধতি সমাজতান্ত্রিক দেশেও চালু হয়েছে। বর্ত্তমান পৃথিবীর মানুষ ক্যাপিটালিজমকে অপছন্দ করছে এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রলেটারিয়েট ডিক্টেটারিজমকে পছন্দ করতে পারছে না। তাই মধ্যপন্থা হিসাবে পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরছে। জার্ম্মান ইটালির সৌজন্যে ডিক্টেটারিজম কী বস্তু পৃথিবীর মানুষ প্রচণ্ডভাবে উপলব্ধি করেছে। তাই ঐ শব্দটির প্রতি সামগ্রিক অনীহা। তাছাড়া বস্তুর পরিবর্তনশীলতা যেখানে সত্য, সংঘর্ষের মাধ্যমে যেখানে নতুন নতুন অবস্থার আবির্ভাব সম্ভব, সেখানে মার্কসীয় দর্শনের স্থিরতা কেন? এছাড়া অর্থনীতিই মানব জীবনের শেষ কথা কি? এ ধরণের ছড়ানো ছেটানো কথা আছে, সে সব আলোচনার ক্ষেত্র বিরাট এবং সে আলোচনায় প্রবেশ করে আমার লেখাকে ভারবাহী করে তুলবো না। মার্কসীয় দর্শনের মূল কথাকে নিয়ে আলোচনা করবো।

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বিশেষ শক্তির দ্বারা পরিচালিত। সর্বোপরি সে বিশেষ শক্তির প্রভাবে সব কিছু ভারসাম্য রক্ষা করছে অর্থাৎ ব্যালান্স রক্ষা করছে। এই ব্যালান্সই হচ্ছে প্রথম কথা এবং শেষ কথা, এ না থাকলেই ধ্বংস অনিবার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মানুষ বা পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু পৃথিবী পৃষ্ঠে স্থির হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধরণের শক্তি তাদের স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে না রেখে চলমান করছে এবং চলমান অবস্থায় পতন না ঘটবার জন্যে অন্য শক্তি ধরে রাখছে। নইলে লম্বভাবে থাকা মানুষ ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে থাকতো। অর্থাৎ ব্যালান্সই আসল কথা। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই ব্যালান্সের খেলা। ব্যালান্সহীনতাই ধ্বংসের কারণ।

মার্কসীয় দর্শন এমন ধারা একটা কথার অবতারণা করেছেন সত্য কথা। যেমন থিসিস, এ্যান্টিথিসিস এবং সিন্‌থিসিস। এ তিনের সংঘর্ষের কথাই মার্কস বলেছেন, কিন্তু এ তিনের পরিক্রমা ব্যালান্সের কথা বলেনি। বৈজ্ঞানিক নিউক্লিয়াস থিওরি এ ব্যালান্সের অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন পরমাণু তত্ত্বে। ভারতীয় দর্শনও এই পরমাণু তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন বহুযুগ আগে অন্যভাবে, অন্য প্রকারে। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্বে এ ব্যালান্সের অভাব। এবং ব্যালান্সের অভাবের দরুণ এর ধ্বংস অনিবার্য্য যদি না আধুনিক মার্কসীয় অনুগামীরা এর পরিবর্ত্তন আনেন।

পৃথিবীর দুটোমাত্র মতবাদ আছে—ভাববাদ এবং বস্তুবাদ। এই ভাববাদ ও বস্তুবাদ কেউ কারো থেকে আলাদা নয়। একে অন্যের পরিপূরক। নইলে ব্যালান্স থাকেনা মানব দেহ এবং জীবনীশক্তির মতো। দেহ না থাকলে যেমন জীবনীশক্তির প্রশ্ন অবান্তর, তেমনি জীবনীশক্তি না থাকলে দেহ অবান্তর। এই দুটোর ভারসাম্যেই সবকিছু।

মার্কসিজম বস্তুবাদকেই সর্বেসর্বা করেছেন, ভাববাদ বর্জন করে; অথচ এই বস্তুবাদের ব্যাখ্যাটা আসলে ভাববাদ। বস্তু যা তাই যখন সত্য, তখন তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন কী, আর সমগ্র মানব কল্যাণের জন্যে কার্লমার্কসেরই এত মাথা ব্যথা কেন? তাহলে বস্তুসকল জড়বাদী হয়ে পড়েনা। বস্তুকে সচল করছে যে শক্তি, সে শক্তির ব্যাখ্যাই ভাববাদ। এই অতিপ্রয়োজনীয় অংশটুকুই মার্কস ইচ্ছাকৃত ভাবে বাদ দিয়েছেন। বস্তুবাদ আগে না ভাববাদ আগে—এ আলোচনায় মানব ইতিহাসের বহু সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং এ আলোচনা কখনোই শেষ হবে না। কার্লমার্কসের বহুশত বৎসর আগে ভারতবর্ষে বস্তুবাদী চিন্তার আবির্ভাব হয়েছে। অবশ্য বিগত মণীষা তাকে ভোগবাদ বলে বর্ণনা করেছেন। চার্ব্বাক দর্শনই সেই বস্তুবাদী দর্শন বা ভোগবাদী দর্শন। আধুনিক বস্তুবাদ কী সেই

ভোগ বাদেরই কী নব সংস্করণ নয়? পৃথিবীতে প্রাণবন্ত প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে এই ভোগবাদ এবং ভাববাদ-এর সমন্বয় ঘটেছে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্ট জীবে ভোগবাদ এবং ভাববাদ সমন্বয়ের দ্বারা ব্যালেন্সের সৃষ্টি হয়নি। তাই মানুষ ছাড়া অন্য জীব ধ্বংসের মুখে। যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে ভোগবাদী করে তুলেছে। এবং এই কারণেই পৃথিবীতে এত অস্থিরতা এত অধঃপতনের কারণ। পৃথিবীর মানুষ আজ জীবন সম্বন্ধে বীতস্পৃহ। তা সে সমাজতান্ত্রিক দেশেই হোক বা ধনতান্ত্রিক দেশেই হোক। এর কারণ হলো ভাববাদকে দূরে সরিয়ে রেখে ভোগবাদী হয়ে ওঠার জন্যে। অর্থ নীতি মানুষের কাছে অনেক কিছু হলেও সবকিছু নয়। যদি তাই হতো অর্থাৎ অর্থ নীতিই সবকিছু হতো তাহলে মার্কসীয় দর্শনের বহু আগেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।

হেগেল আইডিয়ার জগতের ওপর জোর দিয়েছিলেন। আইডিয়া নিঃসন্দেহে ভাববাদ। মার্কস তাঁর বিপরীত। অর্থাৎ আইডিয়া কিছু নয়, বস্তুই সব। এখন এই বস্তুটা কি জিনিষ? একটা গরু, একটা গাছ, এক টুকরো পাথর, একটা মানুষ—এ সবই বস্তু। কিন্তু কোন একটি বস্তু (মানুষ) অন্য বস্তুর যখন ব্যাখ্যা করেন তখন প্রয়োজন হয় জ্ঞানের। সে জ্ঞানের আবার দুটো ভাগ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং পরোক্ষ জ্ঞান। এ দুটোকে সংযুক্ত করে উপলব্ধি। উপলব্ধি আসে জ্ঞানের দুটো ভাগের ব্যালেন্স থেকে। সুতরাং যে বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি এবং প্রত্যক্ষ করার সময়ে আমাদের জ্ঞানের দুটো ভাগই কাজ করছে এবং উপলব্ধির জগতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করছে। এবং তার ব্যাখ্যার সময় প্রত্যক্ষ জ্ঞান, পরোক্ষ জ্ঞান ও উপলব্ধি বস্তুর নতুন রূপ দিচ্ছে। কাজেই বস্তু যা তার পরিবর্ত্তন ঘটছে অন্যের ব্যাখ্যায়। এই যে পরিবর্ত্তিত রূপ তা বস্তু থেকেই সৃষ্ট কিন্তু আসল বস্তুটি নয়। এই উপলব্ধির জগতই বস্তুর ব্যাখ্যা করছে, নতুন রূপ দিচ্ছে। তাই

ভাববাদের অভাবে বস্তুবাদ অচল। কবিগুরুর কবিতার ক'টা লাইন আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করবে বলে বিশ্বাস।

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ,
চুনি উঠলো রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠলো আলো
পূবে পশ্চিমে।
...   .
এ আমার অহঙ্কার,
অহঙ্কার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহঙ্কার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
...   .
ওদিকে অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই 'আমি'র গহনে আলো আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠলো রস;
'না' কখন হয়ে ফুটে উঠলো 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে॥
...   .
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে

দূরে দূরান্তে অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনখানেই—
'তুমি সুন্দর'
'আমি ভালোবাসি'।"

হেগেলীয় দর্শনে কর্তব্যবোধ, স্নেহ প্রেম, ভালোবাসা জাতীয় সুকুমার বৃত্তির প্রাধান্য রয়েছে। মার্কসবাদ সে গুলোকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। সুকুমার বৃত্তিগুলো বুর্জোয়া শিক্ষার ফল। তাই যদি হয়, তাহলে, অন্যের ভালো হল কি হলো না, কে কাকে শোষণ করছে, তা দিয়ে ব্যক্তির প্রয়োজন কী? শুধু কি নিজে ভালো করে বাঁচবার জন্যে অন্যের ভালো হোক এমন ধারণা? সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভালো হয়ে গেলে অন্যের ভালোর কথা মনে না করাই তো স্বাভাবিক! তাহলে'ত সমগ্র মানব জাতিকে নিয়ে একটা কল্যাণকামী সমাজ গড়ে উঠতে পারেনা। শোষিত মানুষকে সংগঠিত হতে হলে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা বন্ধন দরকার। এবং সেই পরস্পর বস্তুর সাংগঠনিক বন্ধন আনবে উপলব্ধি। সেই উপলব্ধি সৃষ্ট আইডিয়ার মধ্যে থাকবে মানুষের সুকুমারবৃত্তি। নইলে নিছক বস্তুগত স্বার্থে মানুষ এক সাথে থাকলেও মানবিক ধারণা পুষ্ট একটি মানব রাষ্ট্র হতে পারে না। সবাইকে একত্রিত করার সূত্রের নাম ভাববাদ।

মার্কসিজমে সেই ভাববাদ তথা মানসিক দিকটা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। মানুষকে উদরপূর্তি দিয়ে বিচার করার বিচারে যে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে তাতে মার্কসীয় দর্শন একপেশে হয়ে পড়েছে। অঙ্কের হিসেবে মানুষকে বিচার করলে ভুল করা হবে। মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে খাওয়া পরা ছাড়াও তার চিন্তা বিশেষ দিকে ধাবিত। ভারতের মাটিতে এমন বহু সহস্র মানুষ নিজেদের দুঃখ দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছে।

বলতে হয় অপ্রয়োজনের আনন্দে মেতে উঠেছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনটাই যদি মানুষের বড় হত, তাহলে মানুষ সেই অন্ধকার গুহাবাসী হয়ে থাকতো ; পশুত্বের স্তর থেকে মানুষের স্তরে পৌঁছিতো না, সমগ্র মানব গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্যে সময়ের অপব্যয় করতো না। একটা ছোট উদাহরণ তুলে ধরছি। সৃষ্টির প্রথমের মানুষের হাত এবং পা তার প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাবার হাতিয়ার। হাত দিয়ে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ করা, শত্রুর বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরা, ইত্যাদি প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাবার সহায়ক। অবসর সময়ে, যখন প্রাত্যহিক প্রয়োজন জাতীয় কাজের জন্যে হাতের ব্যবহারের প্রয়োজন নেই, তখন সে হাত দুটোকে বসিয়ে না রেখে বিভিন্ন মুদ্রাজাতীয় সঙ্কেত সৃষ্টি করেছে, পায়ের সাহায্যে বিশেষ ছন্দবদ্ধ তালের সৃষ্টি করেছে, সেভাবেই সৃষ্টি হয়েছে নৃত্য। এই নৃত্য সৃষ্টি সম্পূর্ণ মানুষের অবসর মুহূর্তে অপ্রয়োজনে। গানের আবির্ভাবও সেভাবে। প্রয়োজন ভিত্তিক সঙ্কেত ধ্বনি, অপ্রয়োজনের মুহূর্তে সংগীত। কাজেই ভোগবৃত্তির বাইরে মানুষের চিন্তাধারা ব্যাপ্ত। এ সবই কি বুর্জোয়া সংস্কৃতির ফল? পূর্ণ কম্যুনিজমের আবির্ভাব হলে এসব কিছু তিরোহিত হবে? বুর্জোয়া শিক্ষা সংস্কৃতি যদি সর্বহারা শ্রেণীর শত্রুতা করে তবে কার্লমার্কসের আবির্ভাব কী করে হলো, লেনিন সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিভূ হলেন কী করে? এর কোন উত্তর নেই। উত্তর নেই মার্কসীয় দর্শনের অনেক কিছুরই। সুকুমারবৃত্তি হীন মার্কসীয় দর্শন মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ করতে পারে না। ভবিষ্যৎ ইতিহাস তার সাক্ষ্য হবে।

আমি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। কোন কারণেই মানুষের পরাধীনতাকে গ্রহণ করতে পারিনা, কী সাম্রাজ্যবাদী চেহারায়, কী সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর আড়ালে প্রলেটারিয়েট ডিক্টেটরশিপের চেহারায়। কোনটাই মানুষকে মানুষ

বলে স্বীকার করে না। ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেই যে বৃহত্তর মানুষ শোষণের আওতায় থাকবে এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যে কোন মতবাদেই অশুভ প্রভাব থাকতে পারে, সে অশুভ প্রভাবও মানুষ কাটাতে পারবে কল্যাণমুখী ব্যাপক চিন্তার দ্বারা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সোসালিজম পরিবর্ত্তনশীলতাকে স্বীকার করে নিয়েও পরিবর্ত্তনহীন মানুষকে এক বিশেষ ভোগের সাম্রাজ্যে আটকে রেখে ধীরে ধীরে অমানুষের পর্য্যায়ে নিয়ে আসবে। কোন মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার কোন মানুষের নেই। সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকার করতে হবে। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা" এই প্রবচনকে সামনে রেখে এগোনো দরকার। এ না হলে শোষণের ধারা অদূর ভবিষ্যতেও অম্লান থাকবে। হয়তো অর্থনৈতিক শোষণ থেকে তা অন্যরকম শোষণে গিয়ে দাঁড়াবে।

গণতন্ত্র মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। পরন্তু তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়না। সামগ্রিক অর্থহীনতা থাকলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। তাই সমাজব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যাতে অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা দুইই থাকে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক সুযোগ এনে দেয় অনেকখানি। গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মিলিত ব্যবস্থাপনায় মানুষের কল্যাণ করতে পারবে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ আপাত বিরোধী মতবাদ হলেও একটি ব্যাপারে এক। তাহলো মানুষের কল্যাণ। যদি মানব কল্যাণই মুখ্য কথা হয়, তবে পথ এবং মতের পার্থক্য নিয়ে অশুভ অবস্থার সৃষ্টি না করে মানব কল্যাণের প্রয়োজনে কাজ করা দরকার। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পরিপ্রেক্ষিতে স্বর্গত জওহরলাল নেহরু অনেক চিন্তা করেছেন। ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তার আবির্ভাব ঘটাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি। না হওয়ার কারণ, কংগ্রেস সংগঠনে অন্য কোন নেতাকে পূর্ণসহযোগীর ভূমিকায়

পাওয়া যায়নি। এবং কংগ্রেসদল গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন দল ছিলনা বলে। রামমনোহর লোহিয়া এবং অশোক সেটা পরবর্ত্তি সময়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। কিন্তু সরকারের কাঠামোতে তেমন ফাটল ধরাতে পারেন নি। আজ কংগ্রেস দল তথা তার ক্রিয়াশীল নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দিকে ঝুঁকেছেন, এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কিছুটা পরিচয় দীর্ঘদিন ধরে যা মার্কসীয় তত্ত্বের বাইরে নতুন তত্ত্ব হিসেবে প্রচারিত হয়ে আসছে তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবো। লিবারেল সোসালিজম বা ফেবিয়ান সোসালিজম এবং রিভিসনিজম নিয়ে আলোচনা করবো।

ফেবিয়ান সোসালিজম

বিশ্বের সোসালিষ্ট চিন্তা ধারায় মার্কসবাদের প্রভাব অত্যধিক। কিন্তু মার্কসবাদ সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। আজও মার্কস-বাদ সমগ্র বিশ্বে একচেটিয়া নয়। মানুষের চিন্তাধারা যেহেতু স্থিরতার পর্য্যায়ে আসেনি, সে হেতু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, নতুন চিন্তা ধারায় ব্যাপৃত হচ্ছে। ফেবিয়ান সোসালিজম মার্কসীয় চিন্তা-ধারায় অগ্রগমনকে ব্যাহত করেছে। মার্কস পরবর্ত্তিকালে এমনি ধরণের অনেক সোসালিষ্ট চিন্তা ধারার আবির্ভাব হয়েছে। সে সবের মধ্যে ফেবিয়ান সোসালিজম নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

মার্কসের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসে। এর ক'মাস পরে লণ্ডনের চেলসিয়ায় কয়েকটি তরুণ সমবেত হয়েছিলেন। উপলক্ষ্য ছিল আমেরিকান টমাস ডেভিডশনের বক্তৃতা শোনা। বক্তৃতার বিষয় ছিল Fellowship of a New Life। এই সভারই পরিণতি ঘটে একটি সমিতি গঠনে। এরই নাম হয় ইংলিশ ফেবিয়ান সোসালিষ্ট। গঠনের তারিখ ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৮৪। ইংলণ্ডের অর্থ নৈতিক

চিন্তাধারায় ফেবিয়ান সোসাইটি অল্প দিনেই প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৮৪৮ সালের কমুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো এবং তার ৩৬ বছর পরের ফেবিয়ান সোসাইটি সোসালিষ্ট জগতের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে স্বীকৃত। অর্দ্ধ শতাব্দির সংঘর্ষে ফেবিয়ান সোসালিজম অধিকতর জয়যুক্ত হয়ে এসেছে।

মার্কসিজম ও ফেবিয়ানিজমে প্রভেদ

১৮৬৫ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয়, আইন প্রনয়ণে তাদের প্রভাব এবং চুক্তির দ্বারা মজুরী নির্দ্ধারণের চেষ্টা। ভোটাধিকার তারা আগেই আদায় করেছে এবং ট্রেড ইউনিয়নকে আইন সঙ্গত করে নিয়েছে। বহু ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে বৃটিশ সংবিধান গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। গণতান্ত্রিক সংবিধানের ভিতর দিয়ে যে দেশের শ্রমিক শ্রেণী অর্থ নৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সুরু করেছে যেখানে সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারছে, সে দেশে বিপ্লব এবং শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। সোসালিজমের প্রধান উদ্দেশ্য কার্য্যে রূপায়িত করবার ভিন্ন উপায় তখন হাতে এসেছে।

যে গণতান্ত্রিক সমাজে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা সর্বসাধারণের হস্ত-গত হয়েছে সেখানে বিপ্লবের দ্বারা সর্বসাধারণের ক্ষমতা প্রয়োগের নতুন কোন পদ্ধতি সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। যে পুরনো পদ্ধতি প্রচলিত আছে তারই সাহায্যে বৈষম্য ও শোষণ নিবারণ এবং জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা অনায়াসে করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে সমাজ সংস্কারের জন্য এই অবস্থাকে কিরূপে কাজে লাগানো যাবে?

যে সমস্ত সামাজিক পাপ জনসাধারণের বাধা হয়ে থাকে,

ফেবিয়ানিজম-এর প্রতিনিধি সিড্‌নি ওয়েব তা প্রথমে অনুসন্ধান করলেন, তারপর এক একটি ধাপ ধরে ওর প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করলেন। প্রতিটি নির্দ্দেশ তিনি সোসালিজমের মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তৈরি করলেন এবং কিরূপে আইনের সাহায্যে তা কার্য্যে পরিণত করা যায় তা দেখিয়ে দিলেন। মার্কস বলেছিলেন যে, শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা ক্যাপিটালিজম সমূলে ধ্বংস না করতে পারলে সোসালিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। ফেবিয়ান সোসালিষ্টরা বললেন যে, না তা নয়, যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেখানে ওর ভেতর দিয়ে আইন প্রণয়ণের সাহায্যে শ্রেণী সংগ্রামে না নেমেই সোসালিষ্ট সমাজ স্থাপন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে সমাজ বিপ্লবের রক্তা-রক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

ফেবিয়ান সোসাইটি ঘোষণা করলো যে তাদের সংগঠন সোসালিষ্টদের সমিতি। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান তরুণদের অনেকেই এতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৮৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। সেই বছরই বার্ণার্ড'শ ওতে যোগ দেন। পর বছর এলেন সিডনি ওয়েব। তারপর একে একে এলেন গ্রাহাম ওয়োলাস, আনি বেশান্ত, এইচ, জি, ওয়েলস, বিয়েত্রিশ ওয়েব, রামজে ম্যাকডোনাল্ড, পেথিক লরেন্স, কেয়ার হার্ডি, জি, ভি, এইচ কোল প্রভৃতি। ১৯০৪ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত Harrow থেকে কেমব্রিজ পর্য্যন্ত জওহরলাল এ সোসাইটির সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সোসালিজমের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ভারতের তৎকালীন ভাবী প্রধান মন্ত্রী এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষেও সেই গণতান্ত্রিক সোসালিজমের প্রবর্ত্তন প্রয়াসী ছিলেন। অক্সফোর্ডে অবস্থানের সময়ে ইন্দিরা একাধারে সোসালিষ্ট সংগঠন এবং কম্যুনিষ্ট সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখেছিলেন। কী জওহরলাল, কী ইন্দিরা গান্ধী কেউই প্রলেটারিয়েট ডিক্টেটরশিপের প্রতি আকৃষ্ট হননি। মানবিক

অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা সে তো খাঁচায় আটকে থাকা পশু!

ফেবিয়ান সোসাইটির বিশেষত্ব ছিল ওতে অসীম ক্ষমতাশালী কোন পদ ছিল না। সে ধরণের পদ কম্যুনিষ্ট পার্টিতে থাকে। সোসাইটিতে সরকারী মুখপাত্রও কেউ ছিল না। Fabian Essays নামে যে পুস্তিকামালা প্রকাশ হত তাই সকল সদস্যের অভিমত বলে ধরা হত। সোসাইটির অসংখ্য বক্তৃতার মধ্যে সাতটি লেক্‌চার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। চারটিতে ব্যাখ্যা করা হল সোসালিজমের বনিয়াদ। বলা হলো সোসালিজমের বনিয়াদে আছে চারটি স্তম্ভঃ ঐতিহাসিক, অর্থ-নৈতিক, শিল্পনৈতিক এবং নৈতিক (Moral)। আর তিনটির মধ্যে দুটি লেক্‌চারে ভবিষ্যতের সোসালিষ্ট সমাজের কথা বলা হল এবং সপ্তমটিতে সোসালিজমের বিবর্তনের পথের সন্ধান দেওয়া (transition to Socialism) হল। সাতটি লেক্‌চার তৈরী করলেন, বার্ণার্ড'শ সিড্‌নি ওয়েব, উলিয়াম ক্লার্ক, সেভনি অলিভিয়ার, গ্রাহাম ওয়ালাস এবং আনি বেশান্ত এই ছয়জন।

১৮৮৪ সালে ফেডারেশন বললেন--সকল সম্পদের মূল হচ্ছে শ্রম সুতরাং সকল সম্পদের মালিক হলো শ্রমিক। সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেশন দাবী তুললো—প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার, সৈন্য বাহিনীর বিলোপ, বিনা ব্যয়ে শিক্ষা, অবাধ ন্যায় বিচার। ফেডারেশন বললেন—সম্পদ উৎপাদন জনসাধারণের স্বার্থে সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে, উৎপাদন বণ্টন ও বিনিময়ের সমস্ত উপায় সাধারণ সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হবে। সোসালিজমের দৃঢ় নৈতিক বনিয়াদ থাকতে হবে, তা কেবল মাত্র রাজ-নৈতিক এবং অর্থ নৈতিক স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না।

অলিভিয়ার দেখালেন যে সোসালিজম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিপরীত বা এন্টিথিসিস নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকেই সোসালিজমের জন্ম ব্যক্তিগত সংগ্রাম থেকেই সোসালিজমের উৎপত্তি। ব্যক্তি

স্বাতন্ত্র্যের আদর্শে উপনীত হবার জন্যেই সোসালিষ্ট পরিবেশ প্রয়োজন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ যখন যুক্তির ওপর সংঘটিত হয় এবং সেই ব্যক্তির মত যখন ন্যায় পরায়ণ হয় তখনই তাকে সোসালিজমের ব্যবস্থা বলা যায়। ব্যক্তিগত মালিকানার বর্ত্তমান অবস্থাকে অলিভিয়ার অনৈতিক (immoral) বলেছেন। এক শ্রেণী দ্বিগুণ খাটবে এবং অপর শ্রেণী বসে খাবে—এটা চলতে পারে না। সামাজিক নীতিবোধ বা সোসাল মরালিটি আনার উপায় হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষা।

গ্রাহাম ওয়ালাস বললেন যে সোসালিষ্টরা যে সমাজ ব্যবস্থা চায় তার চরিত্রের ওপর কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। সোসালিজমের এই সার কথাটি আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলে বসে আছি। সোসালিজমের বুলির ওপর আমাদের যত বেশী মোহ ওর বস্তুর প্রতি আমরা ততই উদাসীন। মরালিটি বা নীতিজ্ঞান বাদ দিয়ে সোসালিজম আনা যায়, মার্কসবাদের এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি এবং ঐ চোরা গর্ত্তে পড়ে কেবলই খাবি খাচ্ছি। মার্কসবাদের এই দারুণ ভুল ফেবিয়ান সোসালিষ্টরা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণেই সোসালিজমের সঙ্গে মরালিটির সম্পর্ক বিষয়ে এত বেশী ঝোঁক দিয়েছেন। এবং বলেছেন সমাজের স্বাভাবিক গতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ও গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে সমাজের গতির মোড় ঘুরিয়ে তাকে সোসালিজমের পথে চালিত করতে হবে

সংগঠনিক দিক থেকে ফেবিয়ান সোসাইটির বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে তর্কে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। বাইরের সমালোচনায় কখনো বিভ্রান্ত বা শ্রান্ত হতেন না তর্ক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তারা সত্যকে খুঁজেছেন, তার সন্ধান পেয়েছিলেন।

ফেবিয়ান সোসাইটির দীর্ঘ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু মাত্র মার্কসীয় সোসালিজমের পরবর্ত্তী সময়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের

ভূমিকা এবং তার দ্বারা পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে খাপ খেতে পারে ও রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়াও যে দেশ সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়াতে পারে তারই নজীর রাখা। ১৯৪২ সালে ফেবিয়ান সোসাইটির চেয়ারম্যান সমিতির যে আদর্শ ঘোষণা করেন, তা বলেই এ ব্যাপারে ইতি টানবে।

"আমরা বিশ্বাস করি সোসালিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে কোন এক স্থানে এমন একটি সংগঠনের প্রয়োজন রয়েছে, যা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবে, সেই নতুন চিন্তা অকুতোভয়ে প্রচার করবে। নতুন চিন্তাধারা অতীতে চিরাচরিত সোসালিষ্ট ভাবধারার বিপরীতমুখী হলেও তারা তা প্রচারে কুণ্ঠাবোধ করবে না। সোসালিজম কতকগুলি বাঁধা বুলি মাত্র নয় যে স্থান কাল বিচার না করে সর্বত্র ওর সমান প্রয়োগ চলবে। সোসালিজম হচ্ছে এমন কতকগুলি মূলনীতির সমষ্টি, পরিবর্ত্তিত অবস্থা এবং পরিবর্ত্তিত প্রয়োজন ক্রমাগত বিচার করে সেই আলোকে যার প্রয়োগ হতে থাকবে। অন্ধ বিশ্বাসকে নীতি বলে ভুল করার পলিসি এবং কর্ম্মসূচিকে অস্তি মাত্রে পর্য্যবসিত করার বিপদ সব সময় থাকে। কেবল মাত্র নতুন আলোচনা নতুন চিন্তার দ্বারাই নতুন সমস্যার নতুন সমাধানের পথ মিলে থাকে এবং তাতেই ঐ বিপদ কাটে।"

এর সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্ট জগতে আর একটি শব্দ বড় প্রকট ভাবে প্রচার হতে থাকে। যত্রতত্র যেমন খুশী রিভিসনিজম কথাটা প্রয়োগ হতে থাকে। কম্যুনিষ্ট সংগঠনের বিপক্ষে যারাই কিছু বলুক তাদের রিভিসনিষ্ট এই আখ্যা দেওয়া হয়। পৃথিবীর দুই বৃহৎ কম্যুনিষ্ট দেশের মধ্যে চীন রাশিয়াকে রিভিসনিষ্ট এবং রাশিয়া চীনকে হটকারী আখ্যা দিয়ে থাকে। ভারতে কেন সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে এ ধরণের আখ্যার দ্বারা পার্টি ভাগ হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের প্রচার এবং মার্কসের বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুযায়ী তাঁর ভবিষ্যতবাণী কেন সফল হয়নি, প্রলেটারিয়েট ক্লাশ কেন দিনের পর দিন টুকরো টুকরো

হয়ে যাচ্ছে, কম্যুনিষ্ট আন্দোলন কেন এক ঘেঁয়েমিতে ভুগছে—তা খতীয়ে দেখা একান্ত দরকার। রাশিয়া কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের পীঠ-ভূমি। বৈজ্ঞানিক দর্শনকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে তাদের অনেক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পথ পাল্টাতে হলে—তা কি কম্যুনিষ্ট আদর্শ থেকে বিচ্যুতি বোঝায়? মার্কস এঙ্গেলসের চিন্তাধারা পৃথিবীর বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় অপরিবর্ত্তনীয়তা গতি-শীলতার নীতিরই বিরোধীতা করে। ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন কেন গান্ধীবাদী আন্দোলনে পর্য্যবসিত তাঁরই অনুসন্ধান কমরেডরা গোঁড়ামী বর্জন করে করুণ। গোঁড়ামী ফ্যাসিজমেরই পূর্ব্বাবস্থা। সেই মতবাদ বা নীতিকেই সঠিক এবং কল্যাণমুখী বলবো, যা দীর্ঘ সময়ের চাপে পড়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে না। মতবাদের Rigidity তার ধ্বংসই ডেকে আনে। তাই রিভিসনিজম বলে কথিত বার্ণ ষ্টাইনের মতবাদকে তুলে ধরছি। আজ ইন্দিরাজী সমাজতন্ত্র চাইছেন,—তফাৎটা কোথায় দেখা দরকার। সমাজতন্ত্রের, ব্যাপারে কারও ওপর সোল এজেন্সি দেওয়া আছে কিনা তাও দেখা দরকার। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও দেশাত্মবোধ এই চারটি শব্দ ইন্দিরাজীর প্রাত্যহিক বক্তব্য। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাকী শব্দগুলো প্রতিকূল না সহায়ক তাও দেখা দরকার। প্রথম কথা একই সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্র আনা সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন দেশে তার প্রচলন প্রাথমিক ভাবে দরকার। এবং সেই দেশকে সমাজতন্ত্রে পরিণত করতে হলে দেশাত্মবোধ একান্তভাবে প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রে বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে না, কাজেই ধর্মনিরপেক্ষ দেশকে অতি অবশ্যই হতে হবে। তারপর প্রশ্ন গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা। এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় সম্ভব। এর আগেই ফেবিয়ান সোসাইটির সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় গণতন্ত্রের সহযোগিতার কথা বলেছি। এবার মার্কসবাদের প্রতি পূর্ণ

লক্ষ্য রেখে বার্ণষ্টাইনের সোসালিজমের বক্তব্য তুলে ধরাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ, স্বর্গত জওহরলাল এবং ইন্দিরাজীর ডেমোক্রেটিক সোসালিজমের বীজ সেখান আছে। কংগ্রেস নামধারী দলের পক্ষে সমাজতন্ত্রের পথে এগোন যাবে না এবং কম্যুনিষ্ট নামধারী দলের পক্ষে ধনতান্ত্রিক মনোভাবে পৌঁছানো যাবে না। এমন ভাবালুতা বর্ত্তমান যুগে উচিৎ হবে না। জাতীয়তাবাদী বুর্জ্জোয়ারা সমাজ তন্ত্রের পথে এগুতেই পারবে না এমন ধারণায় বিশ্বাসী হলে পৃথিবীতে কোথাও সমাজতন্ত্র আসার সম্ভাবনা খুব কম। কেননা, সমাজতন্ত্রের সংস্কৃতির আবির্ভাবের বহু আগেই বুর্জোয়া সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতিতেই পুষ্ট ব্যক্তিত্বের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক চিন্তা সম্ভব হয়, তাহলে জাতীয়তাবাদী সংস্থাও সমাজতান্ত্রিক সংস্থায় পর্য্যবশিতঃ হতে পারে। ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট নেতারা কোন সংস্কৃতি দ্বারা পুষ্ট ? তাঁরাও কী জাতীয়তাবাদী দল থেকে আবির্ভূত হননি ? তাঁরা যদি সমাজ তন্ত্রের ধারক বাহক হতে পারেন তবে ইন্দিরাজীর পক্ষে সমাজতন্ত্র চাওয়া কী বেআইনি ? একই পরিপ্রেক্ষিতে বার্ণষ্টাইনের বক্তব্য তুলে ধরছি।

রিভিসনিজম

কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে কারও মতভেদ ঘটলেই তারা তাকে শোধনবাদী বলে অভিহিত করে। এমন ভাষ দেখায় যেন ওটা খুব অন্যায় কাজ। মার্কসবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জকে বলা হয় শোধনবাদ বা রিভিসনিজম। ব্যাভেরিয়াব সোসাল ডেমোক্রাট জর্জ ফলমার প্রথম বলেন যে মার্কস-বাদ আভ্রান্ত নয়। এই চ্যালেঞ্জকে একটি নীতিরূপে গড়ে তোলেন এডোয়ার্ড বার্ণষ্টাইন। বার্ণষ্টাইন বললেন :

১) ক্যাপিটালিষ্ট পদ্ধতির ধ্বংস আসন্ন হয়নি। ক্যাপিটালিজমের ধ্বংসের সঙ্গে সামাজিক বিপর্য্যয় আসছে এটা ধরে নিয়ে অগ্রসর হলে ভুল হবে।

২) কমুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে সমাজ বিবর্ত্তনের ধারা সম্বন্ধে সাধারণভাবে যা বলা হয়েছে তা কিন্তু কতদিনে ঐ বিবর্ত্তনের পূর্ণ হবে সে সময়ের যে হিসেব দেওয়া হয়েছে তা ঠিক নহে। "ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম" গ্রন্থে কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর অন্যতম প্রনেতা এঙ্গেলস বার্ণষ্টাইনের এই মত মেনে নিয়েছিলেন।

৩) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীগত পরস্পর বিরোধিতা যত তীব্র হয়েছে বলে কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে বলা হয়েছে তা তত তীব্র হয়নি।

৪) সকল শিল্প সকল ক্ষেত্রে সমান হারে এবং সমান নিখুঁতভাবে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এই বিশ্বাস ভ্রান্ত। কোন কোন শিল্পের বেলায় তা খাটে কিন্তু সকলের বেলায় খাটে না।

৫) শ্রমিক শ্রেণীর চাপে ক্যাপিটালিষ্ট শোষণ প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আধুনিক দেশ সমূহে গণতান্ত্রিক সংগঠন যত দৃঢ় হচ্ছে—রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা ততই কমে আসছে। কোন একটি রাজনৈতিক বিপর্যায় (Political Catastrophe) না ঘটলে প্রলেটারিয়েট কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার সম্ভব হবে না—এটা বিচার সহ নয়।

৬) রাজনৈতিক ভয়াবহ বিপর্য্যয় ভিন্ন অন্য পথে দৃঢ় অগ্রগতি ঘটলে তবেই স্থায়ী সাফল্য আসবে।

এই ছয়টি সূত্রের ওপর ভিত্তি করে বার্ণষ্টাইন বললেন যে সোসাল ডেমোক্রেসিতে সকল সময় পরবর্ত্তী পদক্ষেপ কী অধিকার, শহরে ও গ্রামে শ্রমজীবী শ্রমিকদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং শিল্পজীবী-দের কাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামাজিক বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হতে হবে।

বার্ণষ্টাইন মার্কসের কয়েকটি মূলনীতি চ্যালেঞ্জ করলেন। মার্কসের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ তিনি করলেন না,

কিন্তু বললেন ওটা নিতান্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণে এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গতি নির্দ্ধারণে অর্থনীতি ভিন্ন অন্যান্য সামাজিক শক্তিও বিবেচনা করতে হবে। সামাজিক কার্য্যকলাপ কেবল মাত্র অর্থনৈতিক কারণের ওপরনির্ভর করে না, বিভিন্ন সামাজিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা তা নির্দ্দিষ্ট হয়।

মার্কসের মূল্য ও বাড়তি মূল্য নীতিকে বার্ণষ্টাইন অবাস্তব বলেছেন। মজুরীজীবী শ্রমিক যে উৎপাদন করছে তার পূর্ণ মূল্য সে পায় না, কেবল মাত্র এই তথ্যের ওপর সোসালিজম বা কম্যুনিজমের ভিত্তি গড়ে তোলা যায় না। তাছাড়া মার্কসের মূলনীতির বক্তব্য অনুযায়ী মধ্যবিত্ত সমাজ এখনও নিশ্চিহ্ন হয়নি, হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। বরং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে এদের ভূমিকাই মূখ্য। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সফল হবার স্বপ্নও এই মধ্যবিত্ত সমাজের জন্যে সোসালিজমের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, হবেও না। মুষ্টিমেয় ধনীর সম্পদ বৃদ্ধিতেই সোসালিজম আসবে।

মার্কস বলেছিলেন যে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের তীব্রতা ক্রমশঃ বেড়ে চলবে এবং অবশেষে তা সমগ্র ক্যাপিটালিষ্ট ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধ্বংস ডেকে আনবে। এঙ্গেলস আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন যে, মনোপলি ট্রাষ্ট গঠনের দ্বারা শিল্প পতিরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে, কিন্তু তার মধ্যে থাকবে অধিকতর শক্তিশালী ভবিষ্যৎ ধ্বংসের বীজ।

বার্ণষ্টাইন বললেন—বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ধ্বংস লীলার মধ্যে যে অচিন্তনীয় হানাহানি দেখা দেবে তার কোন লক্ষণ এখনও প্রকাশ পায়নি। দুই সঙ্কটের মাঝামাঝি সময়ে বানিজ্যের যে উন্নতি ঘটেছে তা যে অল্প দিন স্থায়ী হবে একথা বলা যায় না। বিশ্বের বাজার বৃদ্ধির সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান এবং মাল চলাচল সময় সংক্ষেপ হয়ে আসছে। এতে এক জায়গায় বিশৃঙ্খলা ঘটলে আর সব স্থানে তা

সামলে নেবার সুযোগ ঘটেছে। অতীতের সঙ্কট তত তীব্র না হবার সম্ভবনা দেখা দিচ্ছে।

পশ্চিম বাংলার ব্যপারে একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবো। অতীতের দুরবস্থা বা সঙ্কটের চাইতে বর্ত্তমানের সঙ্কট বা দুরবস্থা অনেক গুণ বেড়েছে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কট মানুষের মনে যে পরিমান তীব্রতা আনার কথা ছিল, দীর্ঘ সময় ধরে সঙ্কটের চাপের দরুণ তীব্রতা কমে এসেছে। কারণ কোন একটা অবস্থা তা যত বিরুদ্ধই হোক— কিছুদিন একভাবে চলতে থাকলে মানুষ তাতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক লেবেল লাগানো ব্যক্তিগত হত্যাগুলো যখন প্রথম প্রথম ঘটতে সুরু করে, তখন জনসাধারণ তা সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ড আজও একই ভাবে সংগঠিত হয়ে চলেছে যার বলি কম করে ১৫০০০ হাজার যুবক—আজ আমাদের ততখানি আতঙ্কিত করে না। সব সয়ে গেছে। দ্রব্য মূল্যের বিচারে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের চেয়ে বর্ত্তমানের অবস্থা আরও খারাপ, অথচ বর্ত্তমান সময়টাকে দুর্ভিক্ষের সময় বলে বুঝতে পারছিনা।

বার্ণষ্টাইনের উক্তির যথার্থ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। শিল্প প্রধান দেশ সমূহে অর্থ নৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়নি এবং বিশ্বব্যাপী সঙ্কট যাতে না আসতে পারে তার উপযুক্ত অর্থনৈতিক কৌশল সব দেশই আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং প্রয়োজনবোধে সহযোগীতার দ্বারা সঙ্কট এড়াচ্ছে। মার্কসবাদ অনুযায়ী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখা দিতে বাধ্য, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্ত্তী ইতিহাসে প্রমাণ হয়েছে যে সোসালিষ্ট অর্থনীতিও সঙ্কটমুক্ত নয় এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মতো এতেও সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

মার্কস কৃষি শিল্প রাষ্ট্রয়ত্ত করতে বলেছিলেন। বার্ণষ্টাইন দেখালেন যে কেবল মাত্র জার্ম্মানীতে যদি শিল্প ও বানিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হয় তাহা হলে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ শ্রমিক সমন্বিত প্রায় এক

লক্ষ বণিক প্রতিষ্ঠান সরকারের হাতে আনতে হবে এবং তিন লক্ষ কৃষি ক্ষেত্রের আরও ৫০ লক্ষাধিক লোকের দায়িত্ব নিতে হবে। তাহলে কি বিপুল পরিমান বিচার বুদ্ধি, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা শাসন প্রতিভা থাকলে তবে এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালন কোন সরকার বা জাতীয় পরিষদের পক্ষে সম্ভব হবে তাইই বিচার্য্য। সে তুলনায় ভারতবর্ষের কৃষি এবং শিল্প আয়তন অনেক অনেক গুণ বেশী। সে ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রতিটি ইঞ্চি ভারতের ওপর প্রক্ষেপ করা সম্ভব কিনা বিচার করা প্রয়োজন।

দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস মানুষের সাধারণ চাহিদা পূরণ করতে পারেনি, অন্ততঃ ১৯৫৭ সালের আগে পর্য্যন্ত। বর্ত্তমানেও জণসাধারণ নিম্নতম চাহিদা পুরণের সামগ্রি পাচ্ছে এমন কথা আমি বলিনা। তবে সালের পর থেকে উন্নতির সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়েছে। শিশু ভারতকে যাঁরা গড়ে তোলার কার্যভার নিয়েছিলেন, সে কাজ তারা যদি যথাযথভাবে করতেন তাহলে আজকে ইন্দিরাজীকে "গরীবী হঠাও" শ্লোগান দিতে হত না এবং প্রলেটারিয়েট সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখাও উঠে যেত। ভারতবর্ষের মানুষের অনেকখানি অংশ ধর্মের প্রচ্ছায়ায় থাকে। তাই তারা পুরোপুরি বস্তুতান্ত্রিক বা ভোগবাদী নয়। তাদের মানসিক গঠনের অনেকখানি অংশ অধ্যাত্ম পরিমণ্ডলে আবিষ্ট। সে কারণে তারা অঘটনকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে নিজেদের অনেক হাল্কা করে রাখে এবং যা পেলো তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। এমন অনুকূল অবস্থার সুযোগ পাওয়া সত্বেও পূর্বের কংগ্রেসী নেতারা জনসাধারণের সামান্যতম প্রয়োজন মেটায়নি বরং জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ ভারতের প্রধান মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, "দেশের সম্পদ কয়েকজন লোকের হাতে আছে" "গরীব আরো গরীব ও ধনী আরো ধনী হয়েছে"। অতীত কংগ্রেসের এই হৎকারীতার দরুণ, প্রলেটারিয়েট

সাম্রাজ্যের টনিক সাধারণের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। এটাও আরেক ধরণের প্রতারণা। কেননা, মার্কসবাদের সুষ্ঠু প্রচার এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগোবার জন্যে, দেশকে সমৃদ্ধিশালী করবার জন্যে গঠনমূলক কাজ ও সামাজিক কল্যাণমুখী বন্ধনকে দৃঢ় করার কাজ—এসব কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন নেতারা সঠিকভাবে করেননি। ক্ষমতা আয়ত্ত করার প্রতিযোগীতায় সবাই মেতেছে। ভাবখানা যেন এই, গদীতে বসতে না পারলে কিছুই করার নেই। কংগ্রেসি নেতারা দেশের গঠনমূলক কাজ ভুলে পৈতৃক গদী আঁকড়ে পড়ে আছেন, আর অন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা সে গদী হস্তগত করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত এবং এই ব্যস্ততার দরুণ আদর্শগত বিরোধ, খুনখারাপি, আবার ভোটের আগে আদর্শের জগা-খিচুরী পাকায়। সবার বক্তব্য তাদের লক্ষ্য ঠিক আছে, লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে পথ পাল্টাচ্ছে। শেষে প্রশ্ন দাঁড়ায়, পথ পাল্টাচ্ছে, না লক্ষ্য পাল্টাচ্ছে। আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলের হয়তো সবই আছে, নেই শুধু আদর্শ। আদর্শ থাকতে পারে না, কারণ সেটা ভাববাদী ব্যাপার এবং বুর্জ্জোয়া শিক্ষার ফল। দীর্ঘদিনের প্রবচন আছে All road leads to Rome, এখন সেটা দাঁড়াচ্ছে, সমস্ত রাজনৈতিক চিন্তা leads to Ministry।

প্রলেটারিয়েট সাম্রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে বার্ণষ্টাইন বলেছেন যে, এই সংগ্রামে জয়লাভের জন্য বহুবিধ বিঘ্ন রয়েছে। যাদের কোন সম্পত্তি নেই, অথবা সম্পত্তি থেকে কোন আয় নেই অথবা কোন বিশেষ সুযোগ ভোগের উপায় নেই তাদের সবাইকে ধরলে প্রলেটারিয়েটের মেজরিটি হবে নিঃসন্দেহে। তবে এই গোষ্ঠী বিভিন্ন গোষ্ঠীর এক বিচিত্র জগাখিচুড়ী মাত্র। ওর মধ্যে পেশা, শিক্ষা এবং সামাজিক মর্য্যাদার যে পার্থক্য থাকবে, তা প্রলেটারিয়েটকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে দেবে না। কেবল শিল্প প্রলেটারিয়েট ধরলে সমগ্র সমাজে

তারা মাইনরিটি হয়ে পড়বে। বার্ণষ্টাইনের সময়ে জার্মানীতে ১ কোটী ৯০ লক্ষ বিভিন্ন শ্রমজীবীর মধ্যে ৭০ লক্ষ ছিল শিল্পের শ্রম-জীবী। এবং তিনি একথাও বলেছেন যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা একমাত্র সমাজ কল্যাণের আদর্শ নিয়ে উৎপাদন করবে একে বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা না বলে আন্দাজ বলে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত। কথাটা কতখানি সত্য তা বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দিকে তাকালে ধরা যায়। বার্ণ ষ্টাইনের মতে, সোসালিষ্টদের হাতে শাসন ক্ষমতা এলেও নতুন সরকার সকল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা ত দূরের কথা, কেবলমাত্র বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলিকেই হাতে আনতে পারবে না। বৃহৎ শিল্পও ব্যবসা বিনা খেসারতে কেড়ে নেওয়া সম্ভব কিন্তু কম্যুনেরা তা চালাতে পারবে না, ও সবের পরিচালন ভার পুরানো মালিকদের হাতে লীজের সর্তে ছেড়ে দিতে হবে।

সোসালিজম প্রতিষ্ঠার জন্য বার্ণ ষ্টাইন প্রলেটারিয়েটের ডিক্টেটর-শিপ অপেক্ষা গণতন্ত্রের ওপর বেশী নির্ভর করেছেন। সমাজে গণ-তান্ত্রিক শক্তির মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের ওপর তিনি বেশী ঝোক দিয়েছেন। তবে এ কথা বলেছেন যে গণতন্ত্রে শিল্প নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ট্রেড ইউনিয়নের হাতে দেওয়া যেতে পারে না। ওটা উৎপাদনের একটা সংগঠন মাত্র হবে।

বার্ণষ্টাইন বলেছেন: রক্তাক্ত বিপ্লবের বিকল্প হচ্ছে—প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার। মার্কস রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া সমাজে শোষণ অবসানের আর কোন পথ দেখতে পান নি। তার কারণ নরনারী নির্বিশেষে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। বার্ণ ষ্টাইন বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রদত্ত হলেই জাতির মুক্তি আসবে না, ওটা গণতন্ত্রের একটা অংশ মাত্র। লোহার টুকরো খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়লে চুম্বক যেমন সেগুলোকে আকর্ষণ করে একত্রিক করে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার তেমনি গণতন্ত্রের অন্যান্য

বিচ্ছিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে। অনেকে এই অধিকার যত দ্রুত চান তত দ্রুত ওটা চলে না। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর গতি নিশ্চিত এবং অমোঘ। সামাজিক গণতন্ত্রের সঙ্গে ডিক্টেটরশিপ খাপ খায় না। তাঁর মতে কোন শ্রেণী বিশেষের ডিক্টেটরশিপ অনুন্নত সভ্যতার পরিচায়ক। ওর দ্বারা আপাত স্বার্থসিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু ওকে বিপরীত গতি বলে অভিহিত করা যায়। সোসাল ডেমোক্রেসির একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজের নিম্নমান ঠেলে উচ্চমানে উন্নিত করা উচ্চমানকে টেনে নামানো নয়।

বার্ণষ্টাইনের মতে গণতন্ত্রে কোন একটি শ্রেণীর শাসন কায়েম হবে না, আবার শ্রেণী বিশেষকে সম্পূর্ণরূপে দাবিয়ে রাখার কাজও তার হবে না। গণতন্ত্রে ভোটদানের অধিকারের ফলে সমাজের সকল লোক কার্য্যতঃ রাষ্ট্রের অংশীদার হয়ে পড়ে এবং অংশীদারিত্ব প্রকৃত অংশীদারিত্বে পরিণত হয়। তিনি বলেছেন যে, সংখ্যায় এবং সংস্কৃতিতে যে দেশ অনুন্নত, জনসাধারণের ভোটাধিকার দীর্ঘকাল সেখানে কসাই বাছাই করার অধিকারে পর্য্যবসিত হয়ে থাকে (With a working class under developed in numbers and culture the general right to vote may long appear as the right to choose the 'butcher'. শ্রমিকদের সংখ্যা এবং জ্ঞান যখন বাড়তে থাকে তখন ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে ; তখনই জন প্রতিনিধিরা প্রভু না হয়ে প্রকৃত সেবকে পরিণত হয়।

বার্ণষ্টাইনের মতে মার্কসের রচনায় একটি দ্বৈতবাদ আছে। একদিকে তিনি বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের কথা বলেছেন, অপরদিকে কোন বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করার বহু আগে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। বার্ণষ্টাইন বলেছেন, নিয়মতান্ত্রিক পথে যে সকল অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত হয়ে থাকে তাই স্থায়ী হয়, যদিও নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতি একটু মন্থর। নিয়মতান্ত্রিক পথে আইন প্রণয়নে শান্তির

সময়ে ভাবপ্রবণতা অপেক্ষা বুদ্ধি অধিক কার্য্যকরী হয়; আবার বিপ্লবের সময় ভাবপ্রবণতা বুদ্ধির ঊর্দ্ধে স্থান গ্রহণ করে। ভাবপ্রবণতার নেতৃত্ব অসম্পূর্ণ হয় কিন্তু বুদ্ধির চালনা মন্থন হলেও স্থায়ী এবং কার্য্যকরী হয়। বিপ্লবের দোষ হচ্ছে হুড়োহুড়ি, আইন প্রণয়ণের দোষ হচ্ছে দীর্ঘসূত্রিতা। Legislation works as a systematic force, revolution as an elementary force.

বার্ণষ্টাইনের শেষ কথা ছিল এই যে যাঁরা সোসালিষ্ট সমাজ সংগঠনে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা যেন ওপর থেকে নেমে আসা কতকগুলি গোঁড়ামি পূর্ণ অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা চালিত না হন। অবস্থা ও ঘটনার তাৎপর্য্য অভিনিবেশ সহকারে বিচার করে ওর ওপর যেন কর্তব্য স্থির এবং নীতি নির্দ্দেশ করেন।

বার্ণষ্টাইনের শোধনবাদ বা রিভিসনিজম সোসালিজমের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এ অভিযোগ সত্য নয়। উনি সোসালিজম প্রতিষ্ঠার একটি যুক্তিসঙ্গত পথ নির্দ্দেশ করেছিলেন। বিপ্লবের নামে তিনি ভাবপ্রবণতা অপেক্ষা নিয়মতান্ত্রিক পথে বুদ্ধির সাহায্যে বিনা রক্তপাতে স্থায়ী সোসালিজম আনার উপায় দেখিয়ে গেছেন। কাউটস্কী বার্ণষ্টাইনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মতবাদ ভ্রান্ত এটা প্রমাণ করতে পারেন নি। বরং বার্ণষ্টাইন মার্কস এঙ্গেলসের যে সব ভুল দেখিয়েছেন, তার কতকগুলি কাউটস্কী এবং হিওম্যান স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষও আজ সমাজবাদের পথে এগুতে চাইছে। চাইছে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজবাদ। আপাতভাবে, এই মুহূর্তে বোঝা সম্ভব নয় সমাজবাদ কতখানি ফলপ্রসূ হবে বা বর্ত্তমান ইন্দিরা সরকার সোসালিজমের সঠিক পথে কতটা এগুতে পারবেন। ১৯৫৭ সালে ইন্দিরাজী প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সময়টা নিঃসন্দেহে ইন্দিরাজীর প্রস্তুতি পর্ব। জওহরলাল গণতান্ত্রিক

সোসালিজমের স্বপ্ন দেখেছিলেন সত্য কথা, কিন্তু বাস্তব করে তোলা সম্ভব হয়নি, কারণ কংগ্রেসদল সঠিক ভাবে সমাজতন্ত্রের অনুগামী ছিল না। দীর্ঘ কালের কংগ্রেস চরিত্রের মধ্যে সোসালিজমের ভাসাবাসা চিন্তা ছাড়া, কার্য্যকরী কোন পন্থা ছিল না। বৃহৎ শিল্পে প্রস্তুতি থাকলেও সোসাল অর্থনীতির প্রস্তাবনা ছিল না। সবকিছু এক জগাখিচুরী পর্য্যায়ে ছিল। "লাঙ্গল যার জমি তার" এই শ্লোগান কংগ্রেসের আদি শ্লোগান, কিন্তু মূল্যহীন। লাঙ্গল হাতে থাকলেই আর জমি থাকলে কৃষির উন্নতি হবে তার নিশ্চয়তা নেই। ভারতবর্ষের সমগ্র মানুষকে সম পরিমাণে জমি বিলি করলে, কতটুকু করে প্রত্যেকের ভাগে জমি পড়বে এবং তার দ্বারা সমগ্র জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব কিনা, একথা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভেবে দেখা দরকার। মানসিকতার খাতীতে যেখানে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা চলবে না, সেখানে ক্রমবর্দ্ধমান জন সংখ্যার গ্রাসাচ্ছাদন হবে কি 'লাঙ্গল যার জমি তার' এর ভিত্তিতে? অর্থ নৈতিক ব্যপারে সেদিনের কংগ্রেসের সঠিক কোন ধারণাই ছিল না। আর বামপন্থী নেতৃত্বেরও সেই একই অবস্থা। বাড়তি জমি চাষীর হাতে বিলিয়ে দেবার পরিকল্পনা। সেটা কংগ্রেস শ্লোগানেরই নামান্তর। যৌথ খামার ব্যবস্থা না হলে খাদ্যে ভারতের সম্পূর্ণতা এবং কৃষিজীবীদের উন্নতি এই ঘন বসতিপূর্ণ ভারতে হওয়া দুঃসাধ্য। কেন ইন্দিরাজীকে ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৯ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো, তার আলোচনা দরকার। নইলে তিনি যে সমাজতন্ত্রের দিকে পা বাড়িয়েছেন এটা বোঝা মুস্কিল হবে।

ইন্দিরাজী নিশ্চয়ই বোঝেন ভাবাবেগের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। সমালোচনার দ্বারা সত্য উদ্ঘাটনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। সে হিসাবে ইতিহাস অধ্যয়ন দরকার এবং সে ইতিহাসের বিচারে ভক্তি ভালোবাসার ওপর যদি আঘাত আসে, তবে বৃহত্তর দেশের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার কঠোর সমালোচনা একান্ত কর্তব্য।

আমার লেখায় কংগ্রেসের সেই ত্রুটিগুলোর উল্লেখ করবো প্রয়োজন বোধে মহান নেতৃত্বকেও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই দেবো না। কারণ, জাতীয় কংগ্রেস ভারতবাসীর কল্যাণ করতে পারে এ বিশ্বাস জনসাধারণের আছে। আছে বলেই ২৫ বৎসর ধরে কংগ্রেস ভারত সরকার গঠন করে চলেছে। অতীত নেতৃত্বের মাপ-কাঠিতে বিচার না করলে ইন্দিরাজীর নেতৃত্ব সঠিক একথা বলা যায় না। তাই অতীত নেতৃত্বকে টেনে আনতে বাধ্য হচ্ছি।

কংগ্রেসের সভ্য হতে হলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূতা কাটতে হবে এই ছিল গান্ধী প্রবর্ত্তিত কংগ্রেসের সভ্য হবার নিয়ম। এতেই বোঝা যায় ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে কংগ্রেস কত দুর্বল। এই সূতা কাটার ব্যাপারে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে আধ ঘণ্টা সূতা কাটার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কবি জবাব দিয়েছিলেন, এতে যদি দেশের সাহায্য হয়, তবে সাড়ে আট ঘণ্টা কেন সূতা কাটবো না ?

এই বক্তব্য থেকে প্রথম ধারণা হয় কংগ্রেস কখনো বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান ছিলনা। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া গান্ধীজীর ওপর যে ভাবে কাজ করেছিল সেটা ভাবপ্রবণতা। সহিংস আক্রমণের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন কংগ্রেসকে একই অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। অহিংস আন্দোলনের ডাকে যেভাবে সমগ্র ভারত-বাসী সাড়া দিয়েছিল, নিছক পরিকল্পনার অভাবে তা কখনো কার্য্যকরী রূপ নিতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীন হবার ব্যাপারে অহিংস আন্দোলনকে মুখ্য চরিত্র ধরা হয়। সঠিক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বৃটিশ কখনো গান্ধীজীকে ভয় পায়নি এবং তার অহিংসাকে পরোয়া করেনি। বৃটিশ চিন্তিত হয়েছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসকে নিয়ে এবং ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগঠনগুলোকে নিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হবার পেছনে একটা গুরুতর ঘটনাই হলো বহি-ভারত থেকে নেতাজীর আঘাত হানা। আর ভারত বিভাগের দায়িত্ব

গান্ধীজীর। তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। কেননা, সারা ভারতে উত্তাল তরঙ্গের মতো গণ আন্দোলন যিনি গড়ে তুলতে পারেন, কংগ্রেসের পরোক্ষ নেতৃত্ব যখন তাঁরই হাতে—তখন সে আন্দোলনের ডাক না দিয়ে চুপ করে থাকার অর্থ দেশ বিভাগকে সমর্থন জানানো। যদি সত্যি সত্যিই গান্ধীজী রাজনীতি থেকে, আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন এটা ঘটনা হয়; তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাবার জন্যে আন্দোলনে নামলেন কেন? এতেই বোঝা যায় দেশ বিভাগে তাঁর সম্মতি। আর দেশভাগ না হলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে থাকবে বলে যাঁরা সেদিন মন্তব্য করেছিলেন? তাঁদের যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না এটা আজ দিবালোকের ন্যায় সত্য। কারণ, দেশ ভাগ হবার পরও সে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেশ কয়েকবার হয়েছে।

দল গঠনের বেলায়ও গান্ধীজী নিজের প্রয়োজনে জাতীয় কংগ্রেসকে প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা বৈপ্লবিক দলে পরিণত হতে দেন নি। তাঁর মত অভ্রান্ত একথা যেমন বলা চলে না, তেমনি তাঁর মতের অনুগামী থাকতে অন্য নেতৃত্বকে বাধ্য করায় এক নায়কত্বের প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে। জওহরলাল নেহরুর মধ্যে যে প্রচণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিল, ছিল, প্যাটেলের মধ্যে যে সংগঠনিক ক্ষমতা ছিল তার কোনটাকেই কাজে লাগাতে দেননি, পাশ্চাত্য উদার গণতন্ত্রে গান্ধীজীর কোন বিশ্বাস ছিল না, আধুনিক সরকার সম্পর্কে তাঁর ধারণা অত্যন্ত আবছা ছিল এবং অর্থনৈতিক জীবনের মূল উৎসগুলি সম্বন্ধেও তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান অত্যন্ত কম ছিল। কিন্তু একটি ক্ষমতা তাঁর খুব বেশী ছিল; বিভিন্ন জাতের চরিত্রকে তিনি মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারতেন। কোন রকম বৈপ্লবিক উদ্যম থাকলে তাকে নিঃশেষে শুষে নিতে পারতেন। লোক বেছে নেবার অদ্ভুৎ ক্ষমতা গান্ধীজীর ছিল। তাঁর সংস্কারবাদী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তিনি কংগ্রেসকে একটি আন্দোলন যন্ত্রে পরিণত

করতে চেয়েছিলেন এবং এই জন্যে এমন একজনকে বেছে নিয়েছিলেন যাঁর চাষীর ঘরে জন্ম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় যিনি শিক্ষিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও চাষীদের খুব ঘনিষ্ঠ। ইনিই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। অপরজন তাঁকে বেছে নিলেন, তিনি হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। হ্যারোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এ্যারিষ্টোক্রাট এবং আইডিয়ায় যিনি ফেবিয়ান সোসালিষ্ট। অধুনিক তরুণদের আকর্ষণ করার সত্যিকার ক্ষমতা ছিল জওহরলালের। প্যাটেল চিন্তশীল ততখানি নয়, যতখানি কর্মী। নেহরু চিন্তাশীল, বৈপ্লবিক ধারণাপুষ্ট, অর্থ নৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা তাঁর ততখানি ছিলনা। নেহরুজী গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়াশীলতার সমালোচনা অনেক সময় করেছেন বটে কিন্তু তাঁর সঙ্গে সম্পৃর্ক ছিন্ন করে প্রকৃত বৈপ্লবিক কর্ম-পন্থা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি।

ইংরেজ বুঝেছিল গান্ধীজী হতে তাদের ভয়ের বিশেষ কারণ নেই। তারা জানতো গান্ধীজী পাশ্চাত্য বিরোধী সংস্কারক মাত্র। যতদিন কংগ্রেস নেতৃত্ব গান্ধীজীর হাতে থাকবে ততদিন শাসকবর্গের ভয়ের কিছু নেই। আইন অমান্য আন্দোলন যতদিন অহিংস থাকবে ততদিন গবর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ভয়োলেন্স যাতে না ঘটে তা দেখাই ছিল গান্ধীজীর এক মাত্র কাজ, বৃটিশ সরকারেরও ছিল সেই একই অভিপ্রায়। ছোটখাটো ভয়োলেন্স বন্ধ করার ক্ষমতা সরকারের ছিল কিন্তু গান্ধীজীর হাত থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব সরে গেলে কংগ্রেস প্রগতিশীল ও ভায়োলেন্ট লোকদের হাতে চলে যাবে। দেশব্যাপী বিদ্রোহ সুরু হয়ে গেলে তা নিবারণের ক্ষমতা ভারতের বৃটিশ সরকারের ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী এবং পাশ্চাত্যপন্থা বিপ্লবীদেরই গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত ভয় করতো এবং তাঁদের ওপর খুব কড়া শাসন প্রবর্ত্তন করতো। আইন অমান্য আন্দোলন যে সময়ে বিদ্রোহের প্রান্তে গিয়ে পৌছেছিল, সে সময় গান্ধীজী তা প্রত্যাহার করে নিলেন।

এতে নাকি বৃটিশ বিবেক জাগ্রত হবে! জওহরলাল নেহরু পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। অবাক হয়েছিলেন রঁমা রোঁলার মতো মণীষাও। ১৯২৭ সালের নভেম্বরে টাইমস অফ ইণ্ডিয়া লিখল: "কংগ্রেস একেবারে ধ্বসে গেছে, কংগ্রেসের নীতি একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, দায়ীত্বশীল রাজনৈতিক আইডিয়া মগজে আছে এমন একটি লোকও কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে নেই। মনে হয় এইটিই সত্য।" ১৯৩০ সালের গোল টেবিল বৈঠকের সময় গান্ধীজী বললেন "আমি আমার অন্তরের বাণী শুনেছি।" একটি লোকও সেদিন প্রশ্ন করলেন না যে "বাণীটা কি ঠিক শুনেছেন?" দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে এ ধরণের ধর্মীয় ক্রিয়ার কোন স্থান আছে কি? ধর্ম মানুষকে চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, কল্যাণমুখী করে তোলে। আন্দোলন পরিচালনের ক্ষেত্রে তার দাম কতখানি।

ইন্দিরাজী নিজেও খুব ধার্মিক একথা আমার জানা আছে। সন্ত সমাপ্ত ভারত-পাক যুদ্ধের সময় যদি ইন্দিরাজী তেমনি কোন অন্তরের বাণী শুনে চুপচাপ বসে থাকতেন, তবে অবস্থা কি দাঁড়াতো। পশ্চিম বাংলায় সন্ত্রাস বন্ধের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কি আজ অহিংস হয়ে আছে, না থাকতে পারে?

লবন সত্যাগ্রহকে গবর্ণমেণ্ট গান্ধীজীর বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছিল, সর্দারজী ও নেহরুজীকে গ্রেপ্তার করা হলো, কিন্তু গান্ধীজীকে ধরলো না। আইন অমান্য আন্দোলন গান্ধীজীর হাতের বাইরে চলে গেলে তা ভায়োলেট বিপ্লবে পরিণত হবে, এই আশঙ্কায় গভর্ণ-মেণ্ট এমনভাবে লোক গ্রেপ্তার করতে লাগলো যে যাতে গান্ধীজীর ক্ষমতা আরও বাড়ে। ইংরেজের এই পলিসি সফল হয়েছিল। গান্ধীজীর আন্দোলন বিপ্লব আন্দোলনের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অপর দিকে মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা অনেকদিন আগে কংগ্রেস প্লাটফরমে থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন মত পোষণ

করতেন এবং ভায়োলেট আন্দোলনের পক্ষপাতি ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে যে স্বতন্ত্র প্রগতিশাল এবং বৈপ্লবিক ভাবধারার উপদল গড়ে উঠেছিল তার উপর বৃটিশ আক্রমণ ছিল কঠোর। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনায় বিপ্লববাদীরাই স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে। মুখ্যত তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত যুক্তিবাদী এবং ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের রূপ পরিকল্পনা তারাই করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে সে বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে মনে হলেও, বৃটিশ সরকার এই সন্ত্রাস-বাদীদের ভয় পেতেন। শেষ মুহূর্তে তড়িঘড়ি ভারতকে স্বাধীনতা দেবার পেছনে ভয়টাই বেশী কাজ করেছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং ভারতের সেই বিপ্লবীদের আন্দোলনের কথা এই স্বল্প পরিসর জায়গায় বর্ণিত করা সম্ভব নয় তাঁদের প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্যে গ্রন্থের প্রয়োজন। আমার এই লেখার মূল উদ্দেশ্য কংগ্রেস নেত্রী হিসাবে ইন্দিরাজীর নেতৃত্ব প্রশ্নাতীত কিনা এবং তাঁর দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা।

গান্ধীজী সমান সমান কংগ্রেস দল। সুতরাং তাঁকে অনুধাবণ করলেই কংগ্রেস চেনা হয়ে যায়। গান্ধীবাদ কোন সার্বজনীন মতবাদ নয়, বলা চলে Doctrin. তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। সেই ঈশ্বর বিশ্বাসকে তিনি রাজনীতি বানাতে চেয়ে ছিলেন! রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, কূটনৈতিক ধারণা ধর্ম বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। স্বয়ং দেবাদিদেব কৃষ্ণকেও কূটনীতির ছলাকলায় অংশ নিতে হয়েছিল এবং প্রয়োজন বোধে যুদ্ধের ঝুঁকি। অহিংস যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে সে অহিংসার দ্বারা দুর্যোধনের মানসিক পরিবর্ত্তন আনা যেত না?

স্বাধীনতার পর যে কংগ্রেস দলের হাতে ভারতের শাসনভার এলো, সেই সংগঠনের দেশ শাসনের যোগ্যতা নেই বললেই চলে। স্বাধীনতা পূর্ব প্রচারের দ্বারাই স্বাধীনতা পরবর্ত্তী কংগ্রেস মানুষের কাছে প্রয়োজনের প্রতিষ্ঠান। একটু ক্ষতিয়ে দেখলেই বোঝা যায়,

সংগঠনকে জোরদার করে যে যুবশক্তি তারা প্রায় সব সময়েই কংগ্রেসের বাহিরে ছিল। কারণ, কংগ্রেসকে তাঁরা ভাবতো An old useless furniture। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্যে যে সাংগঠনিক প্রতিভার প্রয়োজন ছিল তা কংগ্রেসে ছিল না। পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করার মতো কংগ্রেসকে ভোগ করেছে; নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে গান্ধীনীতিকে অশ্রদ্ধা করে গান্ধীকে দেবতা বানিয়েছে, জনসাধারণকে প্রতারণা করেছে। অর্থ নৈতিক অবনতি চরম পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। স্বাধীন শিশু ভারতবর্ষ অপুষ্টি জনিত রোগে ভুগছে। কংগ্রেস সংগঠন যেহেতু জোরদার নয়, সেহেতু কংগ্রেস গঠিত সরকারও জোরদার নয়। সে সুযোগে সারা ভারত ব্যাপী এক বিরাট নষ্টামীর প্রতিযোগীতা সুরু হয়ে যায়। চুরি, চুরি আর চুরি। স্বাধীন ভারতবর্ষের এই হলো ইতিহাস। শিক্ষায়তন থেকে সুরু করে মুদী দোকান পর্য্যন্ত, ঔষধ কারখানা থেকে মন্দির পর্য্যন্ত—সর্বত্রই একই ইতিহাস। কী কংগ্রেস কী বামপন্থীদল সবাই এই নরমেধ যজ্ঞে শকুনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। বামপন্থীদের দায়ী করছি এই কারণে যে প্রাচীন পন্থী, অসংগঠিত একটি দলের প্রকৃত বিরোধিতাই তারা করতে পারেননি বলে। এমন অনেক আন্দোলন তারা বেছে নিয়েছিলেন, যে আন্দোলন পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকেই পুষ্ট করে। ভোটরূপ মহাযজ্ঞের অংশিদার হতে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন, আর সে টাকা আদর্শগত পথে আসে না।

১৯২৪ সাল থেকে ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট আন্দোলন যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেলো কেন? এ প্রশ্নের সত্য জবাব কেউ দেবেন? বর্ত্তমান নেতৃত্ব পূর্বের নেতৃত্বের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই খালাশ। পরবর্ত্তী নেতৃত্ব বর্ত্তমান নেতৃত্বের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিষ্কৃতি পাবে। ১৯২৪ সাল থেকে তারা কংগ্রেসের বামপন্থী দলকে সমর্থন করলেন না কেন? আর কেনই বা সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলালেন না?

সমগ্র বিপ্লব কী কম্যুনিষ্টদের লক্ষ্য নয়। গান্ধীজী কি সুভাষ চন্দ্রের চাইতেও বেশী কম্যুনিষ্ট বা সোসালিষ্ট ভাবাপন্ন ছিলেন? এমনি আরো হাজারো প্রশ্ন কম্যুনিষ্ট দলকে করা যায়। মার্কসীয় আদর্শ কী সে প্রশ্নে না গিয়েও ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট দলকে অনেক প্রশ্ন করা চলে। কম্যুনিষ্ট দল গঠন হলেই তা মার্কস লেনিনের আদর্শবাদী দল হয়েছে, এটা মুখে বা পলিটব্যুরোর বিবৃতিতে প্রমাণ হবে না, প্রমাণ করতে হবে কাজের মাধ্যমে। আজ পর্য্যন্ত তারা সেটা প্রমাণ করতে পারেনি। যখনই আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তারা, আন্দোলন যখন তীব্র থেকে তীব্রতর অবস্থার দিকে ধাবিত, তেমন সময়ে সম্ভবতঃ বামপন্থী নেতৃত্ব গান্ধীজীর মতো অন্তরের বাণী শুনে আন্দোলন প্রত্যাহার করতেন এবং যথারীতি অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতেন। ১৯৪৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের কথাই ধরা যাক। পশ্চিম বাংলার সে রূপ আজও অকল্পনীয়। যুবকরা পুলিশের সামনে বুক খুলে দাঁড়িয়ে। নিবিচারে লোক মরেছে, সমাজ থেকে কংগ্রেসম্যান এবং পুলিশকে সাধারণ মানুষ বয়কট করেছে। যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংগ্রেস হটানো বামপন্থী দলগুলির একমাত্র লক্ষ্য হতো এবং নিজেরাই ক্ষমতা খায়ত্বের দ্বারা দেশের উন্নতি করার বাসনা রাখতো—তবে সেই ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসের খাদ্য আন্দোলন ছিল তাদের কাছে একমাত্র সুযোগ। এমন সুযোগ বামপন্থী দলের হাতে কোনদিন আসেনি, আসবেও না। তবে সেদিন তারা সে কাজ করতে পারলেন না কেন? কারণ, জনসাধারণের সঙ্গে পারমানেন্ট বিরোধী নেতার বিশ্বাসঘাতকতা। বামপন্থী নেতৃত্বের স্মৃতিশক্তি দুর্বল না হলে আমার কথাগুলো স্মরণ করুন।

১৯৪৬ সালের খাদ্য আন্দোলন কংগ্রেস সরকারের দুর্বল খাদ্যনীতির সামগ্রিক ফল। রেশন ব্যবস্থায় নগন্য খাদ্য সরবরাহ এবং পরিত্যাক্ত খাদ্য সামগ্রী এক বিরাট হট্টচট্ট সৃষ্টি করে। সর্বদলীয়

সংগ্রাম সমিতির আবির্ভাব তখনই। জ্যোতিবাবু প্রমুখ বৃহৎ নেতৃবৃন্দরা জেলখানায় সরকারি রাজসিক খানায় মগ্ন। বিধানসভায় এক অভূত-পূর্ব ঘটনা তখন চলছিল। দ্বিতীয় সারির সামান্য সংখ্যক নেতারা হৈ চৈ চেঁচামেচি করে সরকারি কাজে বাধার সৃষ্টি করছিল। দক্ষিণ কম্যুনিষ্ট এম, এল, এ, গোপাল ব্যানার্জী তখন বিরোধি নেতা। জেলের বাহিরে কাশীকান্ত মৈত্র তখন সব চাইতে জঙ্গী নেতা। জনতার হাতে সরকার যখন বিপর্য্যস্ত, সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি, আড়াই কেজি চালের দাবীতে জনসাধারণের যখন মুখর; সেই সময় একমাত্র রাজবন্দী শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু ছাড়া পেলেন জেল থেকে। ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন বামপন্থী নেতার সঙ্গে পরামর্শ না করেই 'তিষ্ঠ' বলে দিল্লী চলে গেলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১০০ গ্রাম গম আদায় করে ফিরে এলেন। খাদ্য আন্দোলন থেমে গেলো। আন্দোলনের ইতিহাস এ কথাই বলে যে, একবার আন্দোলন থামলে তাকে পুণরুজ্জিবীত করা দুঃসাধ্য। সেদিন পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল জ্যোতিবাবুর জন্যে।

এত দুর্বল বামপন্থা দল থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস দিনের পর দিন গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। কংগ্রেসের শক্ত ঘাটি কেন্দ্রে কংগ্রেস বিরোধী দলের প্রভাব বাড়াতে লাগলো। যদি ইন্দিরার আবির্ভাব ভারতের রাজনীতিতে না হতো, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় ১৯৫২ সালে কংগ্রেস নামক কোন দলের অস্তিত্ব থাকতো না। কিন্তু ঘটনা আজ অন্যরকম। ১৯৫২ সালের কংগ্রেস সত্যিই আজ ভারতবর্ষে নেই। যা আছে তা কংগ্রেস নামধারী নতুন চিন্তা, নতুন অস্তিত্ব। আর এটা সম্ভব হয়েছে ভারতের জোয়ান অব আর্ক শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর জন্যে।

সর্ব ভারতীয় এতবড় একটা রাজনৈতিক দল এমনভাবে গুঁড়িয়ে বসল কেন? এটা তলিয়ে দেখা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ নেতৃত্বের

জোরে কংগ্রেসের সুনাম আজ অনেকখানি বেড়েছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু জোয়ারের জলের মতো এই বৃদ্ধি যদি ক্ষণস্থায়ী হয়, তাহলে অবস্থা আরও খারাপ হবে। প্রতিক্রিয়াশীল এবং দেশদ্রোহীদের কারবার তখন একচেটিয়া ব্যবসার রূপ নেবে।

স্বাধীনতা পরবর্ত্তী কংগ্রেসে সংগঠনের কাজ বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। সারা ভারতবর্ষে কতিপয় কংগ্রেসম্যান ছিলেন, যাঁদের চিন্তা এবং কর্ম ক্ষমতার দ্বারা কংগ্রেস সারা ভারতবর্ষে সংগঠিত হয়েছিল। সেদিন কংগ্রেস সংগঠনে দেশ উদ্ধারের প্রশ্নটাই বড় ছিল। দেশ শাসনের সময় অর্থ নৈতিক কাঠামো কেমন হবে, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থানের দুর্ভাবনা—এ সব ছিল না। কাজেই তখনকার সংগঠনের মূল বক্তব্যই ছিল দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে তোলা। তাতে তৎকালীন কংগ্রেস সফল হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর শাসন ক্ষমতা যখন কংগ্রেসের হাতে এলো, তখন পুরনো পদ্ধতি বন্ধ হয়ে গিয়ে নতুন ধ্যান ধারণা এবং বিপাকে পড়ে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেলো। কারণটা আর কিছুই নয়। বিরোধীতা করার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একবার সজাগ হলে শাসন করার বৈশিষ্ট্য জন্মায় না। তার বড় প্রমাণ বামপন্থী দলের সরকার গঠনের নমুনা থেকেই অনেকখানি প্রমাণ হয়। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস শাসন ক্ষমতার বেড়াজালে পড়ে নিজেদের দলকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে পারেনি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেসের একজন বিরাট সাংগঠনিক প্রতিভা। মন্ত্রীত্ব তাঁকে সে কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। একমাত্র ইন্দিরা ছাড়া বাকী সব নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসীরাই সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। শাসন ক্ষমতায় যুক্ত না হয়েও ইন্দিরাজীর পিতা জওহরলালের সহযোগী থাকার দরুণ তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারেননি। মোট কথা হলো কংগ্রেস দেশোদ্ধার করেছে এরই পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ ২০ বছর জনসাধারণ

কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে। এই যে বিপুল এবং একক জনসমর্থন এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৃথিবীর কোন দলই কখনো পায়নি। তখন থেকে কংগ্রেস সংগঠনে রাজনৈতিক শিক্ষা এবং কর্মীদের যদি রাজনৈতিকভাবে তৈরি করা হতো, তবে ভারতবর্ষের চেহারা অনেক আগেই অন্যরকম হয়ে যেত। তার জন্য ২৫ বছর অপেক্ষার প্রয়োজন ছিল না। কংগ্রেস বিরোধী দলগুলো এদিক থেকে কংগ্রেসের চাইতেও অনেক শক্ত এবং পোক্ত। ছোটখাটো দলগুলোর কর্মীরা পর্য্যন্ত রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন। এবং সেই কারণেই জওহরলালের জীবিত অবস্থা থেকেই কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরেছে। ভাঙ্গন না বলে ঘূণ ধরেছে বলা চলে। বৃহত্তর রাজনৈতিক দল যখন রাজনৈতিক আদর্শের অভাবে ধ্বংস যেতে থাকে তখন সেই দলের গঠিত সরকার কী হতে পারে এটা সহজেই অনুমেয়। তাই ভারতবর্ষের কোন যোজনা সম্পূর্ণ হয়না, ওপরতলা থেকে নীচ তলা পর্য্যন্ত চুরির মড়ক লাগে। যেখানে সবাই চোর, এককভাবে সবাই সম্রাট, সেখানে দেশের অবস্থা যা হবার তাই হয়েছে। এক বৃহত্তর অন্ধকার জগতের দিকে ভারতবর্ষকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

সাধারণতঃ এর আগে কংগ্রেসে আমরা কী দেখেছি? বৎসরান্তে সব কংগ্রেস নেতাদের মিলিত হবার এক মহোৎসব, যাকে নীতি নির্দ্ধারণ হতো, সভাপতি নির্ব্বাচন আর প্রচুর বাগবিতণ্ডা। তারপরেই সব স্থির। কোন দলীয় কার্যাক্রমকে রূপায়িত করার প্রবণতা দেখা যেতো না। তারপর ভোট রূপ আরেক মহোৎসব সুরু হবার আগে কংগ্রেস অফিস সজাগ হতো। পোষ্টার, ফেষ্টুন, টাকা, বক্তৃতার পর ভোটপূজা সমাপন। ভাগ্যবান বা কপালে মন্ত্রীত্বরূপ তিলক পরে মহানিদ্রায় আসীন। এই ছিল কংগ্রেসের ধারা বিবরণ। এর ব্যাতিক্রম যে ছিলনা একথা বলছি না। অনেক কংগ্রেসকর্মী বা নেতাকে গদী মোহমুক্ত হিসাবে আজীবন কাজ করতে দেখেছি। তাদের সংখ্যা অতি

নগণ্য। বেশিরভাগ নেতাদের অকর্মণ্যতার জন্যে ভারতের বহু জায়গায় কংগ্রেস ইমেজ একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বামপন্থী দলগুলো ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ রাজ্যে প্রচণ্ডভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। আজ থেকে তিন বছর আগের কংগ্রেস পার্টিকে দেখে অবিভক্ত সৎ কংগ্রেসম্যানও ভাবতো পার্টির সমূহ মৃত্যুর কথা। আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তা সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। কেননা, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী দলে ভাগ হয়ে যাওয়া কংগ্রেসপার্টি আবার বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ফিরে আসবে এটা কোন বামপন্থী বা কংগ্রেস সদস্য কল্পনা করেনি। খুব ছোটবেলা থেকে সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারিণী ইন্দুর পক্ষেই সেটা সম্ভব হয়েছে। বানরবাহিনী নিয়ে যাঁর হাতে খড়ি, সর্বভারতীয় দল গঠনের তিনিই আজ মুখ্য ভূমিকা। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, রাজনৈতিক বোধ, দেশের পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে অনুধাবন, নিজের দলের কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং ভারতীয় আদর্শ এবং মানসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা তাকে আজ বিশ্বের নেতৃস্থানীয় করেছে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন আজও রয়ে গেছে, সেটা সংগঠনের প্রশ্ন। অতীতে কংগ্রেসে নবীন সদস্যরা শুধু হুকুম তামিল করতো, ছাত্র এবং শিক্ষিত যুবকদের অবস্থান তেমনা বললেই চলে। আজ চিত্রটা অন্য রকম, তবে সম্পূর্ণ নয়। বেশকিছু কংগ্রেস সংগঠনে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় ছাত্র এবং যুবকরাই কংগ্রেসের মেরুদণ্ড! তা সত্বেও কংগ্রেস সংগঠন এখনও সাধারণত্বে পৌঁছতে পারছে না। তার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো এবং তা দেশে সামগ্রিক কল্যাণের জন্যেই। নইলে, ইন্দিরাহীন কংগ্রেস আবার ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার পুনরুজ্জীবন আর কখনো সম্ভব হবে না।

প্রথমেই বামপন্থী দলগুলোর সাংগঠনিক টেক্‌নিক ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন। এত অল্প সংখ্যক লোক বল নিয়ে বৃহত্তর দলকে নস্যাৎ

করে দেবার ক্ষমতা তাদের আসে কোথা থেকে? এর অপ ব্যাখ্যা যে যেভাবেই করুক, তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের সববৃহৎ বামপন্থীদলের আবির্ভাবের দিন তারিখ না বলেও বলা চলে সূচনা ১৯৫২ সালের চীনের ভারত আক্রমণের পরে পরেই

চীন ভারত যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষের জন সাধারণের অর্থনৈতিক দূরবস্থাকে, সরকারি অব্যবস্থাকে ধামা চাপা দেবার জন্য, চীন ভারত যুদ্ধের সূচনা করা হয়েছে। ভারত পাকিস্থানের তিন তিনবার যুদ্ধের বেলাতেও কম্যুনিষ্ট দল এই মতই পোষণ করেছে কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার দরুণ চীন যখন সত্যিই ভারতের অনেকখানি এলাকা দখল করে নেয় এবং আসাম এলাকা থেকে চীন আক্রমণের ভয়ে কম্যুনিষ্টরাও যখন পালিয়ে আসে, তখন ভারতের কম্যুনিষ্ট সংগঠন চীনকে ভারত আক্রমণকারী বলে বিবৃতি দেয়। ওদের সেদিনের বিবৃতি এমন ছিল যাতে সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙ্গে। সে সময়ের পলিটব্যুরোর মিটিং-এ সবাই এ মত পোষণ করেনি অর্থাৎ চীন ভারত আক্রমণ করেছে এটা স্বীকার করেনি এমন কথাও অনেক কম্যুনিষ্ট নেতা বলেছেন যে যুদ্ধটা হিমালয়ের মাথায় হয়েছে কেউ বা বলেছেন, যত সব ফালতু কথা, চীন ভারত আক্রমণ করলে ভারতবর্ষ দখল করতে তার সাতদিন সময়ও লাগবে না অর্থাৎ যুদ্ধ সরাসরি চোখের সামনে না ঘটলে আমাদের অনেক অতি জ্ঞানিরা তা স্বীকার করেন না। পলিটব্যুরোতেও এ ধরণের উক্তি ছিল। কম্যুনিষ্ট কোন দেশ অন্য কোন দেশ আক্রমণ করতে পারে না-এ ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে সেদিনের কম্যুনিষ্টরা ব্যস্ত ছিলেন। তবুও সেদিন আপতকালীন জরুরী অবস্থা এবং জনতার ভয়ে ভারতের

কম্যুনিষ্ট পার্টি বিবৃতি দিল, চীন ভারত আক্রমণ করেছে এবং জাতীয় স্বার্থে পার্টি ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

গণ্ডোগোল দেখা দিল তখন থেকেই। যুদ্ধ থেমে যাবার পরই ঘটল আসল ঘটনা: পলিটব্যুরোর সদস্য জ্যোতিবাবু কলকাতায় বিবৃতি দিলেন, চীন ভারত আক্রমণ করেনি। পরোক্ষ বক্তব্য হলো ভারতই চীনকে উস্কানি দিয়ে এ কাজে প্রবৃত্ত করেছে এবং ভারতীয় সৈন্য চীন এলাকায় ঢুকে গিয়েছিল, তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে চীন সৈন্য ভারতে ঢুকে পড়েছিল। এবং চীন যে খুব ভদ্রলোক এটাও তারা প্রমাণ করলো ভারতীয় বন্দী সৈন্যদের জামাই আদর দেখাবার জন্যে।

জ্যোতিবাবুর এ বিবৃতির পর পরই মূলতঃ কমুনিষ্ট সংগঠনে ভাঙ্গনের সূত্রপাত। জ্যোতিবাবু প্রমোদবাবু সুন্দরাইয়া প্রমুখ নেতৃত্ব গোপনে প্রচার সুরু করলো যে ডাঙ্গে নেতৃত্বাধীন কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসেরই সহযোগী সংগঠন হয়ে পড়েছে। বহুবাজার কালীবাড়ীর উল্টো দিকের ছোট ছোট প্রেস থেকে প্রচার পত্র বিলি সুরু হলো। দুবছরের মধ্যেই মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট সংগঠন পাকাপোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক'বছরে সেই ক্ষুদ্র সংগঠন কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গ কেরল এবং ত্রিপুরাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো! নিশ্চয়ই কোন মন্ত্র বলে নয়। এর মধ্যে দুটো কারণ খুব উজ্জ্বল। প্রথমতঃ সরকারি অপদার্থতার জন্যে দেশের দূরবস্থা এবং ওদের সাংগঠনিক প্রতিভা। কংগ্রেস সংগঠনের মতো কম্যুনিষ্ট সংগঠনেও পচন ধরেছিল ১৯২৪ সাল থেকে তারা এমন কোন অন্দোলন পরিচালনা করতে পারেনি যাতে রাজনৈতিক শিক্ষিত কর্মীরা সন্তুষ্ট হতে পারে। দলের প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকার দরুণ বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। জ্যোতিবাবুর নেতৃস্থানীয়রা যখন ভিন্ন মত পোষণ করে নতুন কম্যুনিষ্ঠ সংগঠনের ডাক দিলেন, তখন বেশীর ভাগ কম্যুনিষ্ট সদস্যরাই সেদিকে ঝুঁকে পড়লেন।

তারা আবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন ভারতবর্ষ কম্যুনিষ্ট দেশ হয়ে যাবে।

কিন্তু কমুনিষ্ট পার্টির শিক্ষা দীক্ষা সম্বল করেই তার দলের পত্তন। নতুন দল বলেই, শহরে, গ্রামে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো যে কোন ভাবে করায়ত্ত করার পরিকল্পনা সুরু করলো। বৃহত্তর দলের পরিচয় দিয়ে জনসাধারণকে রাজনৈতিক দীক্ষা না দিয়ে জোর করে নিজেদের আদর্শকে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি সদস্যকে তারা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করে জঙ্গী করে তুলেছে। এই জঙ্গী দলের সহযোগিতার জন্যে লুমপেনদের (ভবঘুরে) আশ্রয় দিয়েছে প্রলেটা-রিয়েট ক্লাশ বলে। প্রতি জায়গায় তার প্রবেশ করেছে, অফিস করেছে, অনবরত মিটিং মিছিল করেছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে সত্যি তারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। কংগ্রেস দলে এধরনের সংগঠনের নজীর ছিল না। কংগ্রেস কী চায়, কী করবে এ বোধ অনেক কংগ্রেস নেতারও ছিল না। আর কম্যুনিষ্ট (মাঃ) সদস্যদের প্রত্যেকেই নিজেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেকখানি ওয়াকিবহাল।

এ গণতন্ত্র মিথ্যা, এ আজাদী ঝুটা শ্লোগানের ধ্বজাধারীরা যখন ১৯৫২ সালে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্যে প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলো যখন অনেক কম্যুনিষ্ট সদস্য, যারা লেনিনের পথের বাইরে কিছু দেখেন না—তারা বিস্মিত হলো। প্রশ্ন তুললো, বুর্জ্জোয়া সরকারী নির্বাচনে সত্তার প্রশ্ন নেই এবং নির্বাচনমুখী চিন্তা কম্যুনিষ্ট আদর্শ নয়; তবে মার্কসবাদীরা নির্বাচনে নামছেন কেন? নেতৃস্থানীয় উত্তর দিলেন (সারমন দিলেন) জনসাধারণ এ সংগঠনের কতখানি পক্ষে তা অনুধাবন করার জন্যে। সদস্যরা চুপ করে রইলো। ১৯৫২-র নির্বাচন কংগ্রেসের প্রথম পরাজয়ের ইতিহাস। সমগ্র ভারতবর্ষে কংগ্রেসেও তখন ভাঙ্গন সুরু হয়েছে। ভাঙ্গন সমগ্র ভারতের

দলগুলোতেই সুরু হয়ে গেছে। বামপন্থী সরকার পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে তাদের যে সব প্রতিশ্রুতি ছিল, বিশেষকরে উত্তর বঙ্গে সে প্রতিশ্রুতি সরকার রাখতে পারেনি। মার্কসবাদী নেতৃত্ব সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে আয়ত্তে আনার ব্যাপারে তৎপর। কিন্তু তাদের কিছু সদস্য এই ধরণের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দ্বারা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে এটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই বিদ্রোহ দেখা দিল নকশাল আন্দোলন হিসাবে।

১৯৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পশ্চিম বাংলায় একদম নির্মূল হয়ে যাবার মুখে এলো। বিপুল সংখ্যাধিক্যে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ধারণা করে নিল জনসাধারণ একমাত্র তাদেরই চায়। তারই প্ররিপ্রেক্ষিতে তারা জনসাধারণের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক সমর্থন আদায় করতে সুরু করলো। নকশাল আন্দোলন তখন তীব্রতা নিচ্ছে। বামপন্থী সরকারী পুলিশ এবং মার্কসবাদীরা তাদের নির্মূল করার পরিকল্পনা করলো। সন্ত্রাস সুরু হলো দিকে দিকে। আঘাত এর বিরুদ্ধে আঘাত। এক চূড়ান্ত অরাজকতার সূত্রপাত। এর মধ্যে কোন রাজনীতি নেই, আছে ক্ষমতা দখলের এক নোংরা পরিকল্পনা। যে পরিকল্পনার জন্যে আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমবাংলায় ১৫০০০ হাজারেরও বেশী যুবক ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। পৃথিবীর কোন গৃহযুদ্ধে এত স্বল্প পরিসর জায়গায় এত প্রাণ হানি ঘটেছে? একটি পুলিশের মৃত্যুর জন্যে নির্বিকার মৃত্যু নেমে এসেছে অনেক নিরীহ ছাত্র যুবকের। একটু সুস্থ মাথায় চিন্তা করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, এতগুলো ছেলে যদি জঙ্গী রাজনীতির অংশিদার হত, তাহলে এক লক্ষ সৈন্য নামিয়েও পশ্চিমবাংলাকে আয়ত্বে রাখা যেত না। আসলে কোন এক ভারত বিরোধী ক্ষমতাশালী শক্তি এ সব রাজনৈতিক দলের পেছনে অশুভ হাত বাড়িয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভাগুলোকে নিভিয়ে দিয়েছে। প্রকৃত সমাজদ্রোহী যারা; পরিপূর্ণ ক্রিমিনাল যারা তারা

আজও সমাজের বুকে তেমনিই রাজ্য বিস্তার করে আছে এবং আগের চাইতেও অনেক ক্ষমতাশালী।

তাহলে একথাই দাঁড়াচ্ছে যে বাংলার যে মধ্যবিত্ত সমাজ, যাদের সন্তানরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান পুরোহিত সে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের এবং ভবিষ্যৎ দেশের উজ্জ্বল সন্তানগুলোকে নির্মূল করার সামগ্রিক পরিকল্পনা কার বা কাদের এটা অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। এরা সবাই কি সমাজদ্রোহী, জাত ক্রিমিনাল? এশিয়ার নেতৃত্ব যার হাতে আজ অনস্বীকার্য্যভাবে এসেছে, আমি সেই শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি নিরপেক্ষ তদন্তের জন্যে সার্বিক-ভাবে। প্রতিটা প্রাণই অমূল্য এ বিশ্বাসের অনুসরণকারী বলেই আমার এ আবেদন।

আপাততঃ ভাবে পশ্চিমবাংলায় এ খুনোখুনির রাজনীতির সূত্রপাত নকশাল নেতা চারুবাবুর মারফৎ। কিন্তু সে অনুশাসনের সূত্রপাত হবার আগে সি, পি, এম নকশাল বিতাড়ন সুরু করে। শ্রেণী সংগ্রাম সুরু করতে গিয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত এবং প্রলেটারিয়েট ক্লাশ খুনোখুনি করে নির্মূল হয়ে যেতে বসেছে কেন এটা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ভেবে দেখা দরকার। ইন্দিরা সরকার যেখানে গরীবী হটাও প্রোগ্রাম নিয়েছে, তাদেরও ভাবতে হবে এ ব্যাপারে।

আমার প্রথম কথাতেই ফিরে আসছি, বামপন্থী দলগুলো তাদের সদস্যদের রাজনৈতিক শিক্ষার মধ্যে রাখার চেষ্টা করে এবং তারা সৈন্য বাহিনীর মতো তাদের নেতাকে নির্বিচারে মেনে চলে। যেটা কংগ্রেস সংগঠনে ছিল না বললেই চলে। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে ছোটখাটো কাজে লাগায়। মিছিলে মিটিং-এ এবং ছোটখাটো সমাবেশে জমায়েত করে পার্টির বক্তব্য তুলে ধরা হয়। সেখান থেকে বাছাই করে ছাত্র সংগঠন বা যুব সংগঠনে গ্রহণ করে। সেখানকার কাজকর্ম এবং চাল চলন অনুযায়ী লোকাল কমিটি মেম্বার ও পরে পরের ধাপে

চলে যায়। শক্ত বাঁধুনির মাধ্যমে তারা অগ্রসর হয় বলে, ওরা স্বল্প সংখ্যক হলেও অনেকখানি ক্ষমতাশালী। পার্টির নেতৃত্ব ওদের কাছে গুরু বাক্যের মতো। নেতৃত্ব ভুল করলেও, সদস্যরা সেটা ভুল হয়নি বলে প্রচার করে এবং তার পক্ষে যুক্তি খোঁজে। এরকম একটি শক্ত সংগঠন আজ পশ্চিমবাংলা থেকে মুছে যেতে বসেছে কেন, এ আলোচনায় আসার আগে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অলিখিত ইতিহাস পর্য্যালোচনার প্রয়োজন। অলিখিত বলছি এই কারণে যে, কম্যুনিষ্ট ইতিহাস যা পাওয়া যায় তা তাদেরই লেখা এবং তাতে নিজেদের ভুল এবং গোপন উদ্দেশ্যের কথা বলা নেই। এবং ভারতে কম্যুনিষ্ট আদর্শের পেছনের ইতিহাসের কথা কেউ ভেবে থাকলেও আমার জানা নেই। যুক্তির ওপর নির্ভর করে আমি সেইরকম আলোচনায় বৃত হব।

ইন্দিরাজীর জন্ম সাল ১৯১৭ সালেই মহান লেনিন রাশিয়ার বিপ্লব সমাধা করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে তখন গান্ধী নেতৃত্বে কংগ্রেসের আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের গোপন প্রস্তুতি এবং বৃটিশ সরকারের ওপর আঘাত চলছে। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের সূচনা হবার অনেক আগেই ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের ওপর আঘাত সুরু হয়ে গেছে। যদি অত্যাচারী বিদেশীর বিরুদ্ধে সামগ্রিক সশস্ত্র আক্রমণকে আমল দিই, তাহলে ভারতবর্ষে এ ঘটনা বহুবার হয়েছে। হূনদের বিরুদ্ধে, মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে, এ সব প্রতিরোধ এবং রাজার বিরুদ্ধে রাজার লড়াই বলে বাতিল করতে পারি। কিন্তু শিবাজীকে কোনক্রমেই বাদ দিতে পারিনা। সাম্রাজ্যবাদী শাসক ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অতি সাধারণ মুক্তিকামী মানুষদের নিয়ে শিবাজী সেনা সাম্রাজ্যবাদী শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে সত্যিকার জনতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং সে রাজ্যের রাজা যে সাধারণ মানুষের মতো নিঃসম্বল এটা তাঁর জাতীয়

গৈরিক পতাকাতেই প্রমাণ। আরও প্রমাণ তার শাসন প্রণালীতে রয়েছে। সুতরাং ভারতেই পৃথিবীর প্রথম সফল বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয় শিবাজীই পৃথিবীতে প্রথম গেরিলা যুদ্ধের প্রবর্ত্তন করেন। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে সেটা একটা বিরাট উদাহরণ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে আরেকটি অসফল বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। তাহলো ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধ। এই সিপাহী যুদ্ধকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে স্বীকার করতে অনেকেই নারাজ। কেননা, সে বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিল কিছু স্বার্থান্বেষী সামন্তরাজ। তাদের কথাই মেনে নিয়ে বলছি সিপাহী যুদ্ধ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়। তাহলে সময়টাকে আরো পেছিয়ে নিয়ে গেলে তাদের নিশ্চয়ই বলার কিছু থাকবে না। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে মহামান্য শিবাজীর নেতৃত্বে সফল বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। মার্কসীয় ধ্যান ধারণায় বিশ্বাস না থাকলে বিপ্লব হবে না একথা যারা বলেন তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।

রাশিয়ার বিপ্লব বা বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল কোন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে নয়, তাদেরই দেশীয় রাজা জারের বিরুদ্ধে। দেশের সমস্ত সম্পদ ক'জন ব্যক্তির হাতে। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা ছিল না। সে দুর্ব্বল জারকে পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করা আধুনিক শক্তি সম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী সরকারকে পরাস্ত করার চাইতে অনেক সহজ। ১৯১৭ সালের বিপ্লব সমাপ্ত হবার পর রাশিয়া নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত।

১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবও তেমনি রাজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ক্ষমতা দখল। সমরাস্ত্র তখনও সেখানে তরোয়াল এবং দণ্ড গিলোটিন। জার এবং লুই নিঃসন্দেহে ঔরঙ্গজীব এবং বৃটিশ শক্তির চাইতে অনেক দুর্ব্বল। সেই দুর্ব্বল রাজশক্তিকে পরাস্ত করে

ক্ষমতা দখল করাটা সকল বিপ্লব! অথচ প্রবল শক্তিশালী মোগল সম্রাটকে পরাস্ত করে দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্য স্থাপিত হলো, তা কি সফল বিপ্লব নয়? ফরাসী বিপ্লবের ১৪৩ বছর আগে, রাশিয়ার বিপ্লবের ২৭১ বছর আগেই ভারতে সফল বিপ্লব ঘটে গেছে। তাছাড়া শিবাজীর শাসন ব্যবস্থা জনগণতান্ত্রিক একথাও ইতিহাস পাঠকদের অজানা নয়। একটিমাত্র প্রশ্নই আজকের কম্যুনিষ্টরা করে বসতে পারেন, তাহলো শিবাজী হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাটা ধর্মান্ধতার লক্ষণ নয়। ফরাসী বিপ্লবীরা খৃষ্টান নয়, রাশিয়ার বিপ্লবীরা খৃষ্টান ছিলেন না? কিন্তু শিবাজী যে হিন্দুরাজ্যের প্রবর্তন করেছিলেন এবং স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাহলো ধর্ম নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার, অর্থের সমান বণ্টন। শিবাজী আধুনিক শব্দ প্রলেটারিয়েটদের সত্যিকারের প্রতিনিধি ছিলেন। পৃথিবীর কোন্ কম্যুনিষ্ট কর্ণধার নিজের উপার্জন নিজে করতেন রাজ্য পরিচালনের কাজের পরেও? ধর্মের ব্যাপারে শিবাজী কতখানি উদার ছিলেন, মৃত্যুর ক'দিন আগে ঔরঙ্গজেবকে লেখা চিঠি থেকেই তা অনুধাবন করা যাবে।

১৬৭৯ খৃঃ ঔরঙ্গজেব যখন জিজিয়া কর পুনরায় প্রবর্তন করেন, তখন শিবাজী চিঠি দিয়ে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর বছর খানেক আগের ঘটনা (১৬৮০ খৃঃ)।

শিবাজী লিখেছিলেন :—

"শুনলাম আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার ফলে আপনার রাজকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছে, অর্থের অভাব হয়েছে, তাই হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর চাপিয়ে আপনি সেই শূণ্যতা ও অভাব পূরণ করতে চান। আপনি সম্রাট, আপনার যা খুশী করতে পারেন। কিন্তু এই সাম্রাজ্য যিনি গড়ে তুলেছিলেন, আপনার প্রপিতামহ আকবর বাদশাহ, তিনি এ নীতি অনুসরণ করেন নি। বাহান্ন বছর রাজত্ব করে তিনি হিন্দু-মুসলমান

জাতি নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করেছিলেন। তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর ও পৌত্র শাহজাহান তারপর দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন, কিন্তু এ পথে চলেন নি। আপনি সেই রাজবংশের সন্তান হয়ে কেমন করে হিন্দুদের ওপর এই জিজিয়ার বোঝা চাপাবার কথা চিন্তা করলেন? আপনি কি জানেন না যে এর জন্যে সারা দেশ জুড়ে আপনার দুর্নাম হবে? লোকে বলবে এবং চিরদিন ইতিহাসে লেখা থাকবে যে হিন্দুস্থানের সম্রাট অসহায় দরিদ্র ভিখারী, সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী বৈরাগীর সামান্য কড়ির লোভও সম্বরণ করতে পারেন না, তাহাও কেড়ে নিয়েছেন। আর আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ধর্মের আদর্শ হচ্ছে হিন্দুদের ওপর জুলুম করা। বেশ ভালো কথা, তাহলে সেই জুলুম হিন্দুপ্রধান রাণা রাজসিংহের ওপর করুন, তারপর আমার কাছ থেকেও জিজিয়া আদায় করুন। তাহলে বুঝবো যে আপনার সাহস আছে, বিশ্বাসের জোর আছে। তাহা না করে আপনি দরিদ্র পিঁপড়া-মাছির ওপর অত্যাচার করছেন কেন? তাতে নিশ্চয় সম্রাটের পৌরুষ ও সাহস প্রকাশ পায় না।"

এ চিঠির দ্বারা শিবাজীর উজ্জ্বল চরিত্রের দুটো দিক পরিষ্কার হয়। প্রথমতঃ আকবরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, জাহাঙ্গীর ও শাহাজানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন থেকে বোঝা যায় তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ দরিদ্র জনগণের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা। শাসক হিসেবে সবদিক থেকে তাঁর মতো চরিত্রবান মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে ক'জন আছে ভাবতে সময় লাগবে না।

শিবাজীর কথায় আমার প্রয়োজন হলো পৃথিবীর সফল বিপ্লবের পরিচয়ের জন্যে।

তাহলে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, কী বিপ্লব, কী গেরিলা যুদ্ধ কোন কিছুর জন্যেই বিদেশের দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন নেই। ভারতীয় দর্শন, হিন্দু ধর্ম কোনটাই সংকীর্ণ বেষ্টনির মধ্যে আবদ্ধ ছিল

না এবং নেইও। বেদ, উপনিষদ ও পুরাণে যে সব শ্লোক আছে তার কোনটাতে বিশেষ গণ্ডী বা ধর্মের কথা বলা নেই। কাজেই ভারতীয় আদর্শ হলো সাম্যবাদ, সহাবস্থান, ধর্ম নিরপেক্ষতা। সমাজতন্ত্রের প্রকৃত পরিচয়ের জন্য অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর চিন্তাশীলদের ভারতেই আসতে হবে। কারণ, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা কল্যাণমুখী বন্ধনে আবদ্ধ। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথায় এমন সামাজিক বন্ধন আছে? ভারতীয় সেই সমাজ ব্যবস্থা দিনের পর দিন বিদেশীর আক্রমণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তবু শেষ হয়নি। যা শাশ্বত তা শেষ হবার নয়। ভারতের সেই সমাজবাদকে আজ বৃহৎ ভাবে রাষ্ট্রীয় আকারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গলদ দেখা দিল বহিঃ—ভারতীয়দের আগমনে। কার্ল মার্কসের গুরু হেগেল ভারতীয় দর্শনকেই গ্রহণ করেছিলেন। মার্কস ভাববাদের ডায়লেকটিকসকে বস্তুবাদ হিসেবে নিলেন। মার্কসবাদের অবলুপ্তি হবে ঠিক সেই ধর্ম অনুযায়ী। তাহলো শুধু বস্তুবাদ নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। জন্তু আর মানুষের মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, মানুষের মধ্যে জিজ্ঞাসা আছে, অনুসন্ধিৎসা আছে, যা পশুর মধ্যে নেই। সুতরাং কার্ল মার্কস এবং লেনিন—মাও পৃথিবীর মানুষের হয়ে সব প্রশ্নেরই উত্তরই দিয়ে গেছেন এবং আর কোন জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসা থাকবে না, একথা মেনে নিলে বলতে হয়, মানুষ সত্যিই জন্তু হয়ে গেছে। ভারতীয় তন্ত্র সাধনায় গুরু শিষ্যকে বলছেন, তোমার মনে যে বিষয়ে প্রশ্ন আসবে তা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো এমন কোন কারণ নেই। যে উত্তর দিতে পারবো না, তা তোমাকে নিজেই জেনে নিতে হবে। যাকে বলে আত্মজ্ঞান। কাজেই কার্ল মার্কস শেষ কথা নয়।

ভারতের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশীর ভাগ ব্যক্তি কম্যুনিষ্ট না হলে মার্কসবাদ একটি ভালো বস্তু একথা মনে করে থাকেন। যাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন, তারা সবাই এক তরফা

যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা বিশ্বাস করেন না, তারা কেন করেন না, এটাও সঠিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভারতে কোনদিনই কোন অবস্থাতেই কম্যুনিজম (লেনিন ব্যাখ্যা অনুযায়ী) সম্ভব কিনা, এ প্রশ্ন তুলে ধরলে কয়েক হাজার বই লেখা হবে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। আমি এক কথায় বলতে পারি লেনিন মাও প্রবর্তিত কম্যুনিজম কখনো আসবে না, আসতে পারেনা। আমেরিকায় কম্যুনিজম আসতে পারে, সমগ্র ইউরোপ কমুনিষ্ট হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ ব্যাতিরেকে পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশেই জাগতিক ভাবনায় ব্যাস্ত অর্থাৎ বস্তুবাদী। ভারতবর্ষের ধমণিতে আধ্যাত্মচেতনা তথা ভাববাদ। ৫০০০ হাজার বৎসরেরও বেশী সময়ের ভারতীয় রক্তকে বস্তুবাদী রক্তে পরিণত করতে আরও কম করে ৫০০০ বছর প্রয়োজন। কাজেই সে ভাবনা ৫০০০ বছর পরের বংশধরদের জন্য তোলা রইলো।

আমরা পুরনো ভাবনাতেই ফিরে আসছি। ভারতবর্ষে কম্যুনিজমের হাওয়া কী ভাবে এবং কেমন করে এলো তা তলিয়ে দেখা দরকার। তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তারা আমাদের দেশের ভালো করতে পারে কিনা।

ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারার আমদানি করে বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর।

কথাটা অনেকেরই মনঃপুত হবে না জানি তবে ঘটনা সে রকমই এবং এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলো।

বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে এবং উনবিংশ শতাব্দিতে যারা ইউরোপে গিয়েছিলেন তারা কেউই কম্যুনিষ্ট আদর্শকে বহন করে অনেন নি। মার্কসবাদী কম্যুনিজমের আবির্ভাব ১৯৩০ সালের দিকে। তার

আগে যা এসেছে, তা রাশিয়ার বিপ্লবী চিন্তা—মার্কসীয় ভাবধারা নয়।

লণ্ডনে থাকাকালীন ১৯০৪ সালের পর জওহরলাল নেহরু সোসালিজমের পরিচিত হন এবং মার্কসীয় সোসালিজমের বিরোধীপক্ষ ফেবিয়ান সোসালিষ্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। কিন্তু তা বর্ত্তমান প্রচলিত কম্যুনিষ্ট আদর্শ নয়। এর পর যাঁর কথা অগ্রগন্তব্য তিনি হলেন মানবেন্দ্র নাথ রায় তথা নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। এশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিতেও যাঁর স্থান ছিল শীর্ষস্থানে। সেই এম, এন, রায় ভারতে এসে কংগ্রেসেই অংশ নিলেন। কেন? এর উত্তর কি? কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর বিরোধীতা কেন?

মানবেন্দ্র নাথ রায় ছিলেন বাঘা যতীনের অন্যতম সহযোগী। যতীন মুখার্জীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর শেষ গ্রন্থ New Humanism অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

অর্থাৎ বিদেশ থেকে কম্যুনিজমের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী যাঁরা তাঁরা কেউই ভারতীয় কম্যুনিষ্ট হননি। তবে কারা হলেন? আজকের প্রবীন কম্যুনিষ্ট নেতারা একদিন কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে অংশও নিয়েছিলেন। হঠাৎ কোন্ মন্ত্রবলে তাঁরা কম্যুনিষ্ট হলেন?

এ প্রসঙ্গে আসতে হলে তৎকালীন বিপ্লবীদের কথায় আসতে হয়। ছাত্র এবং যুবকদের মধ্যে গান্ধীবাদ তেমন শেকর গাড়তে পারেনি। সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা বৃটিশ সরকারের ধ্বংস ডেকে আনবে এই তাদের পরিকল্পনা। বাংলাদেশ এবং ভারতের বহু জায়গায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছে। অত্যাচারি বৃটিশ সরকারী কর্মচারীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ নেমে এসেছে। বুড়িবালামের তীরে অসম সাহসী যতীন

মুখার্জীর মৃত্যুবরণ। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী এমনি আরো কত মরণ পাগল বিপ্লবীর রক্ত ভারতের মাটিকে রাঙা করে তুলেছিল। পুলিশী ব্যবস্থা কঠোর থেকে কঠোরতর করেও কোন ফল পাওয়া যায় নি।

যাদেরকে বন্দী করা হয়, নারকীয় অত্যাচারেও তারা মুখ খোলে না। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও স্বাধীনতার কথা 'বন্দেমাতরম' বলতে পেছ পা হয়না। ফাঁসীর হুকুম হলেও তাঁরা বিমর্ষ হয়না, বরং গান গেয়ে ফাঁসীর মঞ্চে নিজের হাতেই গলায় দড়ি পরে নেয়। সেদিন ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে এমনি সব শত শত বীরদের কাহিনী ছড়ানো অসহযোগ আন্দোলনের চাইতে বৃটিশ সরকার ভয় পেলো এঁদের। ভারতের ঘরে ঘরে যদি এ ধরণের ছেলে তৈরি হয়, তবে বৃটিশ সরকারকে বঙ্গোপসাগরে আত্মগোপন করতে হবে।

কূটবুদ্ধি সম্পন্ন বৃটিশ সরকার এত সহজে হাল ছেড়ে দিতে চায়নি। অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান চালানো হলো এ সব মানসিক শক্তি সম্পন্ন বিপ্লবীদের সম্বন্ধে। কমন্সসভার সদস্যদের মধ্যে একজন বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিলেন, "ফাঁসীর হুকুম হলে সাধারণতঃ বন্দীরা মৃত্যু চিন্তায় শুকিয়ে যায়, অথচ বাংলার বিপ্লবীদের ফাঁসীর হুকুমের পরও শরীরের ওজন বাড়ে। এ সব ছেলে যে দেশে আছে, সে দেশে বৃটিশ এতদিন ধরে রাজত্ব করে যায় কি করে।" সে প্রশ্নের জবাব বৃটিশ সরকার দেয়নি। কিন্তু আমরা জানি, রাওলাট রিপোর্ট অনুধাবন করলে একথা প্রথমেই মনে হয়, বিপ্লবীদের চাইতে বিশ্বাসঘাতক বা দেশদ্রোহী সেদিন পরিমাণে বেশিই ছিল। এ সব বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস থাকলেও ভারতীয় বিপ্লবীরা বিশেষ এক চারিত্রিক দৃঢ়তায় ছিল অমোঘ। সুতরাং বৃটিশ সরকারকে জানতেই হবে সে শক্তির উৎস কী, শক্তি ধারণের ক্ষমতা কোথায় নিহীত।

তৎকালীন বিপ্লবীরা আজকের ছেলেদের কাছে কিংবদন্তী। কারণ

মানুষ নিঃসঙ্কোচে প্রাণ দিতে পারে একমাত্র সঠিক আদর্শের জন্যে। তাঁদের আদর্শ ছিল দেশের মাটি মা'র চাইতেও বড়। স্বর্গের চাইতে গরিয়সী যে মা, তাঁকে ধারণ করছে যে মা তিনি দেশমাতৃকা। সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ মা'র জন্যে তাঁরা দলে দলে প্রাণ দিয়েছেন।

পুলিশ এঁদের সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান করে জানতে পারলো অনেক কিছু। যেমনঃ—

(১) শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়াম এবং যোগাভ্যাস।

(২) জ্ঞানার্জনের প্রবল পিপাসার জন্যে সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান বিষয়ক বই পড়া।

(৩) ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে কুসংস্কারহীন শারীরিক এবং মানসিক গঠন।

(৪) গীতা, ভাগবত পাঠের মাধ্যমে মৃত্যু চিন্তা জয় করা।

(৫) সঠিক ধর্মপথ অনুসরণের দ্বারা কল্যাণমুখী চিন্তা।

(৬) স্বদেশীয় ভালো জিনিষের প্রতি ভালোবাসা।

(৭) বিদেশী শিক্ষা থেকে প্রয়োজনীয় সারবস্তু গ্রহণ করা।

(৮) সর্ব বিষয়ে গোঁড়ামী বর্জন করা।

(৯) ভারতের এবং বিদেশের মণীষীদের জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়া।

(১০) ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে যুক্তিবাদী ধারণা।

এ রকম আরো সব প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার দ্বারা বিপ্লবীরা গঠিত হতো। গোপন পুলিশ বিভাগ বিপ্লবীদের ওপর অত্যাচার না চালিয়ে সুকৌশলে তাঁদের চিন্তাধারার মোড় ঘুরিয়ে দেবার প্লান তৈরি করতে আরম্ভ করলো। প্রবল দেশাত্মবোধকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারলে এবং ধর্মবিশ্বাসকে রহিত করার মতো অন্য কোন আদর্শ সামনে তুলে ধরতে পারলে, ভারতবর্ষের বিপ্লববাদ ধ্বংস হয়ে যাবে।

বৃটিশ সরকার সে ব্যাপারে কৃতকার্য্য হয়েছিল, নইলে চট্টগ্রাম

যুব বিদ্রোহের পর ভারতে আর কোন সামগ্রিক বিপ্লবী আক্রমণ হলো না কেন? ১৯৪২ সালে প্রদীপের শিখা যদিও দপ করে একবার জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু সে জ্বলে ওঠার মধ্যে চট্টগ্রামের মতো বৃহত্তর পরিকল্পনা ছিলনা। সব নামকরা বিপ্লবীরা ধরা পড়েছিল বলে, বা মৃত বলে? তা সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, চট্টগ্রামের সব নামকরা বিপ্লবীরা যখন জেলে, ফাঁসীর হুকুমের আশায়, তখন জেলের বাইরের নাবালক বিপ্লবী এবং ঘরের বৌ-মেয়েদের মিলিত প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামের বৃটিশ শক্তির ভিত্ নাড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা হয়েছিল। সে হিসেবে বিপ্লবীরা জেলে থাকলেই যে নতুন বিপ্লবীর আবির্ভাব হবে না বা বিপ্লবী কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকবে একথা সত্য নয়। তবে ব্যাপারটা কী? তাহলে নিঃসঙ্কোচেই বলতে পারি ভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লববাদকে ধ্বংস করেছে কম্যুনিষ্ট আদর্শ।

তৎকালীন ইতিহাস যারা পাঠ করেছেন তারাই জানেন যে, কয়েদ থাকাকালীন বিপ্লবীরা প্রিয়জনদের কাছে চিঠি লিখলে বা বাড়ী থেকে কোন চিঠি তাঁদের কাছে পাঠালে, সে চিঠি প্রায় সময় তাঁদের কাছে পৌঁছতো না, কখনো পৌঁছিলে তার চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে যেত। বাড়ী থেকে যে কোন জিনিষই পাঠানো হোক না কেন তা প্রায় সময়ই বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছত না। বৃটিশ আমলে রাজনৈতিক কারাবাস যাদের হয়েছে তাদেরই এ অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী যখন জেলে ছিলেন, তখন তাঁর বাড়ী থেকে তাঁর অতি প্রিয় জিনিষ আম পাঠানো হত। জেলের লোকেরা সেগুলো নিজেরাই আত্মসাৎ করতো এবং তাঁকে ডেকে বলতো "তোমার বাড়ীর আমগুলো খুব ভালো।" এই যেখানে অবস্থা, একটা গীতা বা অন্য কোন ভারতীয় গ্রন্থ যেখানে প্রবেশ করার সুযোগ পেত না, সেখানে মার্কসীয় দর্শন পৌঁছেছে। এই পৌঁছনোটা বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা নয়। নিছক সরকারি প্রচেষ্টায় সেটা সম্ভব হয়েছে।

একথাও আজ অজ্ঞাত নয় যে, আজকে যারা জাতীয় আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসে কম্যুনিষ্ট বা সোসালিষ্ট হয়েছেন। তাদের সেদিনকার পড়াশুনাটা জেলে বসেই হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষের অবচেতন মনে দীর্ঘদিন বাঁচবার একটা আকাঙ্খা থাকে। কারাবাসকালীন সময়ে রাজনৈতিক বন্দীরা বৈপ্লবিক কাজ এবং চিন্তা থেকে নিবৃত থাকেন। আর দীর্ঘ মেয়াদী বন্দীদশা ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আশা এবং হতাশা নিয়ে আসে। এতদিন কী করলাম। এরকম ভাব। তাছাড়া নিশ্চিন্ত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার মতো কোন আপাতঃ দৃষ্টিতে বৈপ্লবিক এবং ভালো নজীর থাকে, অবসর সময়ে পর্য্যালোচনার দ্বারা সেই সামনের মৃত্যুটাকে পেছিয়ে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করেন। তাই দীর্ঘ কারাবাস থেকে বেরিয়ে এসে তারা কম্যুনিষ্ট হয়েছেন, সোসালিষ্ট হয়েছেন, বিপ্লবী সোসালিষ্ট হয়েছেন। জাতীয় চিন্তাকে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। স্বল্প পরিধীর মানুষের মুক্তির কথা না ভেবে সারা বিশ্বের মানুষের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হলেন। সারা বিশ্বের মুক্তির কথা ভেবে রাশিয়ার জাতীয় আন্দোলন বন্ধ হলো না কেন, আর চীন কেন শুধু নিজের মুক্তির কথা ভাবলো? এর উত্তর কে দেবে? দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় আর যাই হোক আপাত কালীন প্রয়োজন মেটে না। আর কম্যুনিষ্ট বা সোসালিষ্টরা সেজন্য আজও কোন কাজের উদাহরণ রাখতে পারেনি। জাতীয়তাবোধ থেকে সরে গিয়ে সত্যিই যে কিছু করা যায় না, তা আজকের ভিয়েতনামই বড় উদাহরণ। বিশ্বের কম্যুনিষ্ট দরবারে হাত পেতে পেতে শেষ পর্য্যন্ত সব পার্টীকে একত্রে জাতীয় মুক্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আজকের কম্যুনিষ্টদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রিয়াকলাপ থেকে অনেক বেশী শিক্ষা নিতে হবে। কোন কম্যুনিষ্ট দেশই নিজের ক্ষমতা বিস্তার করার চেষ্টা ছাড়া আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি।

অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিলেও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির ক্রিয়া কলাপ অতি যঘন্য। রাজনৈতিক বোধ সৃষ্টির নামে তারা মানুষের Moral নষ্ট করেছে আর অকর্মন্য করে তুলেছে। ভারতবর্ষের সবকিছু মিথ্যা, শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার ভারতের ঋষি এবং মণীষীর মার্কসীয় জ্ঞান না থাকার জন্য তাঁরা পরিত্যাজ্য, ভারত ভূমিতে লেনিনের মতো কম্যুনিষ্ট জন্মায় নি বলে ভারত ভূমি অপবিত্র। তাই এদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতীয় নয়, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি। অথচ অন্য দেশে এ ঘটনার নজীর সামান্যই।

ভারত স্বাধীন হবার আগে এবং পরে (অবশ্য ওদের ধারণা অনুযায়ী ভারত এখনও স্বাধীন হয়নি) তারা যা কাজ করেছেন, ত হলো দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় রাশিয়া যখন মিত্র শক্তির সঙ্গে যুক্ত হলো, তখন বৃটিশ আর্মি তাদের কাছে হয়ে পড়লো—মুক্তি বাহিনী। এবং বৃটিশের সঙ্গে মিত্রতার সূত্রে ভারতবর্ষে তারা বৃটিশ পুলিশকে অনেক সাহায্য করেছে। রাশিয়া যখনই প্রচার করলো বৃটিশ আমাদের মিত্র, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমুনিষ্টরা বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, নেতাজীকে তারা দেশদ্রোহী বলতে কুণ্ঠিত হল না। নেতাজী ফ্যাসি বাদের দালাল। আজ চীন কার দালাল? ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে বাধা দিয়ে ধ্বংস করার পরিকল্পনা কোন দেশের দালালী করার প্রয়োজনে। টেক্‌সাস্ ধরণের খুনোখুনির প্রবর্ত্তন করে কোন্ দেশের দালালী করা হচ্ছে? বিদেশীদের মতো আমরা যখন প্রকারান্তরে বলতে সুরু করি ভারতবর্ষ হলো সাধু, সন্ন্যাসী আর কুসংস্কারের দেশ, তখন সেটা কাদের দালালী করার জন্যে? ভারতের স্বাভাবিক অগ্রগতি কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের দ্বারা কী ভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পশ্চিম বাংলা। কম্যুনিষ্ট পতাকাতলে না থাকলে দেশের উন্নতি হয় না, সমাজতন্ত্র আসতে পারে না, এ ধারণা মান্ধাতা

আমলের। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই প্রকৃত সমাজতন্ত্র আনতে পারে। মূল কথা হলো শয়তানের হাতে রাজ্য শাসনের ভার থাকলে কোন মতবাদেই দেশের উন্নতি হয় না।

আগের কথাতেই ফিরে আসি। বৃটিশ সরকার কম্যুনিজমের সব চেয়ে বিরোধী পক্ষ হয়েও ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে মার্কসীয় দর্শন তুলে ধরেছিল, শুধু বিপ্লবীদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার জন্যে।

বৃটিশ যখন ভারতবর্ষে কায়েমীভাবে শাসন এবং শোষণ শুরু করলো, তার কিছুদিন পরেই তারা বুঝলো শুধু শোষণ ও অত্যাচারের মাধ্যমে এদের বেশী দিন শাসন করা যাবে না। একটি সফল জাতির মেরুদণ্ডই হলো তার দর্শন, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষা। বৃটিশ অতি নিপুণভাবে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সেগুলো ধ্বংস করতে সুরু করলো। দর্শনের ভুল ব্যাখ্যা, কৃষ্টিকে কুসংস্কার বলে প্রচার, ইতিহাসকে অভারতীয়ভাবে লেখা। ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষেই শিক্ষিত জনসাধারণকে কলোনীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা দাস মনোভাবাপন্ন করে তুলেছে। যার হাত থেকে আজও আমরা রেহাই পাইনি। কম্যুনিষ্ট আদর্শ, যা ভারতে মূলতঃ বৃটিশই আমদানী করেছে, তাও সেই একই ধারার বাহক।

কারাগারে বন্দী যেসব বিপ্লবীরা, যাদের বিপ্লবী আদর্শ পূর্ণভাবে গড়ে উঠেনি, তারাই বৃটিশের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম থেকে পশ্চাৎ অপসরণের এ আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন। কারা থেকে বেরিয়ে সংগঠনকে জোরদার করার কাজে লাগলেন। জাতীয় আন্দোলনকারীরা কী দেশের সমগ্র জনসাধারণের মুক্তির কথা, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভাবেন নি? মুনাফাখোর, অসৎ প্রকৃতির কিছু লোকের উদাহরণই কী ভারতবর্ষের সমগ্র লোকের আসল পরিচয়।

আজকের জাঁদরেল কম্যুনিষ্টদের মধ্যে অনেকেই একদিন

অকম্যুনিষ্ট হিসাবে জেলে ছিলেন। সেই ব্যক্তিদের প্ররোচনায় সেদিন বৃটিশ সরকারের কাছে নিজেদের মার্জনা করার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন। ক'বছর আগে সে চিঠি বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কলঙ্ক আরোপের জন্য ছাপা হয়েছিল। আজ আমার তাদের প্রতি শেষ প্রশ্ন ভারতবর্ষকে যারা নিজেদের দেশ ভাবতে পারেন না তাদের ভারতবর্ষে থাকার অধিকার কোথায়?

তাই বলছিলাম, মার্কসিজমের সবচেয়ে বড় বিরোধী পক্ষ বৃটিশ নিজেদের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট আদর্শের আমদানী করেছিলেন।

সাম্যবাদী শিক্ষা আমরাই সারা পৃথিবীকে শেখাবো, না আমাদের শিখতে হবে বাইরের কাছ থেকে? এর প্রমাণ হবে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলে। এখনো আমাদের দেশে কলোনীয় শিক্ষা ব্যবস্থাই চালু। এ শিক্ষা যে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে না, এটা বোঝার মতো বহু সময় পেরিয়ে গেছে।

ইন্দিরাজীর আজকের কিছু কথা যা আমাদের মনে সত্যিকার আশার সঞ্চার করেছে, তা হলো, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে, তাঁর সরকার হয়তো এ সবের প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। কিন্তু আমি চাই, ভারতের জনসাধারণের মনে এবং ধমনিতে এ সবের প্রতিফলন ঘটুক। তার জন্যে চাই নতুন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। কলোনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভারতীয় যে জ্ঞান ভাণ্ডারকে আমরা দূরে সরিয়ে দিয়েছি তার নব মূল্যায়নের দ্বারাই এ কাজ সম্ভব।

ভারতীয় শিক্ষা এবং বিদেশী শিক্ষায় ভাস্বর আমাদের উনবিংশ শতাব্দির মনীষার কিছু উদ্ধৃতি দিলাম। আজ ঘরে ঘরে যার প্রয়োজন বিদেশী আবর্জনা সরাবার এর চেয়ে বড় উপায় আর কিছু নেই।

"বীর্য, বীর্যই সাধুত্ব, দুর্বলতাই পাপ।...বীর্যবান হইবার চেষ্টা কর।... আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে।"

"দেশের এই দুর্গতি মোচনের জন্য তোমরা কি...নাম, ধাম, ধন, জন, পুত্র, পরিবার, এমন কি নিজের দেহের প্রতিও মমতা ত্যাগ করিতে পারো?...সেই বজ্র কঠিন সঙ্কল্প কি তোমাদের আছে যাহার বলে পর্বত প্রমাণ বাধাও নিমেষে অপসারিত হয়?"

স্বামী বিবেকানন্দ

"প্রতিবাদ সভা? বক্তৃতার সময় আমরা পার হইয়াছি। সুন্দর সারগর্ভ রচনার কালও ইহা নহে।...তোমাদিগকে যাহারা নিষ্পেষিত করিতে চাহিতেছে তোমাদের সমরাহ্বান তাহাদিগকে শুনাইয়া দাও —জয় হিন্দুস্থান।"

শ্রীঅরবিন্দ

"দেশ মাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত।...আসুন আপনারা, আমরা সকলে এক দলে মিলিত হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করি। ...নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে পা ফেলিয়া আমাদের চলিতে হইবে বটে; তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই আমরা চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব।"

"চাই আদর্শে বিশ্বাস, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যতে বিশ্বাস...। যার যে রূপ শক্তি...তাকে তদনুরূপ কর্মক্ষেত্র ঠিক করে নিতে হবে। যার যেরূপ ক্ষমতা তাকে সেই ক্ষমতাই ফুটিয়ে তুলতে হবে। অবশেষে দেশ মাতৃকার চরণে অঞ্জলিস্বরূপ তা নিবেদন করতে হবে।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

এমনি ধরণের আরও বহু বাণী আমাদের মনীষীদের আছে।

গান্ধীজী, তিলক, নানক, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর কত কত নাম, যা বলে শেষ করা যাবে না। তবুও আমাদের এত দৈন্যদশা কেন?

রিক্ত নিঃস্ব, অবক্ষয়িত ভারত কী বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকবে আরও বহু বছর? সম্ভবতঃ তা আর থাকবে না। বস্তুর দিক থেকে ভারত বিদেশের প্রত্যাশি হলেও, ভাবের দিক থেকে বিদেশ থেকে প্রত্যাশার তেমন কিছু নেই। আজকে যিনি নেতৃত্বের লাগাম ধরেছেন, তিনি প্রাচ্য এবং প্রতিচ্যের জ্ঞান ভাণ্ডার সম্বন্ধে ওয়াকবিহাল। ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গ জীবন তাকে অন্তর্মুখী করেছে, আর অন্তর্মুখিতা জ্ঞানার্জনের সাধনার সহায়ক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিঃসঙ্গ বলার কারণ হচ্ছে এই যে, ছোটবেলায় অতি প্রয়োজনীয় মাতৃস্নেহ থেকে তিনি বঞ্চিত। কারণ, তার মা স্বামীর আদর্শকে নিজের আদর্শে রূপায়িত করে কংগ্রেস সংগঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পিতা জওহরলালের স্নেহও ইন্দু পূর্ণভাবে পায়নি। যখন তাঁর স্নেহের প্রয়োজন ছিল তখন পণ্ডীতজী উল্কার মতো ভারতবর্ষ ঘুরে বেরিয়েছেন। নিজের রুগ্না স্ত্রীকে পর্য্যন্ত ঠিকভাবে দেখাশোনা করতে পারেননি, তা মেয়ের আদর যত্ন করাতো দূরের কথা। একমাত্র সন্তানকে তিনি প্রাণের চাইতে ভালোবাসতেন, তাঁর ভাবাদর্শ দিয়ে তাঁকে ছেলের মতো মানুষ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল; সবকিছু পরিত্যাক্ত হল দেশের কাজে। মেয়েকে স্নেহ করার পরিবর্তে, তিনি নিজেই ইন্দিরার সন্তান হয়ে পড়লেন। সে হিসেবেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনটা ছিল নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা তাকে সঠিক জ্ঞানার্জনের সুযোগ দিয়েছে, ভালোমন্দ বিচার করার মতো স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়েছে।

আজ অনেকেই ভাবছেন, ১৯৫২ সাল থেকে ইন্দিরাজী সমস্ত কাজ এমন যাদুমন্ত্রের মতো করে চলেছেন কী করে? কেউ ভাবছেন, বিরাট কোন ব্যক্তি শক্তি তাঁর পেছনে কাজ করছে, কেউ বলছেন অন্য

কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সহায়তায়, কেউবা ভগবানের অসীম করুণার কথা বলছেন।

এক এক দিক থেকে কথাগুলোকে বিচার করি। বিশেষ কোন ব্যক্তি শক্তি তাঁকে এতখানি সাফল্য দিয়েছে, একথা বলবো না। অনেক ব্যক্তিশক্তি, ভারতের ঋষি এবং আধুনিক যুগের ভারতীয় মণীষা তাঁকে শক্তি যোগাচ্ছে। বিদেশী কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র একটা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে পারে, কোন নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে পারেনা। সুতরাং শক্তিশালী রাষ্ট্রের সহায়তায় তাঁর সামগ্রিক সাফল্য এটা পরিত্যাগ করা চলে। তারপর থাকছে ভগবানের করুণা। ভারতীয় অধ্যাত্মবোধ ঈশ্বরকে স্বীকার করে। কিন্তু তাঁর করুণা তাঁর ওপরই বর্ষিত হয়, যিনি সমগ্র মানব কল্যাণের জন্যে কাজ করে থাকেন অর্থাৎ ধর্মপথে থাকেন। উপরন্তু ভারতীয় চিন্তাধারা যখন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, তখন অতীত সংস্কার (অতীতের ভালো কাজের জন্যে যে পাওনা) তাঁর বর্ত্তমানের সুকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুফল দেয়। তাই ভগবানের করুণা। কর্মহীনতাকে ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা কখনো প্রশ্রয় দেয়নি। সুতরাং সৎকর্মের ফল (কল্যাণমুখী কর্ম) ভাগ্যরূপেই দেখা দেয়। ইন্দিরাজীর চরিত্রে সবচেয়ে বড় গুণ, যা তাঁর সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে হয়, তা হলো ব্যালান্স। সমপরিমান অধ্যাত্মচেতনা এবং বস্তুবাদী জ্ঞান তাঁকে তুলাদণ্ডে স্থির রেখেছে।

তিন বছরের শিশু অবস্থা থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রায় বাহান্ন বছর ধরে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। কংগ্রেস সংগঠনের ত্রুটি বিচ্যুতি তাঁর নখদর্পণে। নেতৃত্বের বোঝা নেবার আগ্রহ তাঁর কখনো ছিলনা। পিতার মৃত্যুর পরও তিনি গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পর কংগ্রেসি কোন্দল এবং বামপন্থী হটচট্ট যখন দেশটা রসাতলে নিয়ে যাবার পরিকল্পনায় ব্যস্ত, তখন স্বার্থান্বেষীরা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করে সমূহ বিপদের দিকে

ঠেলে দিয়েছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল, তাঁকে সামনে রেখে সমস্ত দুষ্কর্ম চালিয়ে যাবে। এ ছেলেমানুষী চিন্তা যাদের মাথায় এসেছিল, তারা ইন্দিরাজীকে চিনতেন না। ঝানু কংগ্রেসম্যান এবং বামপন্থা রাজনীতিবিদরা জওহর-কন্যা ছাড়া তাঁকে আর কিছু ভাবেন নি। তিনি যে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব, এটা তাঁরা ধারণাও করতে পারেন নি। তাই তাঁর আজকের সাফল্যকে অলৌকিক ভাবছেন। ইন্দিরাজীকে আমি যতখানি দেখেছি এবং বুঝেছি, তাতে তাঁর মতো ধীর স্থির চিন্তাশীল মহিলা আমি খুব বেশী দেখেছি বলে মনে করতে পারিনা। ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী গোণ্ডামেয়ারকেও অত্যুক্তি করতে দেখেছি এবং তাঁর আত্মম্ভরি উক্তি পাঠ করেছি। ইন্দিরাজীর তেমন কোন বাহ্যিক প্রকাশ নেই। বাংলাদেশের ব্যাপারে চীন আমেরিকা যৌথ ভাবে যখন ভারতের বিরোধীতা করছে এবং ভারতকে তথা ইন্দিরাজীকে দায়ী করছে, তখনও ইন্দিরাজী বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নি। চীন সম্বন্ধে কোন উক্তিই প্রায় করেননি এবং আমেরিকা সম্বন্ধে শুধু বলেছেন, দু'তিন হাজার মাইল দূর থেকে হুকুম চালাবার দিন চলে গেছে। রাজনৈতিক বক্তৃতাতেও দেখেছি, অন্যদের প্রতি কটুক্তি না করে, নিজের সরকার কি করবে এ কথাই বলে গেছেন। মানুষ যখন যুক্তি হারিয়ে ফেলে তখন চীৎকার করে এবং অন্যকে গালাগাল করে। ভারতের পূর্বতন নেতৃত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই দোষে ভুগতেন। বামপন্থী তথা কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ধ্বংসের বীজ তাদের কার্য্যক্রম এবং চিন্তাধারাতেই স্পষ্ট। "তুমি খেতে পাচ্ছো না, পরতে পাচ্ছো না, তোমার জীবনের কিছুই পাচ্ছো না—ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য, আমেরিকার দালাল সরকারের জন্য।" এ ধরণের কথাগুলো সাময়িকভাবে কিছু লোকের মনে চাঞ্চল্য জাতীয় কিছুর সৃষ্টি করলেও, বেশীর ভাগ লোক এ সব কথাকে মনের গভীরে নেয় না। কারণ ওদের কোন কথাই ভারতের সাধারণ মানুষের ধর্মের সঙ্গে,

কৃষ্টির সঙ্গে, অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে না। বক্তব্য তখনই অসার হয়ে উঠবে যখন তা অন্তরের গভীরে নাড়া দিতে পারবে না গান্ধীজী মানুষের অন্তরে নাড়া দেবার মতো কথা বলতে পেরেছিলেন বলে, ভারতের মানুষ দলে দলে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। ভারতবর্ষে এই গণ আন্দোলন মূলতঃ গান্ধীজী কৃত। এর আগে ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক মিশ্রিত গণ আন্দোলন হয়েছিল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দ্বারা। মহাপ্রভুর গণআন্দোলন রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ছিলনা বলে, তা ধর্মীয় গোষ্টীতে পরিণত, আর গান্ধীজীর গণ আন্দোলন আজও বর্ত্তমান। ১৯৪৭ সালের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন গণ আন্দোলন গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের বাইরে যেতে পেরেছে কী? বরং বামপন্থী দলের হাতে পড়ে তা সীমিত হয়ে গেছে। মিটিং, মিছিল, বয়কট, ঘেরাও এবং ধর্মঘটে পরিসমাপ্তি। দেশ গঠন করতে হলে, প্রকৃত সমাজবাদ আনতে হলে চাই, দেশের মানুযের ব্যাপক শিক্ষা এবং দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি। কলোনীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বর্জ্জন করে, ভারতীয় আদর্শে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলে, মানুষের মনে একতাবোধ আসবে, এ দেশ আমার দেশ ভাববে, প্রতিটি মানুষের সদিচ্ছা থাকবে দেশকে গড়ে তোলার জন্যে। ক্ষমতা না পেলে, কোন ভালো কাজ করা যাবে না, এটা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠলে মানুষ নিজে থেকেই দেশের কাজ করে।

গণতন্ত্রকে সঠিকভাবে রক্ষা না করলে সামগ্রিকভাবে জাতীয়তা-বোধ গড়ে ওঠেনা, জাতীয়তাবোধ থাকলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নষ্ট হয়ে যাবে, সাম্প্রদায়িক মনোভাব নষ্ট হয়ে গেলে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নারকীয় যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপান এবং জার্ম্মানদেশ বিশ্বের কাছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ উদাহরণ। এ ক'বছরে তাদের প্রভূত সমৃদ্ধির মূল কথা কী?

নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবোধ। আমরা শস্য, চিনি, কেরোসিন রেশন হওয়াতেই গেলো গেলো বলে চীৎকার করেছি। ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত জাপানে জলের রেশনও ছিল। ইন্দিরাজীর প্রতিশ্রুতি মতো ১৯৭২ এর মধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্ভর। অন্যান্য প্রতিশ্রুতিও সফল হবে, যদি আমরা সবাই সেই দেশ গঠনের কাজে হাত লাগাই। দেশের বৃহত্তম দল হিসেবে কংগ্রেসেরই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে।

সংগঠনের দিক থেকে ভাবলে, বর্ত্তমান কংগ্রেস এখনও সাবালকত্বে পৌঁছায়নি। আগেকার সংগঠনের চাইতে অনেক জোরদার হলেও, সংগঠন সম্পূর্ণ নয়। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় যুব ও ছাত্র সংস্থা অনেকখানি করেছে। সন্ত্রাস বন্ধ করতে তাদের রক্তদান নেহাৎ কম নয়। সরকার গঠন বা মন্ত্রীত্ব পাওয়াই দলের একমাত্র লক্ষ্য থাকা উচিত নয়। প্রতিটি কংগ্রেস কর্মীকেই দলীয় চিন্তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে, সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে সে বার্ত্তা পৌঁছে দিতে হবে, নিজেদের সৎ চরিত্রের দ্বারা অন্যের ভালোবাসা অর্জন করতে হবে। দলীয় প্রভাবের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির লোভ সম্বরণ করতে হবে। জোর করে সাময়িকভাবে জনসাধারণের সমর্থন আদায় করা হয়তো চলে, তবে তাতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

সব লোককেই রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ নিতে হবে এর কোন কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গে বেশিরভাগ লোক রাজনীতি করে বলে এ ধরণের রাজনৈতিক কোন্দল চলেছিল, চলছে—।

১। ধর্ম নিরপেক্ষতা, গনতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদ এই আদর্শের ভিত্তিতে দলকে সংগঠিত হতে হবে।

২। সরকারি প্রশাসন থেকে দলকে আলাদা থাকতে হবে।

৩। বিচার ব্যবস্থা বা প্রশাসনে দলীয় প্রভাব রাখা চলবে না।

৪। দলীয় নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে।

৫। আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংগঠনকে শক্ত করতে হবে, ধারাবাহিক পরম্পরা রক্ষা করে সে সব কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটিতে পৌঁছিবে এবং দায়বদ্ধ থাকবে।

৬। সমাজের যে সব কৃষ্টি কল্যাণমুখী তার সহায়তা করতে হবে। সে শিক্ষার দ্বারা নিজেদের গঠিত করতে হবে।

৭। কর্মীরা যেহেতু সমাজভুক্ত, সুতরাং কোন সামাজিক কর্ম থেকে দূরে থাকবে না।

৮। প্রত্যেকের মত প্রকাশের পুর্ণ সুযোগ দেবে এবং বিরোধী বক্তব্য হলে তাকে যুক্তি দ্বারা বিচার করে দেখবে সঠিক না বেঠিক। বেঠিক হলে যুক্তির দ্বারা এবং আন্তরিকতার দ্বারা নিজেদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৯। প্রথম পয়েন্টের বিরেধিতা কেউ করলে, নিয়মতান্ত্রিক পথে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। সমাজ বিরোধী বা অসামাজিক লোককে দলে রাখা চলবে না। অসামাজিক লোক দলের অংশিদার হয়ে থাকলে, তাকে সামাজিক জীবন যাত্রায় সৎ জীবন যাপনে বাধ্য করবে।

সংগঠনের আরও ধারা যুক্ত হতে পারে। এটা ব্যক্তিগত ভাবে আমার বক্তব্য। কারণ, পশ্চিমবংলার কংগ্রেস সংগঠনের যে প্রত্যাশা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নাড়া দিয়েছিল, আজ আস্তে আস্তে তা তিরোহিত হতে চলেছে। কারণ, অঞ্চল ভিত্তিক কংগ্রেসের তিনটি সংগঠন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্দ্দেশ অমান্য করে অঞ্চল ভিত্তিক সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এই সন্ত্রাসকারীরা যে প্রকৃত কংগ্রেসম্যান এটা আমি বিশ্বাস করিনা। আর বিশ্বাস করি না বলেই একথা বলছি যে সুযোগ সন্ধানী এবং স্বার্থান্বেষী যে সব ব্যক্তির কংগ্রেস সংগঠনে প্রবেশ ঘটেছে তাদের সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নইলে প্রতিক্রিয়াশীল

জাতীয়তাবাদ বিরোধী শক্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার অকল্যাণ ডেকে আনবে।

আমার একই কথা আবারও বলছি, সমাজবাদ হলো তাই যা সামগ্রিকভাবে দেশের সমৃদ্ধি আনবে। অনিয়মতান্ত্রিক সমাজবাদ শোষণেরই ভিন্ন নাম।

সমগ্র ভারতে কংগ্রেসের এই বিপুল জয়, জোরদার কংগ্রেস সংগঠনের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে একথা আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি না। ইন্দিরাজীর সঠিক নেতৃত্বই কংগ্রেসের নব প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। এই সুযোগ যাতে নষ্ট না হয়, দেশের সমৃদ্ধি যাতে নেতৃত্বের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বসে না পড়ে তারই জন্য কংগ্রেসদলকে সুশিক্ষিত এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে হবে।

"এশিয়ার মুক্তি সূর্য্য ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও" এটা শুধু শ্লোগান হয়ে যেন না থাকে। আজকে পৃথিবীর নেতৃত্বের প্রশ্ন সামনে রয়েছে। সে নেতৃত্ব বস্তুবাদী দেশেরা মিলিত ভাবে নেবে, না অধ্যাত্ম চেতনা সম্পন্ন ভারতের হাতে আসবে। এই নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্ব নয়, অর্থ নৈতিক সাহায্য দিয়ে অক্টোপাশের মতো বেঁধে রাখা নয় ;—আদর্শের ভিত্তিতে নেতৃত্ব। এবং অতি অবশ্যম্ভাবি সে নেতৃত্ব আসবে ভারতের হাতে। কেন ?

চাহিদা পূরণের রীতি হলো আরো চাহিদার সৃষ্টি করা, জাগতিক সুখের পরিণাম বৃদ্ধি পাওয়া। গ্রহণ এবং বর্জন সম পরিমাণে না হলে যে কোন জিনিষের যেমন বিকৃতি ঘটে, জাগতিক সুখের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে পুরো মানুষটাকেই ধ্বংস করে ফেলে। আজকে সমৃদ্ধিশালী প্রতি দেশে এত অশান্তি কেন ? অনুন্নত দেশে অর্থনীতির জন্যে অশান্তি হতে পারে কিন্তু অর্থ নৈতিক উন্নতিশীল দেশেই যেখানে বেকাররা বেকার ভাতা পায় ? কী সে কারণ, যে কারণে সেখানে অশান্তি ? ১৯৬৮ সালে পশ্চিম জার্মান, পূর্ব জার্মান, চেকোশ্লোভাকিয়া

বুলগেরিয়া, ফরাসী, জাপান, আমেরিকা, এ সব দেশে যে ব্যাপক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছি তার কারণ তো অর্থনীতি নয়। আমেরিকার হিপি সম্প্রদায়ের আর্বিভাবের মূল উৎস কী অর্থনীতি?

গোড়ায় গলদ। অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধশালী প্রতিটি দেশের মানুষের মনে অবক্ষয় এসেছে। বিজ্ঞান তাদের ঘরে ঘরে এত সুখ সুবিধা এনে দিয়েছে যে একটি মানুষ পুরোপুরি যান্ত্রিক হয়ে যেতে বসেছে। একটি যন্ত্রের আর নিজের কী থাকে? কিন্তু মানুষ যন্ত্র নয়। আর যন্ত্র নয় বলেই সে শান্তি চায়। 'শান্তি' নামক শব্দটির অবস্থান মনে। অস্থির চিত্ত মানুষের শান্তি আসতে পারে না, বস্তুবাদ সে শান্তি দিতে পারে না। সে শান্তির খোঁজে মানুষ নেশা করে, বস্তুবাদী জগতে নিষ্কর্মা মন অস্থির হয়ে পড়ে, প্রকৃতি বিরুদ্ধ অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা হতাশা আনে, তাই প্রয়োজন দেখা দেয় আত্ম বিলুপ্তির। হিপি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সেই আত্মবিলুপ্তির কাহিনী হিসেবে। ওর মধ্যে শুধু সি, আই, এ-এর গন্ধ খুঁজলে ভুল করা হবে।

ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম চেতনা মানুষকে সেই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এই অধ্যাত্মবাদ মানুষকে স্থায়ী শান্তি দিতে পারে।

পৃথিবীর বস্তুবাদ যা শুধু জাগতিক সুখই দিতে পারে, তারা ভারতের দিকে তাকাতে বাধ্য হবে। বাধ্য হবে নিজেদের ধ্বংস রোধ করার জন্যে। ভারতীয় আদর্শই হলো ধর্ম। সে ধর্মের গঠনে আছে সম পরিমাণে বস্তুবাদ এবং অধ্যাত্মবাদ এবং তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলছি তাকেই যা সঠিক পথে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছুবার সহায়ক।

কাজেই সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব ভারতের হাতে আসবে। ইন্দিরাজীর নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতের নেতৃত্ব যুক্ত। ভারতের নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত পৃথিবীর নেতৃত্বের প্রশ্ন। ইন্দিরাজী সেই ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী,

ভারতীয় মণীষা তাঁর পথ প্রদর্শক। তাঁর বিবেকানন্দের ওপর লেখাটা তুলে ধরছি। এই প্রবন্ধের দ্বারা তাঁকে সঠিক ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন তথা বাণী ও রচনার সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে পরিচয়ের বিশেষ সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখনই এর সূত্রপাত ঘটেছিল। আমার মা বাবা দুজনেরই বিশেষ করে আমার মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল মিশনের সঙ্গে! আর আমি সত্যি করেই বলতে পারি যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের সমগ্র পরিবারকেই প্রেরণা দিয়েছে, আমাদের রাজনৈতিক কাজে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও।

অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি আমার অনুরাগের কারণ শুধু ব্যক্তিগত নিশ্চয়ই নয়। আমাদের সংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ব্যাপারে এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে মিশনের অবিরাম প্রয়াস আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমাদের চিন্তাধারা দর্শনে এবং সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক আমরা বিদেশে এমন কি দেশের জনগণের সব অংশের সামনে এই সমৃদ্ধিকে ঠিক-ঠিক ভাবে প্রক্ষেপ করতে পারিনি। এ ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। মিশনের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রগুলি যে চমৎকার কাজ করছেন ও করেছেন তাতে আমাদের ঐ অভাব কতকটা পুরণ হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যান্য মহান নেতারা আমাদের শিখিয়েছেন যে, সমস্ত বড় ও ভালো গুণ আমাদের ভিতর থেকেই অদ্ভূত হওয়া চাই। অন্যরা আমাদের পথ দেখাতে পারেন

কিন্তু তা অনুসরণ করবার বা না-করবার দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ন্যাস্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার প্রতিটি পৃষ্ঠা, তাঁর প্রতিটি উক্তি আমাদের প্রেরণা দান করে। স্বামীজী আমাদের দেন—সাহস শক্তি, আত্ম নির্ভরতা এবং বিশ্বাস। এই তো সেই জিনিষ যার প্রয়োজন ভারতের ছিল এবং যার প্রয়োজন ভারতের আজও আছে। স্বামীজী আমাদের শিখিয়েছেন যে, আমরা সত্যিই এক মহান সংস্কৃতি এবং এক মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধীকারী। সেই সঙ্গে তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের জাতীয় ব্যাধি। নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাদের জাতিকে কিভাবে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের মহত্ব শুধু তাঁর বিরাট বৌদ্ধিক শক্তি ও বিচারেই আবদ্ধ নয়, তাঁর হৃদয়ের অসীম প্রেমেও প্রসারিত। মানুষের কল্যাণের জন্য কী তীব্র, জ্বলন্ত সংরাগই না প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবন ও বাণীতে। স্বামীজীর এই মঙ্গল কামনা সমগ্র ভারতের জন্যে তো বটেই, সমগ্র বিশ্বের জন্যেও। আর বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে স্বামীজীর বিশেষ ক্ষমতা এইখানে যে আধুনিক বিশ্বে যে সমস্ত শক্তি সক্রিয়, তিনি সেগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে সজাগ ছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে, সেই সময়ে স্বামীজী কী ভাবে আজকের সমস্যাগুলি তাঁর মানস নেত্রে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পেরেছিলেন, আজকের নানাবিধ ঘাত-প্রাতঘাত ধরতে পেরেছিলেন।

স্বামীজী প্রচার করেছিলেন মানুষের ভ্রাতৃত্ব। আজ সব-জাতির মধ্যে এইটিই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী ধ্বনি ও ভাবধারা। কিন্তু এখানেও শক্তি আসা চাই মানুষের নিজের ভিতর থেকে।

স্বামীজী একটি শব্দ বার-বার ব্যবহার করেছেন তাঁর ভাষণগুলিতে। শব্দটি হলো 'অভীঃ', নির্ভীকতা। স্বামীজীর জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনা যা তিনি নিজেই বলেছিলেন—এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে। তিনি

তখন পরিব্রাজক হয়ে ভারত পর্য্যটন করছেন। এক সময় একদিন একদল বানর তাঁর পিছু নিল। তিনি যত জোরে চলেন, তারাও তত জোরে তাঁকে ধাওয়া করে। তিনি দৌড়ান, তারাও দৌড়ায়। এমন সময় এক বৃদ্ধ সাধু দূর থেকে চীৎকার করে বললেন তাঁকে "থামো, জানোয়ারগুলোর সামনে রুখে দাঁড়াও।" তিনি তাই করলে বানরগুলো পালিয়ে গেলো। ঘটনাটির উল্লেখ করে স্বামীজী বলতেন যে, এই ভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। পালালে চলবে না। —জগতের অধিকাংশ সমস্যা সম্পর্কেই তাঁর এই শিক্ষা প্রযোজ্য। যদি কেউ মনে করে যে কোন সমস্যা তার পক্ষে বড্ড বেশি বড় এবং সে ওই সমস্যা থেকে পালিয়ে বাঁচবে তাহলে সে ভুল করবে। সেই সমস্যা তাকে ক্রমশ আরো বেশী করে চেপে ধরবে এবং শেষে পিষে ফেলবে। বরং সাহসের সঙ্গে সেই সমস্যার সামনে রুখে দাঁড়ালে তার সমাধানের একটা সুযোগ পাওয়া যায়। একজন যদি সমাধান করতে ব্যর্থ হয় তাহলেই বা কী? পরে আর একজন তার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও ভালোভাবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।

(এই প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে বিগত ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধের উল্লেখ করছি। ইয়াহিয়ার নারকীয় অত্যাচারে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু, যা আইখম্যানের ইহুদি হত্যাকেও বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং সেই কারণে বাংলা দেশের এক কোটি জনসাধারণ ভারতে নিল আশ্রয়। এই কঠিন সমস্যা পৃথিবীর যে কোন দেশের কাছে অকল্পনীয়। সেই সময় এই বিরাট সমস্যার বিরুদ্ধে ইন্দিরাগান্ধী রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রাশিয়া বাদে সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ শক্তিশালী রাষ্ট্র পাকিস্তানী নারকীয় অত্যাচারের পক্ষে এবং ভারত বিরোধী। সেই সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করেছিলেন ইন্দিরাজী। বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন এই চিন্তাও

বিশ্বে দেখা দিয়েছিল। আমেরিকার চাইতে অনেক দুর্বল রাষ্ট্র ভারত সপ্তম নৌবহরের নামে কেঁপে না উঠে বলেছিলো, ওটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করার জন্যে। বিশ্বযুদ্ধের সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্বেও, অর্থ নৈতিক দুরবস্থা নিয়েও ভারতের অধিনেত্রী সমস্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। এটা ইন্দিরাজীর ওপর ভারতীয় মণীষার প্রভাব। একটি নারীর মধ্যে সে সাহসিকতা দেখে আমরা বিস্মিত। অথচ এই ক্ষমতার খবর আমরা অনুসন্ধান করিনা। —গ্রন্থকার)

প্রগতি ও আধুনিকতার কথা আমরা প্রায়ই শুনি ও বলি। প্রগতি বলতে আমি বুঝি মানব ব্যক্তিত্বের গভীরতা ও বিকাশ সাধন-ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই। এর জন্য অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও সামাজিক বাধাগুলি নিশ্চয়ই অপসারিত হওয়া উচিত। এগুলি দূর করতে আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে দেখতে হবে যে, বস্তুগত জীবনযাত্রার মান উচ্চতর করতে গিয়ে আমরা যেন কোনভাবে মানব-ব্যক্তিত্বকে আহত না করি বা মানুষ যেন তার সমাজ ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে মানুষ যেন একই সঙ্গে তার সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় শরিক হয় এবং তার আত্মিক বিকাশ সাধনে তৎপর হয়। আধুনিকতা মানে নিশ্চয়ই শুধু হালের কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা জিনিষপত্র ব্যবহার, কিছু ফ্যাসানে গা— ঢেলে দেওয়া বা অধিক স্বচ্ছল দেশগুলির 'অনুকরণ' নয়। কাজেই শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্য দূর করলেই জাতি বড় হবে না। আত্মিক দারিদ্র্যও দূর করা দরকার। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য নেতাদের কাছে আমরা মূল্যবান পথ নির্দ্দেশ পাবো।

জানি উপরোক্ত দুটি কাজ (বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি) একত্রে করা সহজ নয়। পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিকতা—তা সে পুঁজিবাদী

ধরণেরই হোক বা কম্যুনিষ্ট ধরণেরই হোক (যাকে পূর্বের বলা হলেও আসলে যা পশ্চিমেরই) তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ নিজের সঙ্গে নিজে শান্তি স্থাপন করতে না পারলে বিশ্বের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারে না। তবু আমার মনে হয় যে দুয়ের সমন্বয় সম্ভব। আমার আরও মনে হয় যে, ভারত সে পথ খুঁজে পাবে। যদিও ভারত বা কারো পক্ষে সেটা খুঁজে পাওয়া সহজ বলে আমি মনে করি না।

সব যাত্রা পথেই পায়ের নীচে কাঁটা ও পাথর থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের এবং আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের সব মহান সংস্কারকের পায়ের নীচেও কাঁটা এবং পাথর ছিল। কিন্তু তারা সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। তাঁদের দৃষ্টি ছিল উর্দ্ধে—আলোকের দিকে, লক্ষ্যের দিকে। স্বামীজীর এবং তাদের সেই দৃষ্টি থেকেই আমরা দিশা পাব। বুঝতে পারবো অতীতকে এবং এগিয়ে যেতে পারবো ভবিষ্যতের দিকে।

ইন্দিরাজীর বক্তব্য তুলে ধরার কারণ হলো এই যে, আগে তাঁকে ১৯৩৮ সালে অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করার সময় এবং পরে ভারতের রাজনীতিতে কম্যুনিষ্টদের প্রতি পক্ষপাত (১৯৩৮ সালের আগে অনেকের মন্তব্য এবং ১৯৫২ সালের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে চীন সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মন্তব্য না থাকার দরুণ) তাঁকে কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা এবং ইংলণ্ডের পড়াশুনার সুবাদে তাঁকে পাশ্চাত্য মনোভাবী আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা ব্যক্ত করবার চেষ্টা করছি এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রবন্ধ তুলে ধরেছি। এর দ্বারা এই বোঝা যায় যে, ভারতীয় আদর্শের ভিত্তিতে তিনি ভারতকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে পারেন এবং ভারত অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর পথ প্রদর্শক হবে। অবশ্য সবাই যদি তাঁকে সাহায্য করে, দেশকে গঠন করার জন্যে সার্বিক সহায়তা করে।

নিজের দেশের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি আমাদের অর্দ্ধেক সাহায্য করবে, ভারতীয় মণীষা বাকীটুকুও সমাধা করতে সাহায্য করবে যদি আমরা তাঁদেরকে দিশারী হিসাবে রাখি।

সমাজবাদের কথা বারবার বলছে আজকের কংগ্রেস, বলছেন প্রধানমন্ত্রী। গরীবী হটাও এবং অর্থনৈতিক সাম্য আনার কথাও তাঁরা বলছেন। ভারতের সমগ্র সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে থাকুক, এটা কোন কল্যাণকামী মানুষই চায় না, তা সে কংগ্রেসই হোক বা কম্যুনিষ্ট আদর্শই হোক। তাছাড়া বর্ত্তমান পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাও দেশের বৃহত্তর অংশকে অর্থহীন রেখে ক'জনের হাতে সম্পদ রাখতে চায় না। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা না থাকলে ধনীদেরও লাভ হবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাও জনসাধারণের হাতে অর্থ ছড়িয়ে দিতে চায়। শোষণের ধারা এবং প্রশ্ন স্বতন্ত্র। শোষণের অর্থকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করলেই দেখবো, আমরা প্রত্যেকটা মানুষ শোষণ করছি এবং শোষিত হচ্ছি। অর্থনৈতিক শোষণকে ক্ষুদ্র করে আনা হয়তো যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে ফেলা যায় না। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে নির্মল শোষণহীন সামাজ থাকবে কিনা, এ প্রশ্নের বিচার ভবিষ্যতই করবে। তবে এটুকু বলতে পারি প্রত্যেকের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে পারলে শোষণের আকার ছোট হয়ে যাবে। শুধু আইনের দ্বারা দেশকে সম্পূর্ণ শোষণ মুক্ত করা যায় না। সৎ চরিত্র গড়ে তুলতে হবে এবং তার জন্যে চাই প্রকৃত শিক্ষা।

আধুনিক অর্থনীতিতে পশ্চিম জার্মান পথ দেখিয়েছে যে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে জনসাধারণের হাতে অর্থ তুলে দাও, করের বোঝা চাপিয়ে তাদেব নির্মূল করার প্রয়োজন নেই। বরং করের বোঝা কমিয়ে লোকের হাতে অনেক বেশী অর্থ রাখার সুযোগ দিলে

তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে। ক্রয় ক্ষমতা থাকলে চাহিদার বৃদ্ধি হবে, এবং চাহিদা পুরণের জন্যে আরও বেশী চাহিদার যোগান হবে এবং সম্পদ বেড়ে চলবে। সম্পদহীন দেশে সমাজতন্ত্রের লভ্যাংশ কী?

ভারতবর্ষেও সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সম্পদ বৃদ্ধি একান্তভাবে প্রয়োজন। ইন্দিরাজী সেই প্রতিশ্রুতির পথে পা বাড়িয়েছেন ১৯৫৯ সাল থেকে। ১৯৫৬ সাল থেকে ৫৯ সাল পর্য্যন্ত তাঁর পদক্ষেপের প্রস্তুতি পর্ব ছিল। কারণ, নিজের কতৃত্বাধীন কোন দল না থাকলে নিয়মতান্ত্রিক পথে সমাজবাদের দিকে এগোন সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস সংগঠনে যারা মোরসীপাট্টা গেড়ে বসেছিলো তাদের সমাজবাদী চিন্তায় আনার জন্য অনেক চেষ্টার পর ১৯৫৯ সালে ইন্দিরাজী বললেন, You will see the consequence. তারপরই স্বার্থান্বেষী এবং গোঁড়া মানুষদের কংগ্রেসের সরকার থেকে বিতাড়ন। সে বিতাড়ন এমন অপ্রত্যাশিত এবং কঠোরভাবে হয়েছিল যে, পার্টি দু'ভাগ হতে বাধ্য হলো।

১০ই আগষ্ট নয়া দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস

কমিটির অধিবেশনে এটা গৃহীত হয়। দেশের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জওহরলাল নেহরু ছাড়া অন্য সব কংগ্রেস নেতাকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে সংগঠনের কাজে অংশ নিতে হবে। রাজ্যগুলিতে এবং কেন্দ্রে কোন্ কোন্ মন্ত্রীর ওপর এ নির্দ্দেশ দেওয়া হবে তা ঠিক করার চূড়ান্ত ক্ষমতা নেহরুর ওপর ছিল। উৎসাহের সঙ্গে কিছু মন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। তারপরেই সেটা এক বিরাট কোন্দলে পরিণত হয়েছিল।

২০শে সেপ্টেম্বর কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি সভার সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নেহরুজী বলেছিলেন যে, কামরাজ পরিকল্পনার প্রকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে। এরপরেই ২২শে সেপ্টেম্বর শ্রী এস,

কে, পাতিল কলকাতায় ইষ্টার্ণ ষ্টাডি গ্রুপের সভায় বলেছিলেন যে, এই পরিকল্পনা কংগ্রেসের উর্দ্ধতন মহলে অনিশ্চিয়তার সৃষ্টি করেছে ও প্রশাসনিক দক্ষতার মুলে আঘাত হেনেছে। আর কম্যুনিষ্টরা এই বিভ্রান্তির সুযোগে কংগ্রেস সংগঠনে অনুপ্রবেশের মওকা পেয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সংগঠনকে শক্তিশালী করার দোহাই পেড়ে কামরাজ পরিকল্পনা ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বীর অপসারণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

ইন্দিরাজী পার্টির এই অবস্থার কথা জানতেন। জানতেন বলেই সংগঠনকে বিষমুক্ত করার কাজে আগে হাত দিয়েছিলেন। সেই দলকে পরিচ্ছন্ন করার কাজ আজও শেষ হয়নি। মোটামুটিভাবে পার্টিকে তিনি বর্ত্তমানে শক্তহাতে বাঁধতে পেরেছেন। এবার তাঁর কাজ দেশের উন্নতি বিধান। তাঁর পদক্ষেপ, এখনও পর্য্যন্ত যা পর্য্যালোচনার আওতায় এসেছে, তা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে বলা চলে। তিন বছর সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোন শক্তির পক্ষেই একটা অবক্ষয়িত দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘ ৫৪ বছরে রাশিয়াও তা পারেনি। সুতরাং ভারত সমাজতন্ত্রের পথে এগোচ্ছে না বলে এই মুহূর্তে চীৎকার করার কিছু নেই।

১। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ (১৪টি ব্যাঙ্ক)

২। রাজন্য ভাতা বিলোপ

৩। কয়লা খনি জাতীয়করণ (সব নয়)

৪। প্রতিশ্রুত সময়ে খাদ্যে সয়ম্ভরতা।

ইত্যাদি অনেক ছোটখাটো পদক্ষেপই আছে। খাদ্যের ব্যাপার ছাড়া বাকীগুলো খুব জোরদার পদক্ষেপ নয় একথাও ঠিক। তা সত্বেও বলছি, সুরু যেমনভাবে হয়েছে তাতে ভবিষ্যতের পদক্ষেপ আরও দৃঢ় এবং ব্যাপক হবে না এ আশাই বা কেন করবো। দেশের সব চেয়ে বড় এবং প্রথম প্রয়োজন যখন সমাধা হয়েছে, তখন বাকীগুলোও

সমাধা হবে এ বিশ্বাস থাকা উচিৎ। এবং এ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমাদের প্রত্যেকেরই সহযোগীতা করতে হবে। মনে রাখতে হবে পৃথিবীর কোন দেশের অবস্থাই ভারতের অবস্থার মতো এক নয়। তাই পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি (যা সম্পূর্ণরূপে সঠিক প্রমাণিত হয়নি) একই ধরণ নিয়ে ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যা, তাহলো সহৃদয়তা, কর্মনিপুণতা এবং সদিচ্ছা।

শ্রীমতী গান্ধী প্ল্যানিং কমিশনকে বলেছিলেন, "The lower we aim the less we shall achieve... We must think of the plan in plysical terms and in terms of the minimum needs if we are to convince the people that life is worth living... we must have realism, yes. But realism in regard to whom and what ? If we do not have a feeling for the people, Then why plan at all ?"

বিদেশের কাছ থেকে সাহায্য নেবার ব্যাপারে বলেছেন,

"The idea that we shall be stronger if we do not take aid is completely wrong. We shall only be strong when we can stand on our own feet."

এমনি ধরনের অনেক কথাই তাঁর আছে। সেগুলি যদি শুধু কথা হিসেবেই হতো, তা হলে অনেক ভালোকথার ব্যক্তিদের মতো তাঁকে ভাবতাম। কিন্তু কথা এবং কাজের সামঞ্জস্য থাকার দরুণ তাঁকে নেতা (নেত্রী) হিসাবে অনুধাবন করার প্রশ্ন। কৃষ্ণমেননের সেই কথাটাই আবার বলছি, "ভারতবর্ষ একটা দেশ, ভারতবাসী একটা জাতি, ইন্দিরা গান্ধী একটা নেতৃত্ব।"

আমার পাশের লোকটা না খেয়ে আছে, অন্য বাড়ীর ছেলেটা অভাবের দরুণ লেখাপড়া করতে পারছে না, অথবা ব্যধিগ্রস্ত মানুষটা ঔষধের অভাবে মৃতপ্রায়। এসব ছোট খাটো প্রয়োজন যা

আমাদের চার পাশেই প্রতিমুহূর্তে দেখা দেয়, সে সব সরকারের দায়িত্ব এটা ঠিক। তাবলে মানুষ হিসাবে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, সরকারের ওপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকবো? একটু ত্যাগ স্বীকার আমরা করলে এমন অনেক ছোট খাটো প্রয়োজন আমরা মেটাতে পারি। এর জন্যে প্রয়োজন সহৃদয়তা, এর জন্যে চাই মানবিকতাবোধ। কোন ইজমের পক্ষপাতী না হয়েও, যার যতটুকু ক্ষমতা, সে অনুপাতে অন্যকে সাহায্য করলে, অনেকখানি দারিদ্র্য নিয়েও আমরা সুখী হতে পারি, সত্যিকার সমাজ গড়ে তুলতে পারি যা মানুষের কল্যাণ করবে। রাষ্ট্র আমার জন্যে কি করেছে এ প্রশ্ন তোলার আগে ভাবতে হবে, আমরা রাষ্ট্রের জন্যে কী করেছি। আমরা রাষ্ট্রের জন্যে যা করবো, যতখানি করবো, তারই প্রতিদান পেতে পারি। কিছু না করে প্রতিদান পাবার আশাটা একটাকার লটারির বিনিময়ে একলাখ টাকা পাবার দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্বাধীনতার দীর্ঘ ২৫ বছরে ভারতের কোন উন্ননি হয়নি, একথা ঠিক নয়। যতখানি উন্নতি হওয়ার প্রয়োজন ছিল তা হয়তো হয়নি। কেন হয়নি আমার দীর্ঘ আলোচনায় তার আভাস আছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর ২৫ বছরে আমরা যা হারিয়েছি তা কতদিনে পূরণ হবে বলা মুস্কিল। ২৫ বছরের অর্থনীতির শ্লথ উন্নতি হয়তো সঠিক প্ল্যান প্রোগ্রামের দ্বারা ত্বরান্বিত করা যাবে, কিন্তু যা হারিয়েছি তা ত্বরান্বিত করা নিঃসন্দেহে সহজ সাধ্য নয়। অর্থনৈতিক উন্নতি হলেও মানসিক দিক থেকে বিপর্য্যয় এসেছে। মানসিক অধঃপতন থেকে চরিত্রভ্রষ্টতা আসে, তার থেকে সৃষ্টি হয় নানারকম সামাজিক ব্যাধি। এটাকে একটা জাতির অবক্ষয় বলা যায়। দুটি বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যে অবক্ষয় এনেছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর বহু সমাজকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ দুটি বিশ্ব যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে না থাকার দরুণ ব্যাপক হারে সামাজিক পরিবর্ত্তন আনতে

পারেনি। অথচ অবাক হবার ব্যাপার হলো সামাজিক অবক্ষয়কে রোধ করার মতো স্বাধীনতারূপ শক্তি ভারতবাসী যখন পেলো, তখন থেকেই সুরু হলো বিপর্য্যয়। অভারতীয় আদর্শ এবং চিন্তা; কলোনীয় শিক্ষা যা আমাদের দাস সৃষ্টি করার যন্ত্র এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রবণতা বোধকে নষ্ট করে দিয়েছে। যাকে বলে Moral destruction। এই Moral নষ্ট হবার ফলে সমগ্র দিক থেকেই আমরা এক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন। এ থেকে বাঁচতে হলে চাই প্রকৃত শিক্ষা যা আমাদের চরিত্র গঠনের সহায়ক। এই সৎ চরিত্র তৈরি না হলে কোন মতবাদই দেশের কল্যাণ করতে পারবে না।

শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষ তৈরি করা। কিন্তু ভারতের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যা বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে ধ্বংস করার জন্যে চালু করে গেছে, তার দ্বারা আমরা শিক্ষার বিজ্ঞাপন হাতে নিয়ে Carrier তৈরি করার প্রবণতায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ি। এই কলোনীয় শিক্ষা আমাদের সুকুমার বৃত্তি সমূহ ধ্বংস করছে। ধীরে ধীরে জৈবিক স্তরে নামিয়ে আনছে। জাগতিক সুখের প্রতি আকর্ষণ বাড়লে, অন্যের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় কী? আর একের প্রতি অন্যের ভালোবাসা না জন্মালে সত্যিকার সুস্থ-সমাজ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কতখানি? কাজেই, শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই সত্যিকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়না।

আমি পশ্চিমবাংলার বাসিন্দা যখন, তখন পশ্চিমবাংলা সম্বন্ধে কিছু না বললে একটি দিক অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বাংলা আজ যা ভাববে, ভারতবর্ষ ভাববে আগামী কাল, মহামতী গোখলের এ কথা আজকে তুলে ধরলে অন্য প্রদেশ মনঃক্ষুন্ন হতে পারে। এ প্রসংশাবাক্য বাদ দিলেও বলতে পারি, ভারতের একটি অঙ্গে যদি পচন ধরে তাহলে সমগ্র দেহটাই বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা। বাংলার চিন্তা যেমন সবার আগে। বাংলার ব্যধিও অনেক শক্ত এবং

ভাবতেও হবে সবার আগে। নইলে সমগ্র ভারতকে দুর্ভাবনার হাত থেকে কেউই রেহাই দিতে পারবে না।

সদ্‌চিন্তা এবং সৎ আদর্শের চারণভূমি যেমন বাংলাদেশ (সমগ্র বাংলা) তেমনি, অসৎ চিন্তা এবং আদর্শের গোপন আড্ডাখানাও এই পশ্চিমবাংলা। সেদিন, অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষের অগ্নিকুণ্ড বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রেমী বিপ্লবীদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল যেমন বিশ্বাসঘাতকতা ; আজকের পশ্চিমবাংলার সর্বনাশ ডেকে আনছে সেই বিশ্বাসঘাতকতাই। হয়তো এর রূপ আলাদা, আকার আলাদা, কিন্তু বিষয়বস্তু এক। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার বুকে এক চুরির রাজসূয় যজ্ঞ চলছে। অদূর ভবিষ্যতেও এমন ধারা চলবে কিনা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। তবে কিছু কঠিন ব্যাধি সমাজে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, যার থেকে রেহাই না পেলে সেই শ্লোগানই থাকবে, 'চলছে, চলবে'।

১৯৪৭ সালের বঙ্গবিভাগ নিঃসন্দেহে বাঙ্গালীমনে একটা বিরাট ভাঙন সৃষ্টি করেছে। সে ভাঙনের জোয়ারে বাঙ্গালী প্রথমেই ভুলেছে বাঙ্গালীত্ব, তারপর নিজের ভাষা। এই দুটো স্তম্ভ ধ্বসে পড়ার জন্যে সমাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। ঘরমুখো বাঙ্গালীরা মনে প্রাণে বোহেমিয়ান হয়ে গেছে। এই ভাঙ্গনকে তরান্বিত করেছে দলবাজীর রাজনীতি। 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' দিয়ে যার সুরু তার শেষ কি 'ইন্দিরা ইয়াহিয়া এক হ্যায়' শ্লোগানেই শেষ হবে? সম্ভবতঃ, না। আরো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, দলবাজীর রাজনীতি আজ বাংলার হেঁসেলে আসর জমিয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মানুষের মনে দলবাজীর রাজনীতি প্রবেশ করেছে বড় বিশ্রীভাবে। যার পরিণতি ক'বছরে ২০,০০০ উঠতি সন্তানের জীবনহানি। কোন্ মহৎ কাজের জন্যে এদের বলি হলো, কোন্ শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র করার মানসে এমনটা ঘটল? উদ্বাস্তু সমস্যা রোধ করার জন্যে? দুই বাংলাকে এক করার জন্যে? মানুষকে কর্মমুখীন করে তুলে দেশকে

অর্থনৈতিক দুরবস্থার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে? মানুষকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে? এ সব ভালো কোন কাজের জন্য নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেক মানুষ রাজনীতি করে? গণতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেকটা মানুষ রাজনীতি করে? করে না। তবে পশ্চিম বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে রাজনীতির প্রবেশ ঘটানোর পেছনে কী কারণ? কারণ, ঐ একটি। পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষকে সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা। এই ধ্বংস পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রের জন্য নয়, গণতন্ত্রের জন্যেও নয়,—এটা শুধু ক্ষমতাতন্ত্রের জন্যে। এমন সূক্ষ্মভাবে এ বিষ পশ্চিমবাংলার মানুষের মনে, বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে যে, এতে সবার মনে এক নিস্পৃহতার অবক্ষয়ী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। এতে নিজের প্রতি যেমন বিশ্বাস নেই, অন্যের প্রতিও তেমনি। কর্মই যে জীবনের আসল কথা এটা সবাই ভুলতে বসেছে। "কাজ করবো কেন? কার স্বার্থে, কিসের জন্যে?" —এর উত্তর আছে। কিন্তু, তাদের বোঝানো হয়েছে, এ দেশ তোমার নয়, কাজ করলে ধণিকশ্রেণীর লাভ হবে। সুতরাং কোন কিছু দরকার নেই। এ ভাবেই ধীরে ধীরে মনুষ্যত্ববোধকে ধ্বংস করা হয়েছে, মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে এনেছে। নইলে ভাই ভাইয়ের গলা কাটতো না, স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করতো না, পিতাকে পুত্র হত্যা করতো না। এ হত্যাকাণ্ড দীর্ঘদিন ধরে মধ্যবিত্ত সমাজের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে, এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধ্যম পরিমান ধন থাকলে তাকে মধ্যবিত্ত বলে কিনা জানিনা তবে মধ্যবিত্তের চিত্ত আছে এটা সত্য। কোন মহৎ কার্য্যের জন্যে এই চিত্ত ধ্বংসের প্রয়োজন? আজকের প্রত্যেকটা মানুষকে স্থির মস্তিষ্কে একথা ভাবতে হবে, তারা যা করছেন তা কার স্বার্থে এবং কেন। মনুষ্যত্ব বড়, না পশুত্ব বড় এ কথাই ভাবতে হবে আগে। স্থায়ী সরকার থাকলেই মানুষের মনে স্থায়ীত্ব আসে

না। স্থায়ীত্ব আনে সে সরকার, যে সরকারকে জনসাধারণ বিশ্বাস করতে পারে। বিশ্বাস অর্জনের সহজ পন্থা হলো, 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়'।

পশ্চিম বাংলায় চুড়ান্ত বিপর্য্যয় সুরু হলো ১৯১৭ সাল থেকে। বিপ্লবের দুটো ভাগ হলো জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জনগনতান্ত্রিক বিপ্লব নামে। জনগনতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাগ হলো দুটো। একটা সি, পি, এম অন্যটা সি, পি, আই, (এম, এল)। ধনিক শ্রেণীকে ধ্বংস করার আন্দোলন নেমে এলো সাধারণ মানুষকে ধ্বংস করার কাজে। যুব সমাজের মধ্যে হতাশা জনিত বিভ্রান্তি এমনিতেই ছিল। তার মধ্যে এলো কিছু করার নেশা। এই নেশা জনিত বিকারের ফল আজকের পশ্চিমবাংলার অবস্থা। সর্বস্তরে এক বীভৎস ধ্বংসের ক্রিয়া।

এই ধ্বংসের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে সঠিক নেতৃত্ব। কিন্তু সেই নেতৃত্বকে কার্য্যে রূপায়িত করার জন্যে যারা ঘনিষ্ঠ সহযোগী, তাদের ধ্বংসের কারণগুলো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে, ভারতীয় আদর্শ এবং শিক্ষায় নিষ্ঠাবান হতে হবে এবং হিংসা বর্জন করতে হবে। হিংসাকে দূর করার জন্যে হিংসার পথ কখনো বেছে নিতে হলেও ওটাকে মূল মন্ত্র করে রাখলে সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

গত বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস নিরঙ্কুশভাবে গরিষ্ঠ। বামপন্থী-দলগুলো প্রায় লুপ্ত একথাও ধরে নেওয়া যায়। এই যে একছত্র কংগ্রেস আধিপত্য, যার থেকে স্থায়ী সরকার। তাহলে, এখনও হিংস্রাশ্রেয়ী ঘটনা ঘটছে কেন। ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরতে পারছে না কেন? সমাজবিরোধীরা সমাজের অধিকর্তা হচ্ছে কী করে? যে দিকেই তাকানো যাক না কেন এমন এক আঙ্গিকের ছাত্র যুবকদের দেখা যায়, যাদের মধ্যে সত্যিকার কোন আদর্শ আছে বলে মনে হয় না।

যে কোন প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক দলে এদের দেখা যায়। এরাই এখন শাসনতন্ত্র, গণতন্ত্র, আমাদের ভবিষ্যৎ সব কিছু। এরা কারা? কংগ্রেস দল নিজেদের আদর্শের প্রচার না করে নিছক দল বাড়াবার কাজে ব্যাস্ত কেন? তারাও কী ঘরে ঘরে রাজনীতির আসর বসিয়ে বামপন্থীদলগুলোর মতো দেশের ধ্বংস ডেকে আনবেন? ১৯৪৭ সাল থেকে মানুষের মনে অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার মানুষের অনেক দাবী ছিল। ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত সে সব দাবী তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। তারপর থেকে মানুষের মনে একটিই দাবী দানা বেঁধেছে, তাহলো শান্তিতে বাস করার দাবী।

ঐ একটি দাবীর ভিত্তিতে জনসাধারণ যদি কংগ্রেসকে নির্বাচিত করে থাকে, তবে শান্তি ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তাদের নয় কি? তবে এখনও সে শান্তি ফিরে আসছে না কেন? কারণ, অশান্তি যারা করে তারা দল পাল্টেছে কিন্তু ভোল পাল্টায় নি। আর প্রশাসন সম্ভবতঃ মোক্ষলাভের আশায় শিবনেত্র হয়ে আছে। প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করা যুক্তিযুক্ত। সবাই মিলে এ্যাক্শন করবো বা রাজনীতি করবো, তাহলে দেশ রসাতলে যাবে। আজ সমস্ত অসামাজিক ক্রিয়াকলাপকে গণতান্ত্রিক আইন অনুসারে দমন করা উচিত। কারো মৃত্যুই আমার কাম্য নয়। আমি চাই সবাই অবার হেসে উঠুক, বেঁচে উঠুক। এ পৃথিবীটা যে শুধু উদর পূর্তির জন্য নয়, অনেক কিছুর জন্য—তার কথা ভাবা দরকার। আর বাঙালী বাঁচতে পারবে তখনই, যখন সে ভাববে সে বাঙালী, তার ভাষা বাংলা। এর মধ্যে কোন গোঁড়ামী থাকবে না। কারণ গোঁড়ামিই হলো ফ্যাসিজমের জন্মদাতা।

ইন্দিরা গান্ধী ও সমাজতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে হয়তো অনেক কথা বলা হয়েছে, আরও হয়তো বলার ছিল। তাঁর জীবনালেখ্যর প্রতি

আমি সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান ছিলাম না। কারণ, আমি চেয়েছি তাঁর জীবনের ঘটনা এবং মানসিকতার পর্য্যালোচনা করতে এবং তার মধ্য থেকে সফল নেতৃত্বের গুণাবলী অনুধাবন করতে। একটা নেতৃত্বের গুণাবলী তাঁর মধ্যে কতখানি এবং তার দ্বারা কল্যাণময়ী ভারতকে কল্পনা করা যায় কিনা। আর সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা তুলে ধরেছি ভারতের উপযোগী ব্যাখ্যাটা বেছে নেবার জন্যে।

১৯৫৪ সালে প্রগতিশীল কংগ্রেস দলের প্রয়োজনে, দল দু ভাগ হয়ে গেলো। পরিশুদ্ধ কংগ্রেস দলের অধিনেত্রী ইন্দিরাজী নিশ্চয়ই দেশের প্রয়োজনে লুমপেন্‌দের বিতাড়িত করবেন এবং আদর্শহীন যারা তাদের কংগ্রেসে স্থান দেবেন না।

জোয়ান অব আর্কের স্বপ্ন যার ছোট বেলার সঙ্গী, তাকে আমরা সে আদর্শেই দেখতে চাই। পুতুলদের নেতৃত্ব করা যায় ছোটবেলার খেলা, আজ ৫৪ কোটি জনসাধারণের নেতৃত্ব তাঁর হাতে। এবং সেই নেতৃত্বের সুবাদে ভারতীয় আদর্শ যেন আবার যন্ত্রে পরিণত হয়ে যাওয়া পৃথিবীকে আবার মানুষের পৃথিবীতে পরিণত করার পথ দেখায়।

তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বলবো "ভারতবর্ষ একটা দেশ, ভারতবাসী একটা জাতি, ইন্দিরাগান্ধী একটি নেতৃত্ব।"